উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২

সম্পাদনা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

শঙ্কর প্রকাশন ॥ ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন ॥ কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

উৎসর্গ-পত্র

বিদুষী ভার্যা

শ্রীমান সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ও
শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়
জামাতা-কন্যাকে
পরম স্নেহের সহিত
বিদুষী ভার্যা
উপহার
দিলাম

রাতজাগা

সুহৃদ্বর
শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়
করকমলে

স্মৃতিকথা : ১ম পর্ব

সোদরোপম বৈবাহিক
শ্রীমান সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
তাঁর জন্মদিনে উপহার

বিদুষী ভার্যা

এক

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মহাদেবপুরের অভিমুখে যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার তিন ক্রোশ উত্তরে মনসাগাছা গ্রাম। প্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই মনসাগাছা গ্রামের প্রধান অধিবাসী। রাজসাহী এবং দিনাজপুর, উভয় জেলায় অবস্থিত তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর নীট্ আয় বাৎসরিক চল্লিশ হাজার টাকার উর্দ্ধে। তদ্ভিন্ন, তেজারতি, কোম্পানির কাগজ, খাস জমা প্রভৃতি হইতেও আমদানি নিতান্ত অল্প নহে।

বৎসর পাঁচেক হইল প্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় পরোলোকগমন করিয়াছেন। উপস্থিত তাঁহার তরুণ-বয়স্ক দুই পুত্র দিবাকর ও নিশাকর এই বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী। প্রভাকরের একমাত্র কন্যা গৌরীবালার সাত বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। গৌরীবালার স্বামী হেমেন্দ্রনাথ লাহোর কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গত দুইবারের ন্যায় এবারও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে কোথাও দিবাকরের নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এই অনভিপ্রেত দুর্ঘটনার জন্য অন্যান্য বারের ন্যায় সম্ভবত এবারও দুষ্ট অঙ্কশাস্ত্রই দায়ী সন্দেহ করিয়া মনে মনে দিবাকর অঙ্কশাস্ত্রের মুণ্ডপাত করিল।

উপর্যুপরি তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইয়া লেখা-পড়ার উপর তাহার ঘৃণা ধরিয়া গেল। এই অকৃতকার্যতার হেতু নিজের মেধা অথবা উদ্যমের ত্রুটির উপর আরোপ না করিয়া অদৃষ্টের উপর করিয়া সে সর্বান্তঃ-করণে নিজেকে ক্ষমা করিল। মনে মনে সে তাহার সংক্ষুব্ধ অভিমানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, যতই কর না রে কেন বাপু, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।

এমন করিয়া শুধু যে সে নিজেকেই ক্ষমা করিল তাহা নহে; স্কুলের ক্ষুদ্র এলাকা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঢুকাইবার অভিপ্রায়ে যে তিনজন গৃহশিক্ষক তাহাকে প্রচুর পরিমাণে ঠেলাঠুলি করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধেও সে মনের মধ্যে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রবেশ করিতে দিল না। অযথা তিনটি নিরপরাধ ভদ্রলোকের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে কেন? অদৃষ্টের কঠিন শিলাখণ্ডের উপর বিধাতাপুরুষ যে-লিপি খোদিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে পরিবর্তিত করা মানুষের সাধ্য নহে।

সমস্ত ব্যাপারটা অদৃষ্টবাদতত্ত্বের উপর স্থাপিত করিলেও, যে প্রকারেই হউক, লেখাপড়ার উপর দিবাকরের ঘৃণা ধরিয়া গেল। দেশের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে আচার্য রায় যে দশ বৎসরের জন্য ল' কলেজের দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন, সে কথা স্মরণ করিয়া দিবাকর মনে মনে বলিল দ্বার যদি বন্ধ করিতেই হয় তো অতদূরে অগ্রসর হইয়া অত সময় নষ্ট করিয়া নহে, একেবারে প্রবেশিকার

দ্বার বন্ধ করিয়া গোড়া মারিয়া কাজ করা উচিত। অনর্থের বৃক্ষকে ডালপালা বিস্তার করিবার অবসর না দিয়া অঙ্কুরে বিনাশ করাই সুবুদ্ধির পরিচয়।

এই সদ্বিবেচনার ব্যাপকভাবে পরিণতি লাভ করিবার বিলম্বিত কাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ব্যক্তিগতভাবে নিজের জীবনে ইহাকে কার্যসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে নির্বিকল্পতার সহিত লেখাপড়ায় ইস্তফা দিল।

কয়েকদিন পরে একটা পাখী-মারা বন্দুকের বিভিন্ন অংশ খুলিয়া দিবাকর নিবিষ্টচিত্তে সেগুলি সাফ করিতেছিল, এমন সময় সেখানে নিশাকর আসিয়া দাঁড়াইল।

মাজ্‌লের নিকট একটা জায়গায় একটু মরিচা পড়িয়াছিল। মিহি বালি-কাগজ দিয়া সেটা ঘষিতে ঘষিতে নিশাকরের দিকে একবার ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "কী রে নিশা, কিছু বলবি নাকি?"

নিশাকর বলিল, "হ্যাঁ, বলব।"

"কী বলবি বল?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিশাকর বলিল, "তুমি নাকি লেখা পড়া ছেড়ে দিলে দাদা?"

মরিচা সাফ করিতে করিতে খুব নিচু করিয়াই দিবাকর বলিল, "আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম,—না, লেখাপড়া আমাকে ছেড়ে দিলে? আমি চেষ্টার কিছু ত্রুটি করেছি বলতে পারিস? তিন তিন বছর ধ'রে ধস্তাধস্তিটা কিছু কম হয়েছে? ও সব অদৃষ্টের কথা নিশা,—অদৃষ্টে না থাকলে তুইও কিছু করতে পারিস নে, আমিও কিছু করতে পারি নে।"

বিরক্তি ও অভিমানের প্রদীপ্ত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "অদৃষ্ট, না, আরও কিছু! না দাদা, তুমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবে না, এ কিন্তু ভারি বিশ্রী দেখতে হবে।"

বন্দুকের নলটা ভূমিতে স্থাপন করিয়া অপর একটা অংশ তুলিয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "আর, তোর সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন দিয়ে ফেল করলে ভারি চমৎকার দেখতে হবে তো? তুই যে রকম বড় বড় নম্বর পেয়ে লাফাতে লাফাতে আমাকে তাড়া ক'রে আসছিস, তুই তো আমাকে ধরলি ব'লে।"

নিশাকর বলিল, "তার তো এখনও এক বছর দেরি আছে।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "ওরে নিশা, যে লোক তিন তিনটে বছর অনায়াসে ফেল করতে পারলে, আর-একটা বছর ফেল করা তার পক্ষে খুব শক্ত হ'বে ব'লে কি মনে করিস তুই? লেখাপড়া ছেড়ে দিলে লোকে একথা ভাবতেও পারে যে, না ছাড়লে হয়তো পাস করতে পারত। কিন্তু তোর সঙ্গে ফেল করলে সে কথা ভাববার কোন পথ থাকবে কি?"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "কী বলব বল! মা নেই, বাবা মারা গেছেন,—তোমাকে বলবার মতো কেউ তো নেই।"

দিবাকর বলিল, "কেন, তুই তো বিলক্ষণ আছিস দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে কী হবে বল দেখি? আরও দুটো ক'রে হাত-পা বেরোবে কি?"

"তা হলে দেখছি ম্যাট্রিকুলেশন পাস না করলেই আরও দুটো ক'রে হাত-পা বেরোবে।" বলিয়া গজগজ করিয়া কী বকিতে বকিতে নিশাকর প্রস্থান করিল।

নিশাকরের বয়স যখন দুই বৎসর, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর পুত্রকন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রভাকর তাঁহার এক দূর-সম্পর্কীয়া দরিদ্র বিধবা পিতৃব্যকন্যা প্রসন্নময়ীকে গৃহে আনিয়া রাখেন। সে আজ বারো-তেরো বৎসরের কথা। সেই হইতে প্রসন্নময়ী মনসাগাছার জমিদার-গৃহে কর্ত্রী হইয়া আছেন।

সন্ধ্যার পর জপ ও আহ্নিক সারিয়া প্রসন্নময়ী নিজকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে দিবাকর প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমাকে ডেকেছিলে পিসিমা?"

প্রসন্নময়ী কহিলেন, "হ্যাঁ, ডেকেছিলাম। বস, বলছি।"

প্রসন্নময়ীর পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার লইয়া বসিয়া দিবাকর বলিল, "কী, বল?"

দুই-একটা অবান্তর কথার পর প্রসন্নময়ী আসল কথার অবতারণা করিলেন; বলিলেন, "লেখাপড়া তো ছেড়ে দিলি দিবা, এবার তুই বিয়ে কর।"

প্রসন্নময়ীর কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে হাসি দেখা দিল; বলিল, "লেখাপড়া ছেড়ে দিলে বিয়ে করা ছাড়া আর কি কিছু করবার নেই?"

"আবার কী করবি?"

স্মিত মুখে দিবাকর বলিল, "কেন, জমিদারির কাজ শিখব, বন্দুক নিয়ে শিকার করব, সেতার নিয়ে বাজনা বাজাব, দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে তোমাকে তীর্থ করিয়ে নিয়ে বেড়াব। আর কিছুই যদি করবার না থাকে তো ও-পাড়ার যদু-খুড়োর পিছনে পেয়াদা লাগাব।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

তীর্থ করানোর প্রস্তাবে মনে মনে খুশী হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "যদু-খুড়োর পিছনে তুই যে কত পেয়াদা লাগাবি তা আর আমার জানতে বাকি নেই বাবা। কিন্তু এই শ্রাবণ মাসেই আমি তোর বিয়ে দোব দিবা। কলকাতা থেকে গাঙুলীদের বাড়িতে একটি মেয়ে এসেছে। এমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে কদাচিৎ দেখা যায়। এ মেয়েকে কিছুতেই হাতছাড়া করব না।"

ঔৎসুক্যের সহিত দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কত বয়েস পিসিমা?

দিবাকরের প্রশ্নে উৎসাহিত হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "এই শ্রাবণ মাসে চোদ্দ বছরে পড়বে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হ'লে হ'তে পারে। নিশার

সঙ্গে দিয়ে দাও, এক বছরের ছোট আছে, আটকাবে না। লেখাপড়া-ছাড়া পাত্রের সঙ্গে তারা অমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?" বলিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

প্রসন্নময়ী বলিলেন, "তোর মতো লেখাপড়া-ছাড়া পাত্রের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে সে এখন তপস্যা করছে।" তারপর দিবাকর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ওরে, যাস নে, যাস নে দিবা—আমার কথা শুনে যা।"

দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকর বলিল, "সে মেয়ের এখনও পাঁচ-সাত বৎসর তপস্যা বাকি আছে পিসিমা। অসময়ে তপস্যা ভাঙালে তার অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

দুই

দিবাকরের কথা ঠিক দৈববাণীর মতোই খাটিয়া গেল। পাঁচ বৎসর পরে সুদূর লাহোর শহরে একটি মেয়ের তপস্যা-কাল পূর্ণ হইল।

ঠিক সেই সময়ে বোধ করি অদৃষ্টেরই অনিবার্য আকর্ষণে দিবাকর লাহোর যাইবার জন্য সংকল্প করিল। পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-শেষে তাহাকে ও নিশাকরকে কিছুকালের জন্য গৌরী লাহোর লইয়া গিয়াছিল। তাহার পর সে আর লাহোর যায় নাই। কিছুকাল হইতে গৌরী এবং হেমেন্দ্রনাথ উভয়েই তাহাকে লাহোর যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া করিয়া পত্র দিতেছে। পার্বতীপুর এবং কাটিহার হইয়া লাহোর যাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিশাকরের বিশেষ অনুরোধে কলিকাতা হইয়াই তাহার পথ স্থির করিতে হইয়াছে।

কলিকাতা পৌঁছিয়া দিবাকর পটলডাঙ্গা অঞ্চলে নিশাকরের বাসায় উঠিল। নিশাকর তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, পড়ে।

চা-পানের পর দিবাকর বলিল, "আমি কিন্তু আজকের পাঞ্জাব মেলেই লাহোর যাব নিশা।"

নিশাকর বলিল, "এত তাড়া কিসের দাদা? দিন দুই এখানে বিশ্রাম ক'রে তারপর যেয়ো।"

দিবাকর কিন্তু তাহাতে সম্মত হইল না; বলিল, "আজ এখান থেকে রওনা হ'লে শনিবারে আমি লাহোর পৌঁছব। রবিবারে জামাইবাবুর বাড়িতে একটা উৎসব আছে। তাতে আমি উপস্থিত না থাকলে তাঁরা দুঃখিত হবেন।"

নিশাকর যখন দেখিল কোন প্রকারেই দিবাকরকে আটকাইয়া রাখা যাইবে না, তখন সে নিকটবর্তী একটা দোকান হইতে তাহাদের এক আত্মীয়-গৃহে ফোন

করিল, এবং তাহার অল্পকাল পরে তাহাদের দূরসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভাতকে দেখিয়া দিবাকর প্রফুল্লমনে বলিল, "কী প্রভাত, তোমাদের খবর সব ভালো তো?"

প্রভাত বলিল, "ভালো। আজ দুপুরবেলা আপনি আর নিশাকাকা আমাদের ওখানে খাবেন।"

দিবাকর বলিল, "আমি তো কয়েক ঘণ্টা মাত্র আছি। আজ পাঞ্জাব মেলে লাহোর যাচ্ছি। এর মধ্যে এসব হাঙ্গামা কেন করছ?"

প্রভাত কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হইল না, দিবাকরকে সম্মত করাইয়া প্রস্থান করিল।

প্রভাতদের গৃহ হইতে আহার করিয়া দিবাকর ও নিশাকর যখন তাহাদের বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা দুইটা।

দিবাকর বলিল, "এই জন্যে বুঝি আমাকে কলকাতা টেনে আনলি? শেষ-কালে তুই ঘটকালি আরম্ভ করলি নিশা?"

নিশাকর বলিল, "আমি কেন করব? ঘটকালি তো করছেন মাধুরীবউদিদি। কিন্তু মেয়েটি দেখতে-শুনতে চমৎকার নয় কি?"

সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের পথ ছিল না, দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

উৎফুল্ল হইয়া নিশাকর বলিল, "তাহলে ওদের পাকা কথা দিই?"

দিবাকর বলিল, 'লেখাপড়া কী করেছে, সে কথাটা কিন্তু জিজ্ঞসা করা হয় নি।"

নিশাকর বলিল, "এই বৎসর ফাস্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে।"

সহসা অতর্কিত বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন চমকিত হয়, নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকর বোধ করি ততখানিই চমকিয়া উঠিল। বিহ্বল নেত্রে নিশাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল," তুই আমাকে অপমান করতে চাস নিশা?"

বিস্মিত এবং নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া নিশাকর বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে, একটা ম্যাট্রিকুলেশন-পাস-করা মেয়ের সঙ্গে আমার মতো মূর্খ মানুষের বিয়ে দিয়ে আমার সমস্ত জীবনটা তুই হীনতায় মলিন করে দিতে চাস?"

রুদ্ধকণ্ঠে নিশাকর বলিল, "তুমি বড় ভাই, তোমাকে রূঢ় কথা বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু সত্যিই তুমি মূর্খের মতো কথা বলছ দাদা। আচ্ছা, যে মেয়েটিকে তুমি দেখে এলে সে তো তোমারচেয়ে তিনগুণ ফরসা, তবে তুমি সে বিষয়ে এতক্ষণ আপত্তি করনি কেন? নিজে ময়লা হ'য়ে একজন গৌরবর্ণ মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার জীবন হীনতায় মলিন হয় না?"

দিবাকর বলিল, "আমি তোর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করতে চাই নে। তোকে শুধু জানিয়ে দিলাম যে, আমাকে ফাঁসি দিলেও ও-মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। "আজ সন্ধ্যাবেলা গিয়ে তুই ওদের সে কথা ব'লে আসবি।"

"আচ্ছা, তাই'না হয় আসব।" বলিয়া নিশাকর দুমদুম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঊর্ধ্বলোকে বিধাতাপুরুষ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, পুকুর দেখেই এতটা ভয় পেলে দিবাকর, আর আমি যে লাহোরে তোমাকে সাগরে চোবাবার ব্যবস্থা করেছি, তার কি করছ বাবা ?

অদৃষ্টকে দেখা যায় না, বিধাতাপুরুষের বাক্য শুনা যায় না, নচেৎ যতটা নিরুদ্বেগে সেদিন সন্ধ্যায় দিবাকর লাহোর যাত্রা করিল, তাহা ঠিক সম্ভবপর ছিল না।

তিন

শনিবারে যথাসময়ে সে লাহোরে পৌছিল। পরদিন রবিবার বৈকাল পাঁচটার সময়ে হেমেন্দ্রনাথের গৃহে প্রীতি-সম্মেলন হইবে। কিছুদিন হইল 'মিত্র বিংশক' নামে একটি বন্ধু-সংঘ গঠিত হইয়াছে, পর্যায়ক্রমে এক-একজন সদস্যের গৃহে তাহার বৈঠক বসে। এবার হেমেন্দ্রনাথের পালা।

রবিবার সকালে বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া গৌরী, হেমেন্দ্রনাথ এবং দিবাকর আসন্ন উৎসবের বিষয়ে শেষ জল্পনা-কল্পনা করিতেছে, এমন সময়ে হেমেন্দ্র-নাথের মোটর গাড়ি বারান্দায় আসিয়া থামিল এবং তাহা হইতে অবতরণ করিল বছর একুশ বয়সের একটি লাবণ্যবতী তরুণী। সুগঠিত ছিপছিপে দেহ এবং সমস্ত মুখমণ্ডলে এমন দুর্লভ সৌন্দর্যের লীলা, যাহা পুরুষের চক্ষুকে বারংবার আকৃষ্ট করে।

সকৌতূহলে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে দিদি ?"

গৌরীবালা বলিল, "এখানকার হরলাল মুখুজ্জের ছোট মেয়ে যূথিকা। ভারি চমৎকার সেতার আর এসরাজ বাজায়। বিকেলে উদ্বোধন-বাদ্য ও-ই বাজাবে।"

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "উদ্বোধন গান হবে না ?"

হেমেন্দ্র বলিল, "উদ্বোধন-গান ভারী পচা হ'য়ে গেছে। উদ্বোধন-বাদ্যের মধ্যে তবু একটু নূতনত্ব পাওয়া যাবে।"

বলিতে বলিতে যূথিকা সহাস্যমুখে নিকটে আসিয়া হেমেন্দ্রনাথ ও গৌরীকে প্রণাম করিল ; তাহার পর গৌরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষ একটু ইঙ্গিতে দিবাকরের পরিচয় জানিতে চাহিল।

গৌরী বলিল, "আমার ভাই দিবাকর।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমিও তাই মনে করেছিলাম।" তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকরে বলিল, "নমস্কার।"

ব্যস্ত হইয়া দিবাকরও যুক্তকর করিয়া বলিল, "নমস্কার।"

উর্ধ্বলোক হইতে বিধাতাপুরুষ সহাস্যে বলিলেন 'সাগর-সৈকতে পৌঁছে গেছ দিবাকর।'

দৈববাণী গ্রহণ করিবার মতো সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি দিবাকরের ছিল না, তথাপি যুক্ত করে যূথিকাকে নমস্কার করিবার সময়ে তাহার মনে হইল, যেন সাগরেরই মতো গভীর এবং বিস্তৃত কোনও বস্তুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে নমস্কার করিতেছে। যূথিকা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম. এ. সে কথা তখন জানিতে পারিলে হয়তো নমস্কার করিবার সময়ে দিবাকরের তাহাকে সাগরের মতো গভীর এবং ভয়াবহ বলিয়াই মনে হইত।

যূথিকা উপবেশন করিলে হেমেন্দ্র বলিল, "তোমার যন্ত্রপাতি আনো নি যূথিকা?"

যূথিকা বলিল, "এনেছি দাদা। সেতার আর এসরাজ দু-ই এনেছি। বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেছে।"

হেমেন্দ্র বলিল, "কী ঠিক করলে তুমি? উদ্বোধন-সংগীতই বা কী বাজাবে, আর উদ্‌যাপন সংগীতই বা কী বাজাবে?"

যূথিকা বলিল, "উদ্বোধন-সংগীত মনে করছি এসরাজে ভীমপলশ্রী বাজাব, আর উদ্‌যাপন-সংগীত বাজাব সেতারে জয়জয়ন্তী।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া হেমেন্দ্র বলিল, "ভালোই হবে। চলো ও-ঘরে গিয়ে দুটোই একবার শোনা যাক। তুমিও চলো দিবা।"

হেমেন্দ্রনাথের ড্রইং-রুমের পাশের একটা ঘরে দেশী কায়দায় ফরাশের ব্যবস্থা ছিল, সেই ঘরে সকলে আসিয়া বসিল।

গৃহ হইতে যূথিকা যন্ত্র দুইটি এক সুরে বাঁধিয়া আনিয়া ছিল। অল্প একটু আধটু ঠিক করিয়া লইয়া পরে পরে সে এসরাজ ও সেতারে যথাক্রমে ভীমপলশ্রী ও জয়জয়ন্তী বাজাইল।

প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া গভীর আবেগের সহিত সেতার বাজাইয়া যূথিকা যখন তাহার যন্ত্র বন্ধ করিল, তখনও যেন সমস্ত কক্ষের বায়ুমণ্ডলী করুণ জয়জয়ন্তী রাগিণীর সুমিষ্ট বেদনায় স্পন্দিত হইতেছিল।

বিমুগ্ধ দিবাকর উচ্ছ্বাস-সহকারে বলিল, 'চমৎকার!"

আনন্দ স্মিতমুখে হেমেন্দ্র বলিল, "সত্যিই চমৎকার!"

গৌরী বলল, "আমি ভাবছি, এই ছোট ঘরের ভিতরে কাছাকাছি ব'সে আমাদের তিনজনের তো সত্যিই চমৎকার লাগল; কিন্তু ফাঁকা জায়গায় লোকের ভিড়ের মধ্যে একটি মাত্র যন্ত্রের বাজনা তেমন জমবে কি? এর সঙ্গে আরও একআধটা যন্ত্র যোগ ক'রে যদি একটা কন্‌সার্টের মতো করা যেত, তা হ'লে বোধ হয় বেশ ভালো হ'তো।"

যূথিকা বলিল, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ বউদিদি। কিন্তু আমার জানাশোনা

এক-আধজন লোকের সঙ্গে বাজিয়ে দেখলাম, কন্‌সার্ট তো নিশ্চয়ই হয় না, কন্‌সার্টের বিপরীতই হয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, যোগ করলে সব সময়ে সংযোগ হয় না; অনেক সময় গোলযোগও হয়।" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি তো সেতার বাজাতে পার দিবা, তুমি যূথিকার সঙ্গে বাজাও না, দেখি কেমন হয়!"

এ প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "ওঁর অত ভালো বাজনার সঙ্গে আমি বাজালে সংযোগ তো হবেই না, হয় গোলযোগ হবে, না হয় দুর্যোগ।"

হেমেন্দ্র বলিল, "আমি অবশ্য দু বছরের মধ্যে তোমার সেতার বাজনা শুনি নি, কিন্তু তখনই যা বাজাতে এ দু বৎসরে নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক উন্নতি করেছ।" বলিয়া সেতারটা দিবাকরের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "নাও, বাজাও।"

সেতারটা অগত্যা তুলিয়া লইয়া যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "আমার সঙ্গেও আপনার কন্‌সার্ট হবে না, কন্‌সার্টের বিপরীতই হবে।" বলিয়া সেতারে একটা ঝঙ্কার দিল।

কিন্তু ভীমপলশ্রীর গৎটা যখন যূথিকা এসরাজে এবং দিবাকর সেতারে বাজাইয়া শেষ করিল, তখন দেখা গেল, উভয়ের সংযোগে যাহা উৎপন্ন হইল তাহা কন্‌সার্টের বিপরীত কোনও বস্তু নিশ্চয়ই নহে।

উৎফুল্ল মুখে যূথিকা বলিল, "কী সুন্দর বাজান আপনি! কোথায় লাগে এর কাছে আমার বাজনা!

উৎফুল্ল মুখে দিবাকর বলিল, এ কথা এতই অপ্রকৃত যে, এর প্রতিবাদ করাও আমি অন্যায় মনে করি।"

আনন্দিত কণ্ঠে গৌরী বলিল, "ঠিক এই জিনিসটাই আমি বিশেষভাবে চাচ্ছিলাম।"

প্রফুল্ল মুখে হেমেন্দ্র বলিল, "কারণ, ঠিক এই জিনিসটারই নাম হচ্ছে কন্‌সার্ট, অর্থাৎ মিলন।"

যূথিকার হস্ত হইতে এসরাজটা কাড়িয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "এবার জয়জয়ন্তীর পথে আপনি সেতার বাজান, আর আমি বাজাই এসরাজ।"

সবিস্ময়ে গৌরী বলিল, "তুই এসরাজ বাজাতেও জানিস নাকি দিবা?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "এই সেতারের মতো দিদি।"

যূথিকা বলিল, "তা যদি হয় তাহলে তো খুব চমৎকারই জানেন।" বলিয়া দিবাকরের সম্মুখ হইতে সেতারটা তুলিয়া লইল।

জয়জয়ন্তী শেষ হইলে সানন্দ উৎসাহে হেমেন্দ্র বলিল, "আজ আমাদের উৎসব আদ্যোপান্ত সফল হবে কিনা বলতে পারি নে, কিন্তু তার আদি আর অন্ত যে চমৎকার হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম।"

স্থির হইল, ভীমপলশ্রীর গতে যূথিকা বাজাইবে এসরাজ এবং দিবাকর বাজাইবে সেতার—এবং জয়জয়ন্তীর গতে যূথিকা বাজাইবে সেতার এবং দিবাকর এসরাজ।

গৌরী বলিল, "এবার তোমরা দুজনে বার কতক গৎ দুটো বাজিয়ে বাজিয়ে বেশ ক'রে অভ্যাস ক'রে নাও, আমরা ততক্ষণ অন্যদিকের ব্যবস্থা দেখিগে। কিন্তু যাবার আগে আর একবার আমাদের শুনিয়ে যেয়ো যূথিকা।"

প্রফুল্ল মুখে যূথিকা বলিল, "আচ্ছা।"

হেমেন্দ্র ও গৌরী প্রস্থান করিলে দিবাকর এবং যূথিকা বহুক্ষণ ধরিয়া যন্ত্র পরিবর্তন করিয়া ভীমপলশ্রী ও জয়জয়ন্তী রাগিণী বাজাইতে লাগিল। সুরের সহিত সুর মিলাইবার জন্য তাহাদের প্রগাঢ় তন্ময়তা ক্রমশ যেন একটা গভীর নেশায় রূপান্তরিত হইয়া উভয়ের মনকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল। বাজাইবার ফাঁকে ফাঁকে অকস্মাৎ চকিত চক্ষের অকারণ দৃষ্টি-বিনিময় হয়, এবং পরক্ষণেই একের মুখে ফুটিয়া উঠে অতি ক্ষীণ মৃদু হাস্য এবং অপরের মুখে দুর্নিরীক্ষ্য রক্তিমা।

ড্রইং-রুমের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিয়া গেল। এসরাজটা ফরাশের উপর স্থাপন করিয়া দিবাকর বলিল, "আর না-হয় থাক ?

মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "থাক।" তারপর সেতারটা ধীরে ধীরে এসরাজের পাশে স্থাপন করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আপনি তখন দুর্যোগ আর গোলযোগের কথা বলছিলেন, কিন্তু আমি তো দেখছি মস্ত সুযোগ।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে হাসি দেখা দিল—"সুযোগ তো আমি দেখছি আমার!"

সকৌতূহলে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আবার কিসের সুযোগ ?"

দিবাকর বলিল, "এই রকম ক'রে সংগীতের মধ্যে দিয়ে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার।"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "সে সুযোগ আমারও তো নিতান্ত কম নয়; কিন্তু আমি বলছিলাম আপনি আসাতে আমার বাজাবার সুযোগের কথা।"

দিবাকর বলিল, "আগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তারপর সে কথা বলবেন।"

কিন্তু পরীক্ষায় উভয়েই সগৌরবে উত্তীর্ণ হইল। আমন্ত্রিত জনতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসারবে উৎসব-গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

উৎসবশেষে দিবাকরকে এক সময়ে একান্তে পাইয়া যূথিকা বলিল, "এ প্রশংসায় আপনার অংশ কিন্তু বারো আনা।"

সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল, "নিজ অংশ থেকে যদি আট আনা আমাকে দান করেন, তাহলে নিশ্চয় বারো আনা।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা নয়, সত্যিই বারো আনা।"

আরও দুই-চারটা কথার পর প্রস্থানোদ্যত হইয়া যূথিকা বলিল, "চললাম দিবাকরবাবু।"

বিস্মিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কোথায় চললেন ?"

"বাড়ি।"

"বাড়ি কেন ?"

দিবাকরের প্রশ্নে হাসিয়া ফেলিয়া যূথিকা বলিল, "বাড়িতেই আমি থাকি।"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া দিবাকর বলিল, "তা নিশ্চয়ই থাকেন। আমার জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য, এত শিগ গির বাড়ি কেন ?"

বাম হস্তের রিস্ট-ওয়াচের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিত মুখে যূথিকা বলিল, "পৌনে নটা বাজে।"

"কিন্তু সাড়ে দশটা তো বাজে নি মিস্ মুখার্জি !"

পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া যূথিকা বলিল, "না তা বাজে নি। কিন্তু এ গাড়িতে না গেলে গাড়ীর অসুবিধে হবে; আগের গাড়িতে বাবা আর মা চ'লে গেছেন !"

ব্যগ্র কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "চ'লে গেছেন ? তা হ'লে তো তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা হলো না !"

"আপনি তো এখন কিছুদিন আছেন—পরে করবেন।"

"তাই করব। কাল আসছেন তো মিস মুখার্জি ?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমি তো আজ দুবার এলাম, কাল তো আপনার যাবার পালা।"

ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "ও তাও তো বটে। আচ্ছা, আমিই যাব। কিন্তু কখন যাব বলুন—সকালে ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "সকালে একজনদের আসবার কথা আছে, সন্ধ্যার সময়ে যাবেন। কেমন ?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "সকালে যখন অসুবিধা, তখন অগত্যা সন্ধ্যার সময়েই যাব।"

"আচ্ছা নমস্কার।"

হাত তুলিয়া দিবাকর বলিল, "নমস্কার"

চার

পরদিন সকালে হেমেন্দ্রনাথ তাহার অফিস ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল, মন সময়ে যূথিকার পিতা হরলাল মুখোপাধ্যায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "আসুন কাকাবাবু, "কী খবর বলুন তো ?"

হেমেন্দ্রনাথের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া হরলাল বলিলেন, "বাবা হেমেন্দ্র, আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম।"

হরলালকে চেয়ারে বসাইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "বুঝেছি কাকাবাবু, সম্ভবত দিবাকরের সঙ্গে যূথিকার বিয়ের কথা আপনি বলছেন। কাল রাত্রে কাকিমা ও গৌরীকে এ বিষয়ে অনুরোধ ক'রে গেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হবে ব'লে তো মনে হয় না।"

ব্যগ্র কণ্ঠে হরলাল বলিলেন, "যূথিকার আমি জন্মদাতা, কিন্তু তুমি তাকে নিজ হাতে গ'ড়ে তুলেছ। আমি তার বেশী আপনার, না, তুমি—তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন হেমেন্দ্র। যূথিকার এত বড় মঙ্গল যে ক'রেই হোক তোমাকে করতে হবে বাবা।"

হেমেন্দ্র বলিল, "দেখুন কাকাবাবু যূথিকা পর হ'য়ে যাবে না, সে আমার এত নিকট আর আদরের আত্মীয় হবে, এর চেয়ে লোভনীয় ব্যাপার আমার পক্ষে খুব বেশী নেই। যতটা দেখছি, এ বিষয়ে গৌরীর আগ্রহও আমার চেয়ে কম নয়, হয়তো বেশিই। কিন্তু শুধু আমাদের কথা ভাবলেই তো চলবে না ; যে দুজনের বিয়ে, প্রধানত তাদের দিক থেকেই তো কথাটা ভেবে দেখতে হবে।"

হরলাল বলিলেন, "কী ভেবে দেখতে হবে বলো ?"

হেমেন্দ্র বলিল "যূথিকার কথা ভেবে দেখুন। সে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ. পাস ; আর, দিবাকর বার দুই-তিন ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করেছে। এরূপ অবস্থায় এ বিয়ের প্রস্তাব যূথিকা হয়তো মনে মনে পছন্দ না করতেও পারে।"

হরলাল বলিলেন "এ বিষয়ে তা হ'লে তোমার উপর ভার রইল হেমেন্দ্র, তুমি যূথিকাকে পরীক্ষা ক'রে দেখে তারপর যা ভালো মনে হয় স্থির ক'রো। যূথিকাকে তুমি শুধু বিদ্যে দানই করোনি বাবা, দৃষ্টি দানও করেছ। সেই দৃষ্টি দিয়ে সে শুধু দিবাকরের ফেল করাটাই দেখবে, আর কিছুই দেখবে না—এ আমার একেবারেই মনে হয় না।"

হেমেন্দ্র বলিল, "আমি তাই আশা করি। কিন্তু বাধাটা দিবাকরের দিক দিয়েই খুব গুরুতর হবে ব'লে মনে হয়। যূথিকা এম. এ. পাস শুনলে সে কিছুতেই তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। কাল কলকাতা থেকে আমার ছোট শালা নিশাকরের চিঠি এসেছে। সে লিখেছে, এবার কলকাতায় দিবাকরকে সে একটি

পরমাসুন্দরী মেয়ে দেখিয়েছিল, দিবাকরের পছন্দও হয়েছিল খুব, কিন্তু মেয়েটি ম্যাট্রিক পাস শুনে, সাপ দেখলে মানুষ যেমন আতঙ্কে পালায়, ঠিক তেমনই ক'রে লাহোর পালিয়ে এসেছে।"

অন্তরাল হইতে গৌরী এতক্ষণ সব শুনিতেছিল, এবার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কিন্তু যূথিকা তো ম্যাট্রিক পাস-করা মেয়ে নয়! সুতরাং তার কথা স্বতন্ত্র। তার কথা শুনে দিবাকর লাহোর থেকে পালিয়ে না যেতেও পারে।"

গৌরীর কথা শুনিয়া হরলাল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "এ কি তুমি আশা কর বউমা? দিবাকরকে তুমি রাজি করাতে পারবে?"

গৌরী বলিল, "হয়তো পারব। কিন্তু সে পথ যখন একেবারে নিরাপদ নয়, তখন বিয়ে দিতে হ'লে যূথিকার পাস করার কথা লুকিয়ে রেখেই দিতে হয়।"

হেমেন্দ্র বলিল, "তারপর? বিয়ের পর যেদিন সে জানতে পারবে, যূথিকা তার এম. এ. পাস-করা স্ত্রী, সেদিন কী হবে?"

গৌরী বলিল, "সেদিনের ভাবনা আমাদের নয়; সেদিন সামলাবে যূথিকা।" তাহার পর হরলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ বিয়ের বিষয়ে আপনারা যদি মনস্থির ক'রে থাকেন কাকাবাবু, তা হ'লে দিবাকরের ব্যাপার আমার আর যূথিকার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আপনারা অন্য সব ব্যাপারে মন দিন।"

যুক্তকর ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া হরলাল বলিলেন, "জয় মা গৌরী! আমি তা হ'লে তোমারই শরণাপন্ন হ'য়ে নিশ্চিন্ত হলাম।"

হেমেন্দ্র বলিল, "কিন্তু যূথিকার পাসের কথা লুকিয়ে রেখে বিয়ে দিতে হ'লে দিবাকরকে এখানে বেশীদিন আটকে রাখা চলবে না। হঠাৎ কারও মুখে পাসের কথা শুনে ফেললে, তখন সমস্ত পণ্ড হ'য়ে যাবে। বিয়েতে যদি তার সম্মতি পাওয়া যায়, তা হ'লে অবিলম্বে তাকে অন্য কোথাও চালান দিতে হবে।"

ঈষৎ চিন্তিত মুখে গৌরী বলিল, "কিন্তু সেও তো ভারী কঠিন কথা। এত লেখালেখি ক'রে এতদিন পরে তাকে আনিয়ে দুদিন যেতে না-যেতেই কী করে বলা যায়—এবার তুমি যাও।"

হেমেন্দ্র বলিল, "সেটা কৌশলে বলতে হবে। ধরো মীরাটে যোগেনের কাছে তাকে পাঠানো কতকটা সহজ হ'তে পারে।"

যোগেন্দ্র হেমেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সহোদর। সকৌতূহলে গৌরী বলিল, মীরাটে কী ক'রে পাঠাবে?

হেমেন্দ্র বলিল, "কিছুদিন থেকে ছোটবউমার শরীর তো অসুস্থ যাচ্ছে, হঠাৎ মীরাট থেকে এমন একটা চিঠি আসবে, যে কারণে একবার তাঁকে দেখে-শুনে আসবার জন্যে তোমার মীরাট যাওয়ার দরকার হবে। আমার কলেজ; সুতরাং দিবাকরকে নিয়ে তুমি মীরাট যাবে। তারপর সেই অসুখ-বিসুখের সংসারে এমন

তুমি আটকে পড়বে যে দিবাকরকে বাংলা দেশে চালান না দিয়ে কিছুতেই লাহোর ফেরা তোমার সম্ভব হবে না।" বলিয়া হেমেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গৌরী বলিল, "তারপর, দিবা যদি মীরাটে এক মাস ধ'রে ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে ব'সে আড্ডা দেয়, তা হ'লে আমাকেও তো ঘর-সংসার ফেলে সেখানে এক মাস ব'সে থাকতে হবে ?"

হেমেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয় হবে। পরোপকার করতে গেলে কিছু-না-কিছু আত্মোৎসর্গ করতেই হয়।"

"আচ্ছা, সে যেমন হয় পরে করা যাবে। উপস্থিত আর কী কথা আছে বল ?"

হেমেন্দ্র বলিল, "আর দুটি কথা আছে। প্রথম কথা, উদ্দেশ্য সাধু হ'লেও উপায় যখন অবলম্বন করা হচ্ছে অসাধু, তখন অপরাধের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তোমার, কারণ তুমি হচ্ছ দিবাকরের ভগ্নী; আর আমার হচ্ছে দ্বিতীয় দায়িত্ব, কারণ আমি তার ভগ্নীপতি।"

সহাস্যমুখে হরলাল বলিলেন, "তাহলে তৃতীয় দায়িত্ব আমার। কিন্তু তা নয় বাবা, এ যদি একান্তই অপরাধ হয় তো এর সব দায়িত্বই আমার।"

হেমেন্দ্র বলিল, "না কাকাবাবু, এ অপরাধে আপনার কোনও অংশ নেই। কন্যাদায় হচ্ছে এমন একটা বিপদ, যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ছলই বলুন, বলই বলুন, আর কৌশলই বলুন, সব কিছুই অবলম্বন করা যেতে পারে।"

গৌরী বলিল, "তোমার দ্বিতীয় কথা কী ?"

"আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ যদি করতেই হয় তো চটপট ক'রে ফেলো; এ সব ব্যাপারে ডিলে ইজ ডেঞ্জারাস।"

হেমেন্দ্রনাথের এ উপদেশ পালন করিতে গৌরী অবহেলা করিল না, সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে গাড়ি পাঠাইয়া যুথিকাকে আনাইয়া লইল।

ক্ষণকাল তাহার সহিত কথোপকথনের পর হেমেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সহাস্যমুখে সে বলিল, "শুনছ ? রাজি।"

সকৌতূহলে হেমেন্দ্র বলিল, "ষোল আনা ?"

"মনে হলো, দু আনা বেশি। কালই সেতারে-এসরাজে বিয়ে হয়ে গেছে; মানুষে মানুষে যতটুকু বাকি আছে, তার জন্যে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।"

"দিবাকে রাজি করাতে পারবে তো ?"

ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত গৌরী কহিল, "ও মা! এখন আর 'করতে পারবে তো' বললে চলবে না—এখন করতেই হবে। যুথিকার সঙ্গে কথা কওয়ার পর কতটা দায়িত্বের মধ্যে পড়লাম, বল দেখি ? কিন্তু মনে হচ্ছে, ভগবানই এর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। হয়তো দিবাকে নিয়েও তেমন কিছু বেগ পেতে হবে না; সহজেই কার্যসিদ্ধি হবে।"

ঔৎসুক্যের সহিত হেমেন্দ্র বলিল, "কেন, সে কিছু বলেছে নাকি ?"

গৌরী বলিল, "মুখ ফুটে কিছু বলে নি, কিন্তু কাল থেকে যূথিকার বাজনার বিষয়ে যখন-তখন যে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে, তাতে মনে হয় যে, উচ্ছ্বাসটা শুধু সেতার আর এসরাজের কথা ভেবেই নয়।" বলিয়া মৃদু হাস্য করিল।

হেমেন্দ্র বলিল, ঠিক যেমন বিয়ের সময়ে আমি আমার অদৃষ্টের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতাম, শুধু শ্বশুর মশায়ের বিষয় আর সম্পত্তির কথা ভেবেই নয়।"

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি যে তোমার শ্বশুর মশায়ের বিষয়-সম্পত্তির কথা কত ভাবতে, তা জানতে আমার আর বাকি নেই।"

স্মিতমুখে হেমেন্দ্র বলিল, "তুমি কি তা হ'লে বলতে চাও গৌরী, আমি আমার শ্বশুর মশায়ের কন্যের কথাই শুধু ভাবতাম ?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গৌরী বলিল, "ওরে, বাপ রে! সে কথা কখনও বলতে পারি! শ্বশুর মশায়ের কন্যেকে বড়লোকের মেয়ে ভেবে তুমি তো প্রায় নাকচ ক'রে দিয়েছিলে ?"

"তারপর ?—তারপর, হঠাৎ দয়াই হলো, না, খেয়ালই হলো, চোখ-কান বুজে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে ক'রে ফেললে।" বলিয়া গৌরী হাসিতে লাগিল।

স্মিতমুখে হেমেন্দ্র বলিল, "তারপর ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গৌরী বলিল, "বা রে! বিয়ের পরের 'তারপর' তো তুমি বলবে।"

হেমেন্দ্র বলিল, "বলতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সে 'তারপর' শুনলে তোমার মনে গর্ব হবে গৌরী।"

মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিল, "না না, সে 'তারপর শোনা এখন থাক্। এ-সব কথার আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নেই। ড্রয়িং-রুমে যূথিকা বেচারা একলা ব'সে আছে, তুমি একটু তার কাছে যাও, আমি তোমাদের চায়ের ব্যবস্থা ক'রেই আসছি।"

"দিবাকর কোথায় ?"

"সে বেড়াতে বেরিয়েছে। ভালোই হয়েছে; সে বাড়ি থাকলে যূথিকার সঙ্গে কথা কওয়ার হয়তো একটু অসুবিধে হ'তো।" বলিয়া গৌরী প্রস্থান করিল।

পাঁচ

ড্রয়িং-রুমে বসিয়া যূথিকা একটা বাংলা মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময়ে হেমেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "ধন্যবাদ যূথিকা! তুমি যে আমাদের পরমাত্মীয় হ'তে সম্মত হয়েছ, এর জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমাকে লাভ ক'রে আমার শ্বশুর বাড়ির কতটা শ্রীবৃদ্ধি হবে তা আমার চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। যে-সঙ্গীত তোমাদের দুজনের মিলনের পথ এত শিগ্‌গির সুগম করেছে, তোমাদের দুজনের ভবিষ্যৎজীবন যেন সেই সঙ্গীতের মতো মধুর হয়—এই কামনা করি।"

নত হইয়া যূথিকা হেমেন্দ্রর পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "যদিও এ কথার এমন কিছু প্রয়োজন নেই, তবুও তোমাকে আমি পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত করছি, তোমার সিদ্ধান্তে একটুও ভুল হয় নি। দিবাকরের মতো সহৃদয় সচ্চরিত্র আর ভদ্র ছেলে আজকালকার দিনে দুর্লভ—এ কথা বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া সংসার চালনার জন্যে যে অর্থের একান্ত প্রয়োজন তা তার প্রচুর আছে, সে কথা তুমি নিশ্চয় শুনেছ। তোমার জীবন সে আনন্দময় করতে পারবে—এ বিশ্বাস আমার সম্পূর্ণ আছে।"

একজন ভৃত্য আসিয়া চা প্রস্তুত হওয়ার সংবাদ দিয়া গেল।

হেমেন্দ্র বলিল, "এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, ইউনিভার্সিটির লেখাপড়ায় দিবাকরের পরিচয় নিতান্তই সামান্য। কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্যে কাজ-কর্ম চাকরি-বাকরির আশ্রয় নেবার প্রয়োজন যার নেই, তার পক্ষে ইউনিভার্সিটির বিদ্যের অভাব অক্ষমণীয় অপরাধ নয়, যদি তার নিজের মাতৃভাষা আর সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে একটা ভালো রকম সংস্কৃতির অধিকার থাকে। আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি, সে অধিকার দিবাকরের আছে। কথাবার্তার ভঙ্গি আর বাঁধুনি থেকে আমি তার শিক্ষিত মনের পরিচয় পেয়েছিলাম; তারপর তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা ওঠার পর থেকে আজ সারাদিন তার সঙ্গে আলোচনা ক'রে বুঝেছি, বাংলা সাহিত্যে তার বেশ অধিকার আছে। ইংরেজী সাহিত্যে তোমরা যা অধিকার আছে, বোধ হয় তার চেয়ে কম নয়।" বলিয়া হেমেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

গৌরী আসিয়া বলিল, "চা ফেলেছি, কড়া হ'য়ে যাবে। চল, চা খেতে খেতে গল্প করবে।"

যূথিকাকে লইয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত হইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "কই দিবাকর এখনও ফিরল না?"

গৌরী বলিল, "তার আসতে হয়তো দেরি হবে, যূথিকা আসার মাত্র মিনিট পাঁচ-সাত আগে সে বেরিয়েছে; ওদের বাড়িতে কার আসবার কথা আছে বলে ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। দিবার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করবার

দরকার নেই।"

কিন্তু চা-পানের কিছু পরে যূথিকা যখন গৃহে ফিরবার জন্যে গৌরীর সহিত বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল, তখন দেখা গেল দিবাকর দ্রুতপদে গেটে প্রবেশ করিতেছে।

নিকটে আসিয়া যূথিকার দিকে চাহিয়া উৎফুল্ল মুখে সে বলিল "নমস্কার মিস্ মুখার্জি।"

ঈষৎ আরক্তমুখে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "নমস্কার।" তারপর গৌরীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "চললাম বউদি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "সে কি। এরই মধ্যে চললেন কেন? এই তো সবে সন্ধ্যে হয়েছে. দিদির মুখে শুনছিলাম, আপনি গান গাইতে পারেন খুব ভালো। যদি দয়া করে এক আধটা গান গান, খুবই খুশি হব। এরই মধ্যে যাবেন না মিস্ মুখার্জি।"

সলজ্জমুখে যূথিকা বলিল, "বাড়িতে একটু কাজ আছে।"

নির্বন্ধসহকারে দিবাকর বলিল, "তেমন যদি অসুবিধা না হয়, তা হ'লে সে কাজটা কালকের জন্যে রাখলে হয় না মিস্ মুখার্জি?"

যূথিকার বিমূঢ় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গৌরী প্রচুর কৌতুক অনুভব করিতেছিল। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে দিবাকরের সহিত তাহার বিশেষ একটা অভিসন্ধিমূলক আলোচনা শেষ হইবার পূর্বে দিবাকর এবং যূথিকার বেশিক্ষণ একত্রে থাকা নিরাপদ নহে মনে করিয়া সে বলিল, "ও কী ক'রে থাকবে বল? ওর যে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। ওদের বাড়িতে এখনই লোক আসবার কথা।"

যেটুকু কৌশল গৌরী প্রয়োগ করিল তাহা ব্যর্থ হইল না। বিবাহের সম্বন্ধ এবং বাড়িতে লোক আসা দুইটি পরস্পর সম্বন্ধ ব্যাপার মনে করিয়া ঈষৎ নিষ্প্রভমুখে যূথিকার দিকে চাহিয়া দিবাকর বলিল, "ও! সেই কাজের কথা বলছিলেন বুঝি! না, তা হলে আর কেমন ক'রে থাকেন! না, তা হ'লে যেতেই হয়।"

এ কথার কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া দিবাকরের ধারণাকে যূথিকা আরও পাকা করিয়া দিল। সে কিছুতেই বলিতে পারিল না যে, যে সম্বন্ধের কথা গৌরী বলিতেছে তাহা দিবাকরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ এবং তাহাদের বাড়িতে যে লোকের আসিবার কথা সে দিবাকর ভিন্ন অপর কেহই নহে।

সহসা একটা কথা মনে করিয়া দিবাকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তাহলে দেখছি, বেশ একটা কাণ্ড ক'রে এসেছি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার ঔৎসুক্যের অন্ত রহিল না।

সকৌতূহলে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আবার কী কাণ্ড করে এলি রে!

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "মিস্ মুখার্জিদের বাড়ি গিয়েছিলাম কাকাবাবু

আর কাকিমার সঙ্গে আলাপ করতে। কিছুতেই তাঁরা ছাড়লেন না, অনেক কিছু খাবার খাওয়ালেন। তার মধ্যে ডিমের প্যাটিগুলো ভারি ভালো লাগল। চেয়ে চেয়ে বোধ হয় দশ-বারোখানাই খেয়ে ফেললাম। তারপর আরও খান-দুই চাইতে কাকিমা একেবারে অপ্রস্তুতের শেষ। বললেন, আর একদিন তৈরি করিয়ে খাওয়াবেন।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিস্মিতকণ্ঠে গৌরী বলিল, "অতগুলো প্যাটি সব খেয়ে ফেললি ?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "সব। একখানাও বাকি রাখি নি। আবার শুনলাম খাবারের মধ্যে ঐ খাবারটাই মিস্ মুখার্জি তৈরি করেছিলেন।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্ মুখার্জি, আপনার তৈরি খাবার নিয়ে পাত্রপক্ষের মন বেশ খানিকটা ভোলানো যেতে পারত, কিন্তু আমি তার সব সুযোগ নষ্ট ক'রে এসেছি। তবে আমার বিশেষ অপরাধ নেই; কারণ প্যাটিগুলো এত ভালো করেছিলেন যে, শেষ না ক'রে কিছুতেই থামা গেল না। তা ছাড়া পাত্রপক্ষের লোকের আসবার কথা আছে তা আমি সত্যিই জানতাম না। এখানে এসে শুনছি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া সলজ্জ কৌতুকের চাপা হাসিতে যূথিকার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "আমার তো মনে হয় পাত্রপক্ষের লোকের আসবার কথা আছে জানলেই তুই অন্য সব খাবারগুলোও শেষ ক'রে আসতিস।"

সকৌতূহলে দিবাকর বলিল, "কেন বল দেখি ?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া গৌরী বলিল, "পাত্রপক্ষের লোকের উপর রাগ ক'রে।"

গৌরীর কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "শোন একবার কথা। পাত্রপক্ষের লোকের উপর আমি রাগ করব কেন ?"

গম্ভীর মুখে গৌরী বলিল, "পাত্রপক্ষের লোকেরা সম্বন্ধ ক'রে যূথিকাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় ব'লে।"

এ কথাটা দিবাকরের অতিশয় গোলমেলে বলিয়া মনে হইল। পাত্রপক্ষের লোকের উপর একেবারেই যে রাগ হয় না তাহা খুব জোরের সহিত বলা চলে না, হয়তো একটু হয়; কিন্তু যে কারণে হয় তাহা এমন অনির্ণেয় এবং এখনও তাহার অস্তিত্ব অবচেতন মনের এমন গোপন প্রদেশে নিহিত যে, তাহা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করা চলে না। কথাটা এড়াইয়া গিয়া দিবাকর বলিল, "কোথায় সম্বন্ধ হচ্ছে ?"

গৌরী বলিল, "কেন সে খোঁজে তোর কী দরকার ?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "না, দরকার আর এমন বিশেষ কী। তবে বাংলা দেশে যদি হয়, তা হ'লে ভবিষ্যতে ওঁর বাজনা শোনবার কিছু সম্ভাবনা

হয়তো থাকে।"

"ওঁর বাজনা এত ভালো লাগে তোর ?"

দিবাকর বলিল, "লাগে। উনি এত ভালো বাজান যে, ওঁর বাজনা ভালো না লাগা একটা অপরাধ ব'লে আমি মনে করি।"

হাসি চাপিয়া গৌরী বলিল, "বাংলা দেশেই ওর সম্বন্ধ হচ্ছে।"

গাড়ির দরজা খোলাই ছিল, ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গাড়ির ভিতরে গিয়া বসিয়া যূথিকা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

যূথিকার পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া গাড়ির দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঔৎসুক্যের সহিত দিবাকর বলিল, "বাংলা দেশে ওঁর সম্বন্ধ হচ্ছে ? বাংলা দেশে কোথায় ?"

গৌরী বলিল, "যদি বলি আমাদের মনসাগাছা গ্রামে ?"

সবিস্ময়ে দিবাকর বলিল, "মনসাগাছা গ্রামে ? মনসাগাছায় কার সঙ্গে ?"

গৌরী বলিল, "যদি বলি, তোর সঙ্গে ?"

এবার গৌরীর কথা শুনিয়া দিবাকর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গৌরী বলিল, "হাসলি যে বড় ?"

দিবাকর বলিল, "কী যে বল তুমি দিদি! আমার মতো লোকের সঙ্গে ওঁর—" বলিয়া কথা শেষ না করিয়া পুনরায় হাসিতে লাগিল।

যূথিকার নিকট হইতে সঙ্কেতে আদেশ পাইয়া গাড়ি তখন ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ড্রয়িং রুমে ফিরিয়া আসিয়া গৌরী বলিল, "যূথিকার সঙ্গে তোরই সম্বন্ধ হচ্ছে দিবা, ওদের বাড়ি গিয়ে তুই যে প্যাটি খেয়ে এসেছিস সে আর কোনও পাত্রপক্ষের জন্যে তৈরি হয় নি।"

বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া দিবাকর বলিল, "বল কী দিদি!"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ, ঠিকই বলি। কিন্তু ও কথাটা তুই তখন ভালো বললি নে ভাই। কি জানি, যূথিকা হয়তো বা একটু অপমানিত বোধ করেই চলে গেল।"

উদ্বিগ্নমুখে দিবাকর বলিল, "কী কথা বলোতো ?"

ঐ যে তুই বললি, তোর মতো লোকের সঙ্গে ওঁর – না-কি। তাতে হয়তো ও মনে করবে, তুই বলতে চাস যে, তোর মতো ধনী লোকের সঙ্গে ওর মতো গরিবের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তোর ঐ হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া মতোই হালকা।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "না না, দিদি এ কথা কখনই সে মনে করে নি। এমন কথা কিছুতেই আমি বলতে পারি নে, এটুকু সে নিশ্চয় বোঝে।"

সে কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া গৌরী বলিতে লাগিল, "আর সত্যিই তো তোর তুলনায় যূথিকার এমন কীই বা আছে ? থাকবার মধ্যে তো একটুখানি

চেহারার শ্রী, ঐ একটু সেতার আর এসরাজ বাজনা, আর—" অসমাপ্ত কথার মধ্যে গৌরী সহসা থামিয়া গেল।

প্রবল আগ্রহের সহিত দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "আর ? আর কী বলো ?"

গৌরী বলিল, "আর ? আর তার মিষ্টি স্বভাব, শান্ত প্রকৃতি।"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "আর লেখাপড়া ?"

গৌরী বলিল, "সেইটেই তো হয়েছে—ওর সবচেয়ে লজ্জা আর বিপদের কথা। ওর লেখাপড়ার যথার্থ অবস্থার কথা শুনলে তোর মতো লোকও হয়তো ঘাবড়ে যেতে পারে।"

একটা অভাবনীয় প্রত্যাশার আশ্বাসে দিবাকরের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "কেন বলো দেখি ? লেখাপড়া তেমন কিছু করে নি নাকি ?"

পূর্বের ন্যায় এ প্রশ্নেরও সাক্ষাৎ সোজা উত্তর না দিয়া গৌরী বলিল, "আজ-কালের দিনে লেখাপড়া করা কি সহজ কথা রে দিবা ? যূথিকার বাপের মতো দরিদ্র লোকদের ক'টা মেয়ের লেখাপড়া সম্ভব হয় বল দেখি ? ভদ্রলোক তো মোটে শ দেড়েক টাকা পেন্‌শন পান, তারপর একপাল পুষ্যি।"

মনে মনে যৎপরোনাস্তি আশ্বস্ত হইয়া দিবাকর বলিল, "সে কথা সত্যি।" তাহার পর যূথিকা লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানে না—এই বিশ্বাসে নিরাপদ বাহাদুরি করিবার লোভে বলিল, "কিন্তু এত বড় মেয়ে শুধু এসরাজ আর সেতার বাজাতেই শিখেছে, খানিকটা লেখাপড়া শেখাও উচিত ছিল। আমি অবিশ্যি মেয়েদের পাস করবার পক্ষপাতি নই; কিন্তু ঠিকানাটা লেখা টেলিগ্রামটা পড়া—এই রকম ছোটখাটো কাজ চালাবার মতো একটু লেখাপড়া জানা মন্দ নয়।"

গৌরী বলিল, "বেশ তো, বিয়ের পরে ওর বিদ্যে পরীক্ষা করে দেখে যদি কিছু দরকার মনে হয় তো সেটুকু শিখিয়ে পড়িয়ে নিস। কিন্তু খবরদার ভাই, বিয়ের আগে ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে, খবরদার—এই সব লেখাপড়ার কথা তুলে ওকে যেন লজ্জা দিস নে। বড়সড় হয়েছে, এখন অতি অল্পতেই মনে আঘাত লাগতে পারে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "না না, দিদি, তা কখনও পারি! এটুকু সাবধান তুমি আমাকে না করে দিলেও পারতে।"

প্রসন্নমুখে গৌরী বলিল, "বেশ কথা। তা হলে যূথিকার বাপকে কথা দিতে পারি ?—কী বলিস ?"

দিবাকর বলিল, "ওঁরা সত্যি সত্যিই এ প্রস্তাব করেছেন না কি ?"

গৌরী বলিল, "করেছেন শুধু নয়, এর জন্যে কাল রাত্রি থেকে হরলালবাবুর স্ত্রী আর হরলালবাবু ঝুলোঝুলি করছেন। যূথিকার মত জানবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে এনেছিলাম।"

আগ্রহের সহিত দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "তার মত আছে ?"

"সম্পূর্ণ।"

"কী করে জানলে ?"

"যেমন করে তোর মত জানছি। জিজ্ঞাসা করে করে।"

একটু ইতস্তত করিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত দিবাকর বলিল, "কী উত্তর দিলে তোমাকে।"

স্মিতমুখে গৌরী বলিল, "সে কথাও শুনতে হবে নাকি তোর ?"

হাসিয়া ফেলিয়া দিবাকর বলিল, "কী জানো দিদি, চিরদিনই নিজেকে অপদার্থ বলে জেনে এসেছি, আজ বাজারে হঠাৎ একটু দর পেয়ে দরটা যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "সে যাচাই তো হয়ে গেছে দিবা। বাজারে তোর দর অনেক, ইচ্ছামাত্র তুই যখন যূথিকার মতো একটি বহুমূল্য রত্ন অনায়াসে অধিকার করতে পারিস।"

মনে মনে দিবাকর বলিল, 'বহুমূল্য নয়, অমূল্য।'

একটি রত্ন হাতে লইয়া মানুষে যেমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার দীপ্তি পরীক্ষা করিয়া দেখে, দিবাকর তেমনি যূথিকাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। কোনও দিক হইতে বিকীর্ণ হইল তাহার হাস্যের সুষমা, কোনও দিক হইতে তাহার গঠনের ভঙ্গি, কোনও দিক হইতে তাহার প্রকৃতির মাধুর্য, কোনও দিক হইতে বা তাহার সঙ্গীতবিদ্যার নিপুণতা।

মনে মনে খুশি হইয়া দিবাকর বলিল, "তোমাদেরও মত আছে তো দিদি ? তোমার ? জামাইবাবুর ?"

গৌরী বলিল, "ষোল আনা। যূথিকার সঙ্গে তোর যদি বিয়ে হয়, তা হলে নিশ্চয় বলতে হবে তোর ভাগ্য ভালো। তার লেখাপড়ার দিকটা যদি ক্ষমা করে নিতে পারিস ভাই, তা হলে কোনও গোল থাকে না।"

ব্যস্ত হইয়া দিবাকর বলিল, "না না দিদি, ঐটেই আমার একটা বড় রকম আগ্রহের কারণ হওয়া উচিত। এ বিয়ে হয়ে গেলে আর কিছু না হোক, নিশার হাত থেকে রক্ষে পাই। কোন্ দিন ও লুকিয়ে চুরিয়ে একটা ম্যাটি্কুলেশন-টুলেশন-পাস করা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি!"

মনে মনে যুগপৎ শঙ্কিত এবং পুলকিত হইয়া গৌরী বলিল, "তা ছাড়া প্রাণভরে সেতার আর এসরাজ শুনতে পাবি।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "হ্যাঁ, সে-ও একটা মস্ত প্রলোভন বটে।"

গৌরী বলিল, "তা হ'লে রাজি তো ?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, রাজি।" তাহার পর এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করিয়া বলিল, "বিয়ের দিনও তোমরা স্থির ক'রে ফেলেছ না কি ?"

গৌরী বলিল, "একটু আগে পাঁজিটা দেখছিলাম। বিয়ের দিন নিয়েই যত গোলে পড়েছি। আজ বাইশে শ্রাবন। এ মাসে বিয়ের শেষ তারিখ চব্বিশে। তারপর একবারে তিন মাস পরে অঘ্রাণ মাসে দিন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তিন মাস নিশার হাতে আমাকে ফেলে রেখো না দিদি। সে যে রকম কোমর বেঁধে লেগেছে, তাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে। করতে যদি হয় তো চব্বিশেই সেরে ফেলা ভালো।"

মনে মনে অল্প উদ্বিগ্ন এবং অনেকখানি উৎফুল্ল হইয়া গৌরী বলিল, "মাত্র দুদিন। এত অল্প সময়ে কী ক'রে হয়ে উঠবে রে দিবা?"

দিবাকর বলিল, "কপালকুণ্ডলা পড়েছ তো দিদি। হিজলীর মন্দিরের অধিকারী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিয়ে দিতে পেরেছিল। আর তুমি জামাইবাবু দুজনে মিলে এত বড় লাহোর শহরে দুদিনে পারবে না?"

ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া গৌরী বলিল, "তা হয়তো পারব। সকালে কথা আরম্ভ হয়ে রাত্রে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এমনও তো হয়। কিন্তু লাহোর থেকে মনসাগাছার জমিদারের বিয়ে হ'লে গ্রামের লোকে বলবে কী?"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "যাই বলুক-না কেন, বউভাতের ভোজে কলকাতার সন্দেশ-রসগোল্লা দিয়ে ভালো ক'রে মুখ বন্ধ ক'রে দিলে আর কিছু বলতে পারবে না।"

"সে যা-হয় হবে। কিন্তু নিশা? নিশাও বিয়েতে উপস্থিত থাকবে না?"

মনে মনে একটু হিসাব করিয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "কী করে থাকে বল? আজ এখনই টেলিগ্রাম ক'রে দিলেও পঁচিশে সকালের আগে সে কিছুতেই পৌঁছতে পারে না। তা ছাড়া মাত্র দিন পাঁচেক আগে তার পছন্দসই ম্যাট্রিক পাস করা মেয়েকে নাকচ করে একজন লেখাপড়া-না জানা মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে তাকে বারো শো মাইল টেনে আনলে সে খুশি হবে না।"

সেই দিনই ঘণ্টাখানেক পরে হেমেন্দ্র এবং গৌরী দু'জনে হরলাল মুখোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত হইল, এবং সকলের মধ্যে কথাটা আলোচিত হইয়া চব্বিশে তারিখেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

ছয়

বিবাহের পরদিন প্রত্যুষে দিবাকর এক সময়ে হেমেন্দ্রের গৃহে আসিয়া গৌরীকে বলিল, "আজ সন্ধ্যায় আমরা দুজনে কলকাতা চললাম দিদি। যত শিগগির সম্ভব তোমরা কলকাতায় পৌঁছো। তোমরা পৌঁছলে তার পর সকলে মিলে মনসাগাছা রওনা হওয়া যাবে।"

সবিস্ময়ে গৌরী বলিল, "সে কী রে! আজ তুই কী করে যূথিকাকে নিয়ে যাবি, আজ যে কালরাত্রি! আজ রাত্রে বউয়ের মুখ দেখতে নেই।"

গৌরীর কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কালরাত্রি কখনও আজ হয় না দিদি; কালরাত্রি কাল গেছে, আবার কাল আসবে; এ কালের সমস্ত রাত্রিই আজ রাত্রি। তা ছাড়া, কাল রাত্রেই যখন কুশণ্ডিকে হয়ে গেছে, তখন ষোল আনা বিয়ে হওয়ার পর আর কালরাত্রির কথা ওঠে না।"

মনে মনে কী চিন্তা করিতে করিতে গৌরী বলিল, "ও-নিয়মের কথা আমি জানি নে। আচ্ছা তাই যেন হ'লো, কিন্তু কাল রাত্রে তোদের যে ফুলশয্যে রে! কাল রাত্রে তো তোরা গাড়িতে থাকবি।"

দিবাকর বলিল, "বিয়েটা যেমন অদ্ভুতভাবে হলো, ফুলশয্যে রেলগাড়িতে হলে তার সঙ্গে বেখাপ্পা হবে না।" তারপর নির্বন্ধপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "না দিদি, তুমি অমত করো না। জামাইবাবুর মতও তোমাকে করিয়ে দিতে হবে।"

দিবাকরের প্রকৃতি গৌরীর অজানা ছিল না; চূড়ান্তভাবে যে সঙ্কল্পের মধ্যে সে একবার প্রবেশ করে, তাহা হইতে তাহাকে নিরস্ত করা কঠিন, বিশেষত সেই সঙ্কল্পের মধ্যে খেয়ালের প্রভাব বর্তমান থাকিলে,—তাহা সে ভালো করিয়াই জানিত। বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে সেই ব্যবস্থাই না হয় করি। কাকাবাবুদের মত নিয়েছিস তো?"

দিবাকর বলিল, "নিয়েছি। আমরা রওনা হ'লে পরশু সকালে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থাকার জন্যে নিশাকে আজই একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ো। কিন্তু আমি যে বিয়ে ক'রে যাচ্ছি, সে কথা জানিয়ো না।"

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "আচ্ছা।"

হেমেন্দ্র শুনিয়া বিশেষ আপত্তি করিল না। বলিল, "তা মন্দ নয়, দু রাত্রি রেল-গাড়িতে হানিমুন,—বেশ একটু নূতনত্ব হবে।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা পাঞ্জাব মেলে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া দিবাকর এবং যূথিকা কলিকাতা রওনা হইল।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতির সহিত দিবাকর কথোপকথন করিতেছিল। হেমেন্দ্র এবং গৌরী রেল গাড়ির কামরার মধ্যে যূথিকার নিকট বসিয়া ছিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "দিবাকরকে দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জানো যূথিকা?"

জিজ্ঞাসুনেত্রে যূথিকা হেমেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "মনে হচ্ছে, Vini, Vidi, Vici,—এলাম, দেখলাম আর জয় করে নিয়ে চললাম। ওর মধ্যে যে এতখানি শক্তি আছে, তা জানা ছিল না।"

যূথিকার নীরব মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

গৌরী বলিল, "তুমি যে দিবাকরের মূর্খ-স্ত্রী নও, এম. এ. পাস করা বউ, সেটা

তাকে প্রথম সুযোগেই বুঝিয়ে দিয়ো।”

হেমেন্দ্র বলিল, “আর তারপর তাকে বুঝিয়ে ব'লো যে, উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তা হ'লে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসাধু উপায় অবলম্বন করাও অসাধুতা নয়। সুতরাং তোমার লেখাপড়ার বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করবার সময় তোমার দিদি যে 'ইতি গজ' নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তা সে ক্ষমা করতে পারে।” বলিয়া হাসিতে লাগিল।

গৌরী বলিল, “যূথিকার সুন্দর মুখ সামনে থাকলে সে তার দিদিকে অনায়াসেই ক্ষমা করতে পারবে।” তারপর যূথিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “তুমি সে জন্যে একটুও ভয় ক'রো না যূথিকা—সুযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্র তাকে জানিয়ে দিয়ো। দেরি ক'রো না।”

ঊর্ধ্বলোকে বিধাতাপুরুষ সকৌতুকে বলিলেন, 'সে সুযোগের ব্যবস্থা আমি এই পাঞ্জাব মেলে ক'রে রেখেছি গৌরী।'

গাড়ি ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পার হইবার পর দিবাকর যূথিকার দক্ষিণ হস্তখানি নিজ হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, “আমার কী মনে হচ্ছে জানো যূথিকা?”

অপাঙ্গে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, “কী মনে হচ্ছে?”

দিবাকর বলিল, “মনে হচ্ছে দিন আষ্টেক-নয় আগে মনসাগাছা থেকে বেরিয়ে হুড়তে-পুড়তে লাহোরে এসে এই যে তোমাকে দিন চার-পাঁচেকের মধ্যে বিয়ে ক'রে নিয়ে কলকাতায় ছুটে চলেছি—এ একটা স্বপ্ন নয় তো? হঠাৎ যদি কোনও মুহূর্তে জেগে উঠে দেখি, এর সবটাই স্বপ্ন, মনসাগাছার দোতালায় দক্ষিণ দিকের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে আছি, তা হ'লে কী মনে হবে জানো?”

যূথিকা বলিল, “কী মনে হবে?”

“মনে হবে, এর চেয়ে ভীষণ দুঃস্বপ্ন জীবনে কোনদিন দেখি নি।”

যূথিকা বলিল, “কেন আমি এতই ভীষণ না-কি?”

যূথিকাকে আর একটু নিকটে টানিয়া লইয়া দিবাকর বলিল, “হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি এতই ভীষণ।”

যূথিকা বলিল, “একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি উত্তর দেবে?”

“কী কথা?”

“দিদির মুখে আমি সব শুনেছি। আচ্ছা, পাস করা মেয়ের ওপর তোমার অত ঘৃণা কেন?”

দিবাকর বলিল, “পাস করা মেয়ের ওপর আমার কতটা ঘৃণা আছে তা বলতে পারি নে কিন্তু মূর্খস্য বিদুষী ভার্যা অর্থাৎ মূর্খ মানুষের বিদুষী স্ত্রী আমি একেবারেই পছন্দ করি নে। তুমি জানো, আমি তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেছি?”

যূথিকা বলিল, “জানি। কিন্তু তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করলে মূর্খ হয় এ তোমাকে কে বললে? এম. এ. পাস ক'রেও কত লোক মূর্খ থাকে তা

তুমি জানো ?"

দিবাকর বলিল, "তা জানবার মতো আমার যথেষ্ট বিদ্যে নেই যূথিকা।"

সদ্য বিবাহিত স্বামীর আত্মক্রটি স্বীকৃতির এই অনাবৃত কুণ্ঠাহীনতা দেখিয়া একটা সুমিষ্ট শ্রদ্ধায় এবং বেদনায় যূথিকার মন সরস হইয়া উঠিল। বলিল, "বিদ্যে না থাকলেও জানবার মতো বুদ্ধি তোমার যথেষ্ট আছে। আচ্ছা, দিদির কাছে সব কথা জানার পর, ধরো যদি এমন কথাও জানতে যে আমি ম্যাট্রিক-পাস করা মেয়ে, তা হ'লে তুমি আমাকে বিয়ে করতে ?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "এত শক্ত শক্ত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না যূথিকা। জানো তো আমার ফেল-করা অভ্যেস আছে, শেষকালে তোমার কাছেও ফেল করতে আরম্ভ করব। তার চেয়ে বার কর তোমার সেতার আর এসরাজ—এস, দুজনে মিলে খানিকটা বাজানো যাক।"

যূথিকা বলিল, "বাজনা পরে হবে, তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এবার কলকাতায় যে পরমাসুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে ঠাকুরপো তোমার সম্বন্ধ করেছিলেন, তাকে বিয়ে করলে না কেন ?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "সে কথাও শুনেছ ?"

"শুনেছি। কেন বিয়ে করলে না বলো ?"

কী বলিবে ভাবিতে ভাবিতে দিবাকরের মুখ সহসা নিঃশব্দ হাস্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "হ'লে তোমার সঙ্গে বিয়ে হতো না ব'লে। কেমন, ঠিক বলেছি কিনা ? দাও, নম্বর দাও, ফুল নম্বর—একেবারে পঁচিশের মধ্যে পঁচিশ।"

দিবাকরের হাতখানা একটু চাপিয়া ধরিয়া যূথিকা বলিল, "না ঠাট্টা নয়। বল না, কেন বিয়ে করলে না ?"

এবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দিবাকর বলিল, "বল কী যূথিকা ? সেই ম্যাট্রিক-পাস করা মেয়েকে আমি বিয়ে করব ? সে মেয়ে ম্যাট্রিক-পাস তা তুমি শোনো নি ?"

যূথিকা বলিল, "শুনেছি। কিন্তু ম্যাট্রিক পাস ক'রে সে তো আর বাঘ হয় নি যে, তাকে এত ভয় !"

দিবাকর বলিল, "না, বাঘ হয় নি। বাঘ হয় এম. এ. পাস করলে। সে বরং ভালো, এক থাবাতে শেষ করে। ম্যাট্রিক পাস করলে মেয়েরা বেড়াল হয়। কাছে গেলেই ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, আর বাগে পেলেই আঁচড়ে দেয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

যূথিকা বলিল, "একটা এম. এ. পাস-করা মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হতো।"

দিবাকর বলিল, "কেন বলো তো ?"

যূথিকা বলিল, "তোমার বন্দুক আছে, বাঘ শিকার করতে।"

দিবাকর বলিল, "আমি তো শিকার করতাম, কিন্তু সে আমাকে স্বীকার

করত না। বলত, যে লোক তিন তিনবার চেষ্টা ক'রে ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি, তাকে আমি অস্বীকার করি।"

যূথিকা বলিল, "আর যদি বলত, যে-লোক তিন-তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করা সত্ত্বেও একজন এম. এ. পাস-করা মেয়েকে বিয়ে করার উপযুক্ত শক্তি ধরে, আমি তাকে ভালোবাসি, তা হ'লে?"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে আমি বলতাম, সে মনে করে বটে তাকে ভালোবাসে, কিন্তু আসলে সে ভালোবাসে তার অর্থ আর বিষয়-সম্পত্তিকে। তা হয় না যূথিকা, কিছুতেই তা হয় না। একজন এম. এ.-পাস করা মেয়ে সত্যি-সত্যিই অন্তরের সঙ্গে একজন ম্যাট্রিক-ফেল-করা স্বামীকে ভালোবাসতে পারে না।"

দিবাকরের এই কথা শুনিয়া যূথিকা হতাশ হইল। কথোপকথনের প্রারম্ভকালে তাহার অল্প আশা হইয়াছিল যে, পাস-করা মেয়ে সম্বন্ধে তাহার স্বামীর অভিমতের ভিত্তি খুব দৃঢ় না হইতেও পারে। কিন্তু অর্থ এবং বিষয়-সম্পত্তির বর্ণে রঞ্জিত করিয়া সে যাহা বলিল তাই যদি তাহার প্রকৃত সবল মনোভাব হয়, তাহা হইলে তো কোনদিনই যূথিকা তাহার স্বামীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না যে, স্বামীর প্রতি তাহার ভালোবাসার মধ্যে অর্থচেতনার কোনও খাদ নাই। কিছুক্ষণ পূর্বে যে সুযোগের প্রত্যাশা আসন্ন মনে হইয়াছিল, এখন মনে হইল তাহা সুদূরপরাহত। কে জানে, কতদিন ধরিয়া তাহাকে অভিশপ্ত বিদ্যার বোঝা বহন করিয়া জীবনকে দুর্বহ করিয়া চলিতে হইবে!

সাত

পাঞ্জাব মেল হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল।

নিজের চিন্তাস্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া যূথিকা বলিল, "তুমি বলছ, একজন এম. এ.-পাস-করা মেয়ে যখন মনে করে তার স্বামীকে ভালোবাসে, তখন কিন্তু সে আসলে ভালোবাসে তার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিকে। কিন্তু এমন একজন মেয়ে, যে এম. এ. পাস কেন, কোন পাসই করে নি, ধরো যাকে এক রকম নিরক্ষরই বলা চলে, সে যখন ভালোবাসে তার স্বামীকে, তখন কি সে তার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিকেও ভালোবাসে না?"

দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় ভালোবাসে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তার স্বামীকেও ভালোবাসে। সে তার স্বামীকে ধনবান মনে করে, কিন্তু মূর্খ মনে করে না। তুমি জানো না যূথিকা, বিদ্যের অমিলের চেয়ে বড় অমিল আর নেই। যারা বিদ্বান, যারা পণ্ডিত, যারা ভালো ক'রে লেখাপড়া শিখেছে, তারা মূর্খ লোকদের

সঙ্গে একটা বড় রকমের অন্তরের যোগ কখনও সৃষ্টি করতে পারে না। বিদ্যেটা বাইরের জিনিস তো নয়, অন্তরের জিনিস। অন্তরে সহজে কেউ নিজেকে খাটো করতে চায় না। তাই পণ্ডিত লোক মূর্খ লোককে দয়া করতে পারে, করুণা করতে পারে, এমন কি কখনও বা ভক্তি শ্রদ্ধাও করতে পারে,—কিন্তু ভালোবাসতে পারে না।"

যূথিকা বলিল, "এ কিন্তু তুমি ভুল বলছ। আজকালকার কথা না-হয় ছেড়ে দাও, চিরকাল বিদ্বান স্বামীরা তাদের মূর্খ স্ত্রীদের ভালোবেসে এসেছে।"

দিবাকর বলিল, "তা তো এসেইছে। আজকালকার কথাও ছাড়বার দরকার নেই, আজকালও বাসে। আমি এ পর্যন্ত সেই কথাটাই তোমাকে অন্যরকমে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। বিদ্যে, বুদ্ধি, শারীরিক বল—এই সব ব্যাপারে স্ত্রীরা স্বামীদের চেয়ে একটু খাটো হয়, প্রত্যেক স্বামীই তা ইচ্ছে করে। শুধু তাই নয়,—পুরুষের চক্ষে স্ত্রীলোকের মাধুর্যের একটা অংশই হচ্ছে এই সব গুণের অল্পতা। লতার মতো স্ত্রী জড়িয়ে থাকে, স্বামী তাই চায়; লম্বা তালগাছের মতো খাড়া হ'য়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে তা চায় না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

দিবাকরের কথোপকথনের ভঙ্গি লক্ষ করিয়া যূথিকার হেমেন্দ্রের কথা মনে হইতেছিল। বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে সে বলিল, "দেখ, তুমি যে-সব কথা বলছ, আর যে রকম ক'রে বলছ,—আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আমাদের দেশের এম. এ.-পাস-করা লোকেদের মধ্যে শত-করা পাঁচ জনেও তেমন পারে না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল। বলিল, "সৌভাগ্যক্রমে এম. এ.-পাসের বিষয়ে তোমার ধারণা নেই, তাই এ কথা তুমি বলতে পারলে। কলকাতার সেই ম্যাট্রিক পাস করা মেয়েটিকে এই জন্যেই আমি বিয়ে করতে রাজি হই নি, যদিও অন্য কোনও দিক থেকে তাকে অপছন্দ করবার কারণ ছিল না। সে কখনও আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতেও পারত না, বলতেও পারত না।" ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বলিতে লাগিল, "কেন তুমি পাস-করা মেয়েদের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করছ, তা আমি বুঝতে পারছি যূথিকা। কিন্তু বিশ্বাস করো আমাকে, এ বিষয়ে এমন ক'রে আমার মন পরীক্ষা ক'রে দেখবার কিছুমাত্র দরকার নেই। তুমি যে বেশি লেখাপড়া কর নি, তার জন্যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হ'য়ো না। করোনি ভাই রক্ষে! করতে যদি তা'হ'লে—" বাকটুকু কোন্ ভাষায় কেমন করিয়া বলিলে যূথিকাকে তেমন পীড়া দেওয়া হইবে না, সহসা ভাবিয়া না পাইয়া দিবাকর থামিয়া গেল।

ব্যগ্রকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "তা হ'লে কী হতো?"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হ'লে কী হতো তা বলতে পারি নে; কিন্তু তা হ'লে যা না হ'তে পারত, তার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি।" বলিয়া যূথিকাকে দৃঢ়তর বেষ্টনে আবদ্ধ করিল।

এ কথার উত্তরে কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া যূথিকা নীরবে বসিয়া রহিল।

দ্রুতগতিশীল পাঞ্জাব মেল মাইলের পর মাইল পশ্চাতে ফেলিয়া শট্‌শট্‌ শব্দ করিতে করিতে সুদূর বঙ্গদেশের অভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারই এক কক্ষে নববিবাহিত দম্পতি নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

মৌন ভঙ্গ করিল দিবাকর। বলিল, "মেয়েদেরও অল্প একটু ইংরিজী জানা থাকা ভালো। তুমি ইংরিজী কতটা জানো তা জানি নে। যদি দরকার মনে কর তো সময়মতো অল্প একটু শিখে নিতেও পারো। আমি আছি; তা ছাড়া নিশা আছে। নিশা বি. এ. পড়ছে—শুনেছ বোধ হয়?"

মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "শুনেছি।"

"বি. এ.তে নিশা আবার ইংরিজীতে অনার্স নিয়েছে। অনার্স কাকে বলে জানো?"

কোনও কথা না বলিয়া যূথিকা চুপ করিয়া রহিল।

দিবাকর বলিতে লাগিল, "অনার্স মানে সম্মান। বি. এ.তে ইংরিজীতে মামুলি যে সব বই আছে তার ওপর আরও অনেক শক্ত শক্ত বই পড়ে পাস করলে তাকে অনার্সে পাস করা বলে। নিশা সেই অনার্সের পড়া পড়ছে। ওকে তো ইংরিজীতে বেশ পণ্ডিতই বলা চলে। এবার অবশ্য ওর দ্বারা কিছু হওয়া সম্ভব হবে না। কাজকর্ম চুকে গেলে আমার কাছেই না-হয় একটু আধটু পড়তে আরম্ভ ক'রো, তারপর পুজোর ছুটিতে নিশা এসে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যেতে পারবে।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া বলিল, ইংরিজী ফার্স্ট বুক সেকেণ্ড বুক পড়েছ কি?"

অতি কষ্টে যূথিকা বলিল, "এ সব কথা এখন থাক।"

ব্যগ্রস্বরে দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় থাক্, তুমিই তো এ-সব কথা তুললে যূথিকা, আমি তো তুলি নি। এবার তা হ'লে বার করি তোমার এসরাজ আর সেতার।"

যূথিকা বলিল, "আর একটু পরে। তার আগে তোমাকে একটা কথা বলব।"

ব্যস্ত হইয়া দিবাকর বলিল, "আবার কথা? না না, ও কথাও এখন থাক্। এখন কথা চলুক এসরাজে আর সেতারে।"

ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল পার হইয়া গাড়ির গতি মন্দ হইয়া আসিতেছিল; যূথিকা বলিল, "অমৃতসর বোধ হয় এল। আচ্ছা, অমৃতসরের পরে বলব অখন।"

দেখিতে দেখিতে জনাকীর্ণ কলকোলাহলময় অমৃতসরের প্ল্যাটফর্মে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। দিবাকর ও যূথিকা পরস্পর হইতে একটু দূরে সরিয়া বসিয়া যাত্রী-গণের উঠা-নামার ব্যস্ততা দেখিতে লাগিল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়াছে, গার্ড প্রথম হুইস্‌ল্‌ দিয়াছে, এমন সময়ে গৌরবর্ণ পলিতকেশ একটি সম্ভ্রান্তদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দিবাকরের কামরার সম্মুখে

আসিয়া সানুনয় কণ্ঠে বলিলেন, "বাবুজি, কোথাও জায়গা মিলল না। মেহেরবানি ক'রে আপনার কামরায় যদি একটু আশ্রয় দেন ?"

দিবাকর বলিল, "আমি কিন্তু সমস্ত কামরাটা রিজার্ভ করেছি।"

পশ্চিমা ভদ্রলোকটি বলিল, "তা জানি, সেই জন্যেই আশ্রয় চাচ্ছি। বেশিক্ষণ থাকব না, রাত দশটায় লুধিয়ানায় নেমে যাব।" তারপর যূথিকার দিকে চাহিয়া মিনতিনম্র স্বরে বলিলেন, "মাঈ, তুমি হামার লড়কির সমান, হামি বুড্ঢা মানুষ, এক দিকে প'ড়ে থাকব। বহুৎ ভারী দরকার আছে মাঈ, দয়া করো।"

গার্ডের দ্বিতীয় হুইস্‌ল্ বাজিল। দৌড় দিবার অভিপ্রায়ে এঞ্জিন ধ্বনিময় হইয়া উঠিল।

দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা মৃদুস্বরে বলিল, "আসতে দাও।"

আর আপত্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দিবাকর দরজা খুলিয়া দিল।

পশ্চিমা ভদ্রলোকটি কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পিছনে পিছনে প্রবেশ করিল তাঁহার এক প্রৌঢ় পরিচারক। কুলি যখন ভদ্রলোকের স্যুটকেশ এবং হোল্ড-অল গাড়ির ভিতরে ঠেলিয়া ঢুকাইয়া দিল, তখন গাড়ি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বেঞ্চে বসিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া দিবাকর এবং যূথিকার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "ধন্য বাবুজি, ধন্য মাঈ, হামার প্রতি আপনারা বহুৎ কৃপা করেছেন।"

দিবাকর বলিল, "না না, এমন কিছুই আমরা করি নি যার জন্যে এ কথা আপনি বলতে পারেন। আর যদি কিছু ক'রে থাকেন তো উনিই করেছেন।" বলিয়া যূথিকাকে দেখাইয়া দিল।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সে বাত তো হামি ফওরণ্ বুঝেছিলাম্ বাবুজি লেকিন আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে সেরেফ মাঈকে দিলে মাঈ তো প্রসন্ হোবেন না।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

দিবাকরও হাসিতে লাগিল, যূথিকার মুখেও নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

কথায় কথায় পরস্পরের পরিচয় গ্রহণের পর জানা গেল, ভদ্রলোকটির নাম ব্রিজবিহারী সিং, নিবাস লুধিয়ানা। তথায় তাঁহার তেজারতি এবং শীতবস্ত্রের বিস্তৃত কারবার।

চাকরটি ব্রিজবিহারী সিং-এর হোল্ড-অল হইতে বিছানা বাহির করিতে ব্যস্ত ছিল। দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে ?"

ব্রিজবিহারী বলিলেন, "এটি রামভরোখা লাল, হামার খাওয়াস আছে বাবুজি।"

খাওয়াসের অর্থ দিাকরের জানা ছিল না, জিজ্ঞাসুনেত্রে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অনুচ্চকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "চাকর।"

মৃদুস্বরে বলিলেও এ কথা ব্রিজবিহারীর শ্রবণ অতিক্রম করিল না; আনন্দিত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, চাকর। মাঈ হামাদের হিন্দী বোলী সমঝায়; বাবুজি বিলকুল বাঙালী আছেন।" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া দিবাকর বলিল, "হ্যাঁ সিংজী, আমি বিলকুল বাঙালী আছি।"

হোল্ড-অল হইতে প্রভুর শয্যা বাহির করিয়া রামভরোখা লাল বেঞ্চের উপর ভালো করিয়া পাতিয়া দিল। তাহার পর ব্রিজবিহারী সিং শয্যায় উপবেশন করিলে গাড়ির মেঝের উপর প্রভুর পদতলে বসিয়া মৃদুস্বরে কী জিজ্ঞাসা করিল।

অস্পষ্ট অনুচ্চকণ্ঠে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রিজবিহারী বলিলেন, "দেখলেন তো বাবুজি, এক মিনিটও ওঅকৎ ছিল না, তাই রামভরোখাকেও আপনার গাড়িতে তুলে নিতে হ'লো।" তাহার পর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কিছু যদি মনে না করেন, তা হ'লে আপনাদের কাছে একটা প্রার্থনা করি।"

দিবাকর বলিল, "কি বলুন?"

ব্রিজবিহারী বলিলেন, "এই বুড্ঢা আদমির বহুৎ জোর বাতের বিমারি আছে বাবুজি। সন্ঝাকালে একটু গোড় হাত মলিয়ে না নিলে, তামাম রাত ভারি কষ্ট হোয়। আপনারা কৃপা ক'রে যদি ইজাজৎ দেন তা হ'লে রামভরোখাকে দিয়ে একটু গোড় হাত মলিয়ে নিই।"

দিবাকর বলিল, "থাকলে অবশ্য দোব।" তারপর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, "আমাদের ইজাজৎ আছে নাকি যূথিকা?"

মুখ টিপিয়া অল্প হাসিয়া যূথিকা বলিল, "আছে।"

যূথিকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থানের বিস্তার দেখিয়া খুশি হইয়া দিবাকর বলিল, "আছে? তা হ'লে একটু বার ক'রে দাও।"

যূথিকা বলিল, "ইজাজৎ ট্রাঙ্ক-বাক্স থেকে বার করতে হয় না, মুখ দিয়ে বার করতে হয়। ইজাজৎ মানে অনুমতি।"

যূথিকার কথা শুনিয়া কৌতুকের নিঃশব্দ হাস্যে দিবাকরের মুখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করিয়া বলিল, "কী সর্বনাশ? আমি মনে করেছিলাম, মালিশ ক'রে পা টেপবার জন্যে ইজাজৎ তেল-টেল কিছু হবে।"

প্রার্থিত অনুমতি লাভ করিয়া ব্রিজবিহারী দিবাকরকে ধন্যবাদ দিয়া পিছন ফিরিয়া শয়ন করিলেন। রামভরোখাও প্রভুর পদসেবায় নিযুক্ত হইল।

সদ্য-বিবাহিত বলিয়া ঠিক না বুঝিলেও, দিবাকর এবং যূথিকা যে নববিবাহিত দম্পতি তাহা ব্রিজবিহারী অনুমান করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহাদের বিশ্রম্ভালাপের সুযোগকে যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রিতও যে হইলেন তাড়াতাড়ি তাহার জানান দিলেন প্রগাঢ় নাসিকা-

ধ্বনির ঘোষণায়।

দিবাকর ও যূথিকার মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল, কিন্তু আলাপ জমিল না। ক্রমশই তাহা বেশি বেশি খণ্ডিত এবং সংক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়ে বাহিরের অস্পষ্ট এবং দ্রুতাপসরমাণ দৃশ্যাবলীর দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া দিবাকর যে প্রস্তাব করিল তাহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে যূথিকারও মনে কোনও সন্দেহ রহিল না।

দিবাকর বলিল, "এখন থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত সময়টার যদি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার করতে চাও যূথিকা, তা হ'লে এস, এই সময়ে আমরা খাওয়াটা সেরে নিই। আর, তারপর যদি সম্ভব হয় খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। যখনই হোক, এ দুটো ব্যাপারে যখন খানিকটা সময় দিতেই হবে, তখন এই দুঃসময়ের মধ্যেই সেটা চুকিয়ে ফেলা ভালো। আর খাওয়ার পক্ষে এটা যে খুব অসময় হবে না, তার প্রমাণ আমার পেটের মধ্যে দেখা দিয়েছে।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, তাহার পর টিফিন কেরিয়ার খুলিয়া প্লেটে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিল।

বিস্মিত হইয়া দিবাকার বলিল, "তোমার?"

যূথকা বলিল, "তুমি খাও, পরে এই প্লেটেই আমি নোবো অখন।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "কিছুতেই তা হবে না। হয় এক প্লেটে এক সঙ্গে, নয়, দুই প্লেটে এক সময়ে।"

অগত্যা যূথিকা শেষোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী দুই প্লেটের ব্যবস্থাই করিল।

আহারপর্ব শেষ হইলে উভয়ে লক্ষ করিয়া দেখিল, ব্রিজবিহারী সিং যত্নাপূর্বক নাসিকাধ্বনি করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু দুর্নিবার নিদ্রাকর্ষণ হেতু রামভরোখা লালের প্রভুসেবায় নিরবচ্ছিন্নতা মাঝে মাঝে ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

পাশের দিকের বেঞ্চে যূথিকার এবং মাঝখানের বেঞ্চে নিজের শয্যা রচনা করিয়া দিবাকর যূথিকাকে শয়ন করিতে বলিল। পরে ল্যাভেটরির বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়া কামরার আলো নিভাইয়া দিয়া সে নিজেও শুইয়া পড়িল। ঘষা-কাঁচ-ভেদ-করিয়া-আসা স্তিমিত আলোকের মৃদু প্রভাব জন্য কক্ষ একবারে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল না।

অতি দ্রুতগতির ছন্দ তুলিয়া পাঞ্জাব মেল তখন পরিপূর্ণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই ছন্দের গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে এবং মৃদুমন্দ দোলায় দুলিতে দুলিতে দিবাকর এবং যূথিকা দুই জনেই অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

আট

সুগভীর নিদ্রার মধ্যে দিবাকর হয়তো বা কোনও সুখ-স্বপ্নেই নিমগ্ন ছিল, এমন সময়ে রূঢ় ধাক্কার তাড়নায় জাগ্রত হইয়া শুনিল, "বাবুজি, বাবুজি" বলিয়া কেহ তাহাকে ঠেলিতেছে। ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সম্মুখে রামভরোখাকে দেখিয়া ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেয়া হুয়া?"

"হামারা বাবু সাহেব গির্ গয়েঁ বাবুজি।"

"গির্ গয়েঁ! কাঁহা গির্ গয়েঁ?"

যে বেঞ্চে ব্রিজবিহারী শয়ন করিয়া ছিলেন তাহার পাশের জানালা দেখাইয়া রামভরোখা বলিল, "উ ঝরোখা দে কর একদম ময়দানমে।" তাহার পর "অরে বাপ রে বাপ! সত্যনাশ হুয়া।" বলিয়া ভুক্ ভুক্ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এক লম্ফে অ্যালার্ম চেনের নিকট উপস্থিত হইয়া দিবাকর সজোরে চেন টানিয়া ধরিল।

সর্বনাশ! মাঠে পড়িয়া গিয়াছেন! স্বপ্নের ঘোরে না-কি? পাগল-টাগল নয় তো! অথবা আত্মহত্যার সঙ্কল্প কি-না তাই বা কে বলিতে পারে!

ঘুম ভাঙিয়া যূথিকাও উঠিয়া বসিয়াছিল, বলিল, "টেলিগ্রাফের পোস্ট গুনতে আরম্ভ কর; পেছিয়ে আসবার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।"

"তুমি থামো যূথিকা।" বলিয়া দিবাকর ব্যগ্রকণ্ঠে রামভরোখাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেৎনা বক্ত গির গয়েঁ?"

রামভরোখা বলিল, "তুরন্ত বাবুজি, কোই এক মিণ্ট ভি নহি হোগা। স্বপ্নামে বাবুসাহেব তাড়াক্‌সে বিছৌনা পর উঠ্ বৈঠিন; বস্ ফৌরন ধড়াক্‌সে বাহর গির পড়িন্। ধোখা লাগ্ গিয়া বাবুজি, ধোকা লাগ্ গিয়া।" বলিয়া "আরে বাপ রে বাপ! সত্যনাশ হুয়া।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহা হইলে স্বপ্নই! হায়, হায়, নিতান্ত ভ্রান্তবশে ভদ্রলোক হয়তো বা প্রাণ হারাইলেন!

আর্তকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "এমন দুর্ঘটনা ঘটবে জানলে কে গাড়িতে স্থান দিত! মা গো, এ কি অশুভ কাণ্ড!"

চেন টানার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির গতি দ্রুতবেগে মন্দ হইয়া আসিতেছিল। সহসা এক সময়ে ঘ্যাঁচ করিয়া থামিয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে খুট্ করিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল, এবং পরমুহূর্তেই ল্যাভেটরি হইতে বাহির হইলেন উপস্থিত ঘটনার নায়ক—স্বয়ং ব্রিজবিহারী সিং।

উৎকট বিস্ময়ে দিবাকর, যূথিকা এবং রামভরোখা—তিনজনেই অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল। ব্রিজবিহারীকে দেখিয়া তাহারা যে রূপ চমকিত হইল বোধ

করি ব্রিজবিহারীর প্রেতমূর্তি দেখিলেও ততটা হইত না।

সকৌতূহলে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রিজবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৌন্ চীজকা হল্লা হায় বাবুজি? ময়দান পর গড্ডি খড়ী হুয়ী কেঁও?"

"আর, খড়ী হুয়ী কেঁও!" ক্রুদ্ধ-বিরক্ত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "আরে, আপকা চাকর তো হামকো একবারে মজায়া। আপ বাথরুমমে থা, আর আপকা চাকর হামকো ঘুম ভাঙাকে বোলা আপ স্বপ্ন দেখকে জানালা দে কর বাহারমে গির্ গিয়া। কাজেই হাম চেন টানকে গাড়ি থামায়া। এখন পঞ্চাশ টাকা দণ্ড লাগেগা তো!"

দিবাকরের কথা শুনিয়া বিহ্বলতায় এবং উৎকণ্ঠায় ব্রিজবিহারীর দুই চক্ষু কপালে উঠিল।

রামভরোখা তখন অদূরে মেঝেতে বসিয়া আনন্দে এবং ভয়ে "হায় রে দাদা! হায়রে দাদা!" করিয়া কাতরাইতেছিল। ক্রুদ্ধ ব্রিজবিহারী সবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাহার পৃষ্ঠে একটি পদাঘাত করিলেন। তাহার পর রুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "হারামজাদ্ নিশাখোর! হাম্‌নে তুমকো আফিম খানেকো মানা কিয়া থা ইয়া নহি? অব নিকাল্ পঁচাশ রুপেয়া জরমানা।" তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "স্বপন হামি দেখি নি বাবুজি, ঐ নিশাখোর হারামজাদাই দেখেছিল। নীদ টুটে বিছৌনাতে হামাকে না দেখে মনে করে ছিল, হামি খিড়কি দিয়ে ময়দানে গিরে গেছি।"

ব্যাপারটা হইয়াছিলও অবিকল সেইরূপ। হঠাৎ এক সময়ে নিদ্রা এবং নেশা হইতে জাগ্রত হইয়া রামভরোখা তাহার প্রভুকে শয্যার উপর বসিয়া থাকিতে দেখে। পর-মুহূর্তেই সে কিন্তু ঘুমাইয়া পড়ে, এবং তাহার অব্যবহিত পরে ব্রিজ বিহারীর ল্যাভেটরির দরজা দেওয়ার শব্দে জাগ্রত হইয়া শয্যার উপর ব্রিজ-বিহারীকে না দেখিয়া মনে করে, তিনিই শব্দ করিয়া বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন।

দিবাকরের দুই হস্ত চাপিয়া ধরিয়া ব্রিজবিহারী সাম্বনয়ে বলিলেন যে, পঞ্চাশ টাকা দণ্ড একান্তই যদি দিতে হয় তো তিনিই তাহা বহন করিবেন, কারণ এ ব্যাপারে অপরাধ যদি কাহারও থাকে তো তাহা সম্পূর্ণভাবে রামভরোখার; এবং দিবাকরের যদি কিছু অংশ থাকে তো তাহা ব্রিজবিহারীর নিকট হইতে ধন্যবাদ পাইবার।

দিবাকরের অভিজাত মন কিন্তু এ প্রস্তাব পছন্দ করিল না। মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "কী আশ্চর্য! আমি চেন টানা, আর আপনি জরিমানা দেঙ্গে? না, তা কিছুতেই হয় না। দেনা যদি হয় তো আমিই দেঙ্গে।"

যূথিকা বলিল, "এ কথার বিচার পরে করলে চলবে। গার্ড এলে যা বলতে হবে এখন সেইটে ঠিক করে রাখা দরকার। জরিমানা কিছুতেই দেওয়া হবে না। যে অবস্থায় চেন টানা হয়েছে, লাইনের চোখে তাতে কোনও অপরাধ হয় নি।"

এ কথার সারবত্তা সম্বন্ধে দিবাকর এবং ব্রিজবিহারী সিং একমত হইলেন; কিন্তু কথাটাকে ভালো করিয়া গুছাইয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট সময় পাওয়া গেল না। নিচে লাইনের পাশে গার্ডের গাড়ি হইতে গার্ড এবং এঞ্জিন হইতে দুইজন খালাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের কণ্ঠস্বর এবং গাড়ির ব্রেক ও চাকা ঠিক করিবার জন্য হাতুড়ি পেটার শব্দ শোনা গেল।

পর-মুহূর্তেই দরজার গবাক্ষপথে দেখা দিল ইংরেজ গার্ডের ব্যগ্রোৎসুক মুখ। গম্ভীর ত্বরিতকণ্ঠে সে বলিল, "Hullo, what's up here? Is there any accident?" (কী ব্যাপার এখানে? কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে না-কি?)

নিমেষের জন্য দিবাকর একবার ব্রিজবিহারীর মুখের দিকে চাহিল। সেখান হইতে সাড়া বাহির হইবার কোনও লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গার্ডের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "Not much." (বেশি নয়।)

"What not much?" (কী বেশি নয়?)

"Accident." (দুর্ঘটনা)।

"Who pulled the chain? You?" (কে চেন টেনেছিল? আপনি?)

স্বীকৃতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "I" (আমি।)

অভিজ্ঞ গার্ড বুঝিল, ব্যাপারটা একেবারেই গুরুতর নহে। দিবাকরের ইংরেজী ভাষায় দারিদ্র্য অতিক্রম করিয়া প্রকৃত ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে সে কথা বুঝিতেও তাহার বাকি রহিল না। ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া সকল কথা শেষ করা সম্ভব নহে উপলব্ধি করিয়া সে বলিল, "May I come in?" (ভেতরে আসতে পারি?)

দরজার ছিটকানি খুলিয়া দিয়া কামরায় ভিতর দিকে মুখ নাড়িয়া দিবাকর গম্ভীর মুখে বলিল, "Come." (আসুন।)

নিচে খালাসীদের কাজ শেষ হইয়াছিল। তাহাদিগকে এঞ্জিনে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিয়া গার্ড অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সহসা অতর্কিতভাবে এই ঘটনাচক্রের উদ্ভবে দিবাকরের মেজাজ একেবারে তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার চরম পরিণতি পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডের কথা মনে করিয়া সে একটুও কাতর হয় নাই। সে তো সুটকেস হইতে যে কোনও মুহূর্তে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়। কিন্তু যত বিপদ হইয়াছিল যূথিকার কথা ভাবিয়া। কিছু পূর্বে জরিমানা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে সুদৃঢ় অভিমত সে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বিনা প্রতিবাদে জরিমানা প্রদান করিতে তাহার নিকট বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠাহানির আশঙ্কা আছে। অথচ, প্রতিবাদ করিতে গেলে যে পরিমাণ ইংরেজীতে কথোপকথন চালাইবার শক্তির প্রয়োজন, তাহার তা একান্ত অভাব। সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মুখে একজন গার্ডের সহিত ইংরেজীতে তর্ক-বিতর্ক করিতে না পারিলে, অথবা বাধ্য হইয়া সহসা এক সময়ে স্বল্লায়ত্ত

হিন্দী ভাষার আশ্রয় লইতে হইলে তার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।

. দিবাকর ভাবিল, এ পর্যন্ত সে ইংরেজীতে দুই একটা কথার দ্বারা যেটুকু কথোপকথন চালাইয়াছে, তাহা হইতে তাহার ইংরেজী জ্ঞানের দীনতা হয়তো যূথিকা ধরিতে পারে নাই। কারণ, প্রথমত, সৌভাগ্যক্রমে যূথিকা নিজেই ইংরেজী জানে না; এবং দ্বিতীয়ত, এতাবৎ যে-সকল প্রাথমিক কথাবার্তা হইয়াছে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দুই-এক কথায় দেওয়া চলে। কিন্তু এইবার গাড়ির ভেতর প্রবেশ করিয়া জাঁকাইয়া বসিয়া গার্ড যখন জরিমানার কথা তুলিবে, তখন চেন টানিয়াও জরিমানা হইতে অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সূক্ষ্ম তর্কজালের অবতারণা করা আবশ্যক তাহার ভাষা তো আর দুই একটা ইংরেজী বাক্য হইতে পারে না। সেই নিরতিশয় দুঃসময়ে তাহার শোচনীয় বিমূঢ়তা লক্ষ্য করিয়া যূথিকা নিঃসন্দেহে যে কথা মনে করিবে, তাহা কল্পনা করিয়া দিবাকরের মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

এঞ্জিনে পৌঁছিয়া খালাসীরা আলো দেখাইলে গার্ড সবুজ আলো দেখাইয়া হুইস্‌ল্ দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল, তাহার পর হ্যাণ্ডল্ ঘুরাইয়া দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

নয়

ব্রিজবিহারী সিং যে বেঞ্চে বসিয়াছিল, গার্ড অবিলম্বে সেই বেঞ্চে বসিয়া দিবাকরের বহু আশঙ্কিত অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ করিল।

নোট-বুক খুলিয়া দিবাকরের নাম ধাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া তীক্ষ্ণনেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "When there was no accident, what made you pull the chain ?" (দুর্ঘটনাই যখন ঘটে নি তখন কী জন্যে আপনি চেন টেনেছিলেন ?)

রামভরোখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দিবাকর বলিল, "That servant made." (ঐ চাকরটা করিয়েছিল।) তাহার পর ব্রিজবিহারী সিংকে দেখাইয়া বলিল, "Master of servant" (চাকরের মনিব।)

যতটা শোচনীয় ভাবে দিবাকর ইংরেজী বলিতেছিল, হয়তো তাহার ইংরেজী ভাষার জ্ঞান ঠিক ততটা শোচনীয়ই ছিল না। ইংরেজী ভাষার জ্ঞান এক বস্তু, এবং ইংরেজী বলিবার শক্তি অপর বস্তু। কেবলমাত্র উপদেশগত জ্ঞান লইয়া সন্তরণে অনভ্যস্ত ব্যক্তি অকস্মাৎ জলে পড়িলে যে অবস্থা হয়, দিবাকরেরও কতকটা সেই অবস্থা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, যূথিকার উপস্থিতি তাহার বিমূঢ়তাকে আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াছিল। যূথিকার অসাক্ষাতে ব্যাপারটা

ঘটিলে হয়তো ঐ ইংরেজ গার্ডেরই সহিত সে আর একটু ভালো ইংরেজী বলিতে পারিত। অক্ষমতাপ্রসূত সঙ্কোচ মানুষকে অধিকতর অক্ষম করিয়া তোলে।

গার্ড বলিল, "What did that servant do?" (চাকরটা কী করেছিল?)

দিবাকর বলিল, "That servant told me his master fell" (চাকরটা আমাকে বলেছিল তার মনিব প'ড়ে গেছে।) বলিয়া জানালার দিকে দুই হস্ত ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবার সঙ্কেত করিল।

"Then?" (তারপর।)

"Then I pulled chain" (তারপর আমি চেন টানলাম।)

"But as a matter of fact the gentleman was safe in the compartment" (কিন্তু বস্তুত, ভদ্রলোকটি নিরাপদে কামরার মধ্যে ছিলেন।)

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "Not compartment, bathroom," (কামরায় নয়, বাথরুমে।)

গার্ড বলিল, "And you pulled the chain without looking into the bathroom" (আর আপনি বাথরুম না দেখে চেন টেনেছিলেন!)

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দিবাকর বলিল, "Yes, but where time? Not time." (হ্যাঁ, কিন্তু সময় কোথায়। সময় ছিল না।)

গার্ড বলিল, "I am sorry Babu, you have failed to make out a a case of exemption." (দুঃখের সঙ্গে বলছি বাবু, আপনি অব্যাহতি পাবার উপযুক্ত যুক্তি দেখাতে পারেন নি।)

উগ্রকণ্ঠে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "What exemption?" (কি অব্যাহতি।)

গার্ড বলিল, "Exemption from paying the fine. I am afraid, you shall have to pay the penalty." (জরিমানা দেওয়া থেকে অব্যাহতি। আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে জরিমানা দিতে হবে।)

এতক্ষণ ইংরেজীতে কথা কহিয়া দিবাকরের মেজাজ কিছু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তদ্ভিন্ন যূথিকার সামনে একজন ইংরেজ গার্ডের সহিত সমান ইংরেজীতে উত্তর-প্রত্যুত্তর চালাইয়া যূথিকার মনে একটা শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে মনে করিয়া সে বিশেষভাবে উৎসাহিতও বোধ করিতেছিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "Never pay. No fault, why pay?" (কখনও দেব না। অপরাধ করি নি, কেন দেব?)

ঈষৎ দৃঢ়কণ্ঠে গার্ড বলিল, "If you don't pay I shall be obliged to place the matter in the hands of the Railway Police." (আপনি যদি না দেন, তা হ'লে ব্যাপারটা আমি রেলওয়ে-পুলিসের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হব।)

তাচ্ছিল্যের সহিত এক দিকে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "Place, I don't care." (দেবেন। আমি গ্রাহ্য করি নে।)

নব-পরিণীতা স্ত্রীর কাছে বাহাদুরি দেখাইবার প্রলোভনে দিবাকর এই ভয় প্রদর্শনও উপেক্ষা করিল বটে, কিন্তু গার্ডের কথার মধ্যে পুলিস শব্দের উল্লেখ শুনিয়া ব্রিজবিহারী সিংয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। প্রত্যক্ষভাবে চেন-টানা অপরাধের সহিত জড়িত না হইলেও অন্তত সাক্ষীরূপে গার্ড তাঁহাকে টানিতে পারে, এ আশঙ্কা তাঁহার হইল ; এবং তাহার ফলে যদি তাঁহাকে. পুলিসের হস্তে আটকাইয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে জরুরি কার্য তো পণ্ড হইবেই, অধিকন্তু পরিণামে ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াইলে অব্যাহতি লাভের পূর্বে কতটা কর্মভোগ করিতে হইবে, কে জানে।

প্রধানত নিজের বিপন্ন অবস্থা স্মরণ করিয়া ব্রিজবিহারী সিং দিবাকরের অব্যাহতির জন্য সকাতর অনুরোধের দ্বারা গার্ডকে চাপিয়া ধরিলেন। চোস্ত উর্দুভাষায় দিবাকরের অপরাধ ক্ষালনের সপক্ষে কিছুক্ষণ নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া অবশেষে দিবাকরের হইয়া সনির্বন্ধ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

মাথা নাড়িয়া গার্ড জানাইল, ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে তাহা ক্ষমা লাভের উপযুক্ত নহে, সুতরাং সে নিরুপায়।

গার্ডের কথা শুনিয়া দিবাকর কতকটা নিজের মনে গজ-গজ করিতে লাগিল, "Astonishment ! I thought he fell, so pulled chain, still not pardon ! If this not pardon, then what pardon let me hear ?" (আশ্চর্য ! আমি মনে করেছিলাম উনি প'ড়ে গেছেন, তাই চেন টেনেছিলাম, তবু ক্ষমা নেই। এতে যদি ক্ষমা না থাকে, তা হ'লে কিসে আছে শুনি ?)

কী মনে করিয়া বলা কঠিন, হয়তো বা দিবাকরের অনিপুণ ইংরেজীর জন্যই তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া গার্ড বলিল, "Look here, Babu, you just make a statement of your case in writing and sign it. I shall see if I can do anything for you." (শুনুন, বাবু, আপনি আপনার ঘটনার একটি বিবরণ লিখে সই ক'রে আমাকে দিন। দেখি, আপনার জন্যে যদি কিছু করতে পারি !)

গার্ডের কঠিন মন ঈষৎ দ্রবীভূত হইয়াছে বুঝিয়া দিবাকর প্রথমে আনন্দিত হইল, কিন্তু ঘটনার বিবরণ লিখিয়া দিবার প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়া দুশ্চিন্তায় সেটুকু আনন্দ অপসৃত হইতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না। ভুল ইংরেজী বলার একটা সুবিধা এই যে, শব্দের পক্ষ বিস্তার করিয়া সে ভুল মহাব্যোমের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যায় ; কিন্তু কাগজের উপর লিখিত ভুল মসীর কলঙ্কে পাকা হইয়া লেখকের অক্ষমতার সাক্ষীস্বরূপ সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। তা ছাড়া দুই-চারিটা শব্দ অবৈয়াকরণ-সূত্রে গাঁথিয়া হয়তো বা কোনও প্রকারে সংক্ষেপে কথা কওয়া চলে ; কিন্তু লিখিত বাক্যের ক্রিয়া-কারক-বিভক্তির অপরিহার্য নিয়মানুবর্তিতার

মধ্যে সে সংক্ষিপ্ততার সুযোগ দুর্লভ।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দিবাকর কতকটা অনুনয়ের স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "What necessity of I writing? I don't write. You know all, you write." (আমার লেখবার দরকার কী? আমি লিখব না। আপনি সব জানেন, লিখে নিন।)

মাথা নাড়িয়া গার্ড বলিল, "My writing won't do Sir, you shall have to write." (আমার লিখলে চলবে না মশায়, আপনাকে লিখতে হবে।)

"Please Mr. Guard!" (গার্ড মহাশয়!)

সুমিষ্ট তরল কণ্ঠের সুস্পষ্ট নির্ভুল উচ্চারণে চকিত হইয়া গার্ড, দিবাকর এবং ব্রিজবিহারী সিং তিনজনেই একত্রে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

বিনীত উৎসুক কণ্ঠে গার্ড বলিল, "Yes madam." (বলুন, ম্যাডাম।)

যূথিকা বলিল, "Suppose I write out the statement on behalf of my husband, and he signs it,—won't that do?" (ধরুন, আমি যদি আমার স্বামীর হয়ে বিবরণীটা লিখে দিই, আর তিনি সই করেন—তাহলে হবে না-কি?)

উৎফুল্লমুখে গার্ড বলিল, "Certainly that will do, madam." (নিশ্চয়ই হবে ম্যাডাম।)

যূথিকা বলিল, "Thank you very much. Wait a moment please, I shall do it forthwith." (বহু ধন্যবাদ! অনুগ্রহ করে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন এক্ষুনি করে দিচ্ছি।)

আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যূথিকা বাঙ্কের উপর হইতে একটা অ্যাটাশে কেস পাড়িল। তৎপরে তাহার ভিতর হইতে লিখিবার প্যাড ও কলম বাহির করিয়া পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে এবং তদনুরূপ পরিচ্ছন্ন ভাষায় সমস্ত ঘটনার একটি পরিপূর্ণ বিবৃতি লিখিয়া পরিশেষে বর্তমান ক্ষেত্রে চেন-টানার অপপ্রয়োগের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের সপক্ষে অকাট্য যুক্তি তর্ক স্থাপিত করিল।

উঠিয়া গিয়া দুই পৃষ্ঠা বিবরণী দিবাকরের হস্তে দিয়া যূথিকা বলিল, "হয়েছে কিনা পড়ে দেখ।"

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে যূথিকার লেখার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বঙ্কগভীর স্বরে দিবাকর বলিল, "হয়েছে।" সত্য সত্যই সে কিছু পড়িল কিনা, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন।

কলমটা দিবাকরের হস্তে দিয়া যূথিকা বলিল, "এখানে একটা সই করে দাও।"

সই করিয়া দিয়া দিবাকর কলম এবং কৈফিয়ৎ যূথিকাকে প্রত্যার্পণ করিল।

লিখিত কৈফিয়ৎটা গার্ডের হস্তে প্রদান করিয়া যূথিকা বলিল, "I hope this will be sufficient?" (আশা করি, এই যথেষ্ট হবে?)

মনোযোগসহকারে সমস্তটা পড়িয়া উৎফুল্ল মুখে গার্ড বলিল, "Yes madam, this is quite sufficient. You have put your case very nicely, and your argument seems to be extremely convincing." (হ্যাঁ ম্যাডাম, এ নিশ্চয়ই যথেষ্ট হয়েছে। আপনি ভারি চমৎকার ভাবে আপনার কেসটি বিবৃত করেছেন, আর আপনার যুক্তি বিচার খুব জোরালো হয়েছে।)

তাহার পর কাগজ দুইটি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া বলিল, "I can almost assure you that there won't be any further trouble." (আমি বোধ হয় আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, আর কোনও গোলযোগ হবে না।)

সুমিষ্ট কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "Thank you Mr. Guard," (ধন্যবাদ মিস্টার গার্ড।) তাহার পর কলম ও লিখিবার প্যাড অ্যাটাশে কেসে তুলিয়া রাখিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

যূথিকা যে একটা বিশেষ রকম সুবিধা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইংরেজী না জানিয়াও ব্রিজবিহারী সিং অনুমানে তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় দুই চারিটা সম্ভবত মামুলী কথার প্রয়োগে যূথিকা যে কঠিন প্রস্তর অনায়াসে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে গলাইল—মনে পড়িল, কিছু পূর্বে মার্জিত উর্দু ভাষার সুনির্বাচিত শব্দনিচয়ের প্রভাবে তিনি তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। যথেষ্ট পুলকিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত বাণীর মর্মার্থ সর্বান্তঃকরণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রিজবিহারী মনে মনে বলিলেন, সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

লুধিয়ানায় গাড়ি আসিয়া থামিতেই গার্ড নামিয়া গেল। যাইবার সময়ে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "Good bye madam." (নমস্কার ম্যাডাম।)

যূথিকা বলিল, "Good bye." (নমস্কার।)

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া গাড়ির গাত্র সংলগ্ন রিজার্ভ কার্ড লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া গার্ড যূথিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "Travelling up to Howrah I think" (হাওড়া পর্যন্ত যাচ্ছেন মনে করতে পারি ?)

যূথিকা বলিল, "Yes right up to Howrah," (হ্যাঁ একেবারে হাওড়া পর্যন্ত।)

গার্ড বলিল, 'গুড বাই'।

যূথিকা বলিল, 'গুড বাই'।

কুলির মাথায় সুটকেস ও হোল্ড-অল চাপাইয়া ব্রিজবিহারী সিং দিবাকরের হাতে একটা ছাপা কার্ড দিয়া বলিলেন, "এই কার্ডে হামার লুধিয়ানার 'পতা' আছে বাবুজি, যদি দণ্ড লাগে তো হামাকে জরুর জানাবেন। লেকিন মালুম হচ্ছে, মাঈর হিকমতে হামলোক দণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে গেছি। আপনি আর

হামি কুছু করতে পারলাম না বাবুজি, লেকিন মাঈ বেফিকির করে দিলেন। মাঈর দেহে ভগবতীর অংশ আছে বাবুজি, মাঈ শক্তির ভাণ্ডার আছেন।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। তৎপর পুনরায় বলিলেন, "সিবায় উসকে আওর ভি বাৎ আছে। হামি তো ইংরেজী সমজি না বাবুজি, তবভি মালুম হোয়, আপসে মাঈ ইংরেজীভি জাস্তি বোলে।"

দিবাকর কোনও কথার উত্তর না দিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ব্রিজবিহারী সিং বলিলেন, "আচ্ছা বাবুজি, নমস্কার। নমস্কার মাঈ।"

যুক্তকরে যূথিকা বলিল, "নমস্কার সিংজি।"

দশ

ব্রিজবিহারী সিং নামিয়া গেলে দরজায় চাবি দিয়া একটা এণ্ডির চাদরে আকণ্ঠ আবৃত করিয়া দিবাকর শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ হইতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বায়ু শীতল হইয়াছিল, শুধু সেই জন্যই সে চাদর ঢাকা দিল তাহা মনে করিলে ভুল করা হইবে।

গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত যূথিকা নীরবে বসিয়া ছিল। গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইতেই নিজের বেঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া দিবাকরের পাশে একটু স্থান করিয়া বসিয়া বলিল, "উঃ! বাঁচলাম। মনের ভেতর থেকে একটা ভার বেরিয়ে গেল।" তাহার পর বাম হস্ত দিয়া দিবাকরের দক্ষিণ স্কন্ধ ঈষৎ নাড়িয়া বলিল, "ওঠ।"

কোন কথা না বলিয়া দিবাকর একটু পাশ ফিরিবার উপক্রম করিল।

পুনরায় দিবাকরকে নাড়া দিয়া যূথিকা বলিল, "শুনছ? উঠে ব'স।"

আর একটু পাশ ফিরিয়া গভীর কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এখন আমি ঘুমুব।"

যূথিকা বলিল, "এখন তো সাড়ে দশটাও হয় নি, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে কী হবে? উঠে ব'স, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

দিবাকর কোনও উত্তর দিল না।

"রাগ করেছ?"

উত্তর নাই।

"ক্ষমা করবে না?"

দিবাকর নিরুত্তর।

এক মুহূর্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "শোন। উঠবে তো ওঠ, নইলে আবার তোমাকে চেন টানতে হবে। এবার অবশ্য গার্ডকে জরিমানা দেবার ভয় থাকবে না, কারণ এবার সত্যি-সত্যিই একজন প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে লাফিয়ে পড়বে।"

চাদর সরাইয়া দিবাকর গোঁজ হইয়া উঠিয়া বসিল, তাহার পর ভারি গলায় বলিল, "তোমরা সব করতে পার।"

যূথিকা বলিল, "তোমরা কারা? সব মেয়েরাই? না, যে-সব মেয়ে পাস করেছে, তারা?"

বিরক্ত-বিরস কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "বলতে পারি নে।"

যূথিকা বলিল, "পার। তুমি বলতে চাচ্ছ, যে সব মেয়ে পাস করেছে, তারাই সব করতে পারে। আচ্ছা, তারা যদি সব করতে পারে তা হ'লে তারা ভালোবাসতেও পারে,—স্বামীকেও, স্বামীর বিষয় সম্পত্তিকেও, এমন কি স্বামীর বিষয় সম্পত্তি বাদ দিয়ে শুধু স্বামীকেও।"

দিবাকর বলিল, "কিন্তু মূর্খ স্বামীকে নয়।"

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ" মূর্খ স্বামীকেও। তুমি জানো না, পাস করা মেয়েরা ভারি সাংঘাতিক দল,—তারা সব করতে পারে।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কী পাস তুমি করেছ? ম্যাট্রিকুলেশন করেছ?"

যূথিকা বলিল, "করেছি।"

"আই. এ.?"

"করেছি।"

"বি. এ.?"

"তাও করেছি।"

শুনিয়া দিবাকরের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষণকাল গাড়ির মেঝের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া, তাহার পর যূথিকার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "আর কিছু করেছ? এম. এ.?"

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ," এম. এ. পাসও করেছি।"

চাদরটা একদিকে গুটাইয়া পড়িয়াছিল, দুই হাতে তাহার দুই প্রান্ত টানিয়া লইয়া সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া দিবাকর পুনরায় শুইয়া পড়িল।

ঝুঁকিয়া পড়িয়া দিবাকরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যূথিকা বলিল, এম. এ. পাস করেছি, তাতে এমন কী ব্যাপার হয়েছে? এম. এ. পাস যখন করেছি, তখন তোমার হিসাবে তো আমি বাঘ; তোমার তো বন্দুক আছে, দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে গুলি ক'রে মেরো। তারপর কোনও পাঠশালা থেকে একটা দ্বিতীয় ভাগ-পড়া মেয়ে ধ'রে এনে বিয়ে ক'রো। সে শুধু তোমাকেই ভালোবাসবে, তোমার ধন-সম্পত্তিকে একটুও বাসবে না।"

দিবাকর কোনও উত্তর দিল না, নিঃশব্দে শুইয়া রহিল।

ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া যূথিকা উঠিয়া গিয়া একটা দরজার খড়খড়ি তুলিয়া দিল, তাহার পর জানালার উপর দুই বাহু স্থাপন করিয়া বাহিরে অল্প মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইল।

সহসা একটা নূতন পথ পাইয়া সুতীব্র বর্ষার কন্‌কনে জ'লো হাওয়া সবেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কক্ষের বায়ুমণ্ডলকে চকিত করিয়া দিল।

চাঁদরের ফাঁক দিয়ে সেই নবাগত কন্‌কনানির অল্প একটু স্পর্শ পাইয়া দিবাকর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, তাহার পর দ্বারের নিকটে যূথিকাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "ওখানে কী করছ?"

যূথিকার নিকট হইতে কোনও সাড়া আসিল না।

শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যূথিকার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দিবাকর পুনরায় সেই প্রশ্ন করিল, "এখানে কী করছ?"

মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কিছু করছি নে।"

"তবে জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

"মাথাটা দপদপ করছিল, তাই একটু হাওয়া লাগাচ্ছি।'

দিবাকর বলিল, "সে তো বেঞ্চে ব'সেও লাগাতে পারতে!"—বলিয়া দরজার ছিটকানিটা লাগানো আছে কি না একটু নত হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

যূথিকা বলিল, "অত ভয় পেয়ো না, দরজা খুলে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করব না। তোমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর আমার যথেষ্ট লোভ আছে—কিছুকাল তো ভোগ করতে হবে।" তারপর বেঞ্চে গিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "শোন! তোমার যদি মনে হয় যে, পাস-করা মেয়েকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে জেনেও আমার পাস করার কথা তোমাকে না জানিয়ে বিয়ে ক'রে আমি অপরাধ করেছি, তা হ'লে আমার বিচার ক'রে আমাকে দণ্ড দাও।"

এ বিষয়ে তাহার অভিভাবকগণেরও যে তাহার প্রতি প্রবল নিষেধ ছিল, আত্মদোষলঘুকরণার্থে তাহা প্রকাশ না করিয়া যূথিকা সমস্ত দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিল।

যূথিকার সম্মুখে অপর বেঞ্চে উপবেশন করিয়া দিবাকর বলিল, "কী দণ্ড দোব বল।"

"যা তোমার উচিত মনে হয়—তা সে যত কঠোরই হোক।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে নিঃশব্দ বেদনাময় হাস্য ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "এখন তাতে কী লাভ হবে বলতে পার?"

যূথিকা বলিল, অপরাধীকে দণ্ড দিলে অপরাধের প্রতিবাদ করা হবে।"

"কিন্তু এ অপরাধ কেন তুমি করলে যূথিকা? এ কথা কেন তুমি আমাকে বিয়ের আগে জানিয়ে দিলে না? তারপর যা হবার তা হ'ত।"

দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "বিশ্বাস করবে, কেন জানাইনি?"

দিবাকরের মুখে পুনরায় পূর্বের মতো বেদনার্ত হাসি দেখা দিল; বলিল, "বিশ্বাস? বিশ্বাস করতে তো আর সাহস হয় না। বিশ্বাস তো দিদিকেও করেছিলাম। তবু বল,—বিশ্বাসই না হয় করব।"

যূথিকা বলিল, "জানালে পাছে তোমাকে না-পাই সেই ভয়ে জানাই নি।"

দিবাকর বলিল, "না-হয় না-ই পেতে। কী এমন লোভের জিনিস আমার মধ্যে পেয়েছিলে তুমি, যার জন্যে সহজ পথে চলতে ভয় পেলে?"

যূথিকা বলিল, "তুমি আমার মধ্যে যা পেয়েছিলে, আমিও ঠিক তাই পেয়েছিলাম। বিশ্বাস কর আমাকে, তোমার মধ্যে শুধু তোমাকেই পেয়েছিলাম।"

আর কিছু না বলিয়া দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

যূথিকা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল বিয়ের আগে এ কথা তোমাকে জানাই; কিন্তু কেন জানাই নি, এখন সে কথা শুনলে। গাড়িতে তোমার সঙ্গে একা হ'য়ে পর্যন্ত এ কথা তোমাকে না জানিয়ে মুহূর্তের জন্যও স্থির হতে পারছিলাম না! অমৃতসর পৌঁছবার আগেই সমস্ত কথা জানাব ভেবেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ স্টেশন এসে পড়ল, আর আমাদের কামরায় বৃদ্ধ ভদ্রলোককে স্থান দিতে হলো, তাই জানাতে পারলাম না। তারপর যে অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হলো হয়তো তা ভগবানেরই ব্যবস্থা ব'লে আমার মনে হয়েছিল। মনে ক'রো না নিজের ইংরিজী বিদ্যে জাহির করবার জন্যে অথবা জরিমানা বাঁচাবার জন্যে আমি গার্ডের সঙ্গে কথা কয়েছিলাম। যে কথাটা তোমাকে কী ভাবে জানাব ব'লে মনে মনে অনেকক্ষণ ধ'রে চিন্তা করছিলাম, গার্ডকে উপলক্ষ্য ক'রে সেই কথাটাই মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল! গার্ডের সঙ্গে কথা কইবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি নি যে, আমি কথা কইব। নিজের গলার শব্দে নিজেই চমকে উঠেছিলাম।"

এবারও দিবাকর কিছুই বলিল না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "সব কথা তুমি জানার পর আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, এখন তুমি যা করতে হয় কর।" তাহার পর সহসা সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া দুই হস্ত দিয়া দিবাকরের দুই হস্ত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার কথা শোন। এম. এ. পাস ক'রে সামান্য যা শিখেছি, তা যদি ভোলবার হ'তো, তা হ'লে এই মুহূর্তেই সমস্ত ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু বিশ্বাস কর আমাকে, এ জিনিস তোমার কাছে এত তুচ্ছ যে, এ না ভুললেও চলে।"

ক্ষণকাল মনে মনে কী চিন্তা করিয়া যূথিকার হাত ছাড়াইয়া দিবাকর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর কেস হইতে সেতার ও এসরাজ বাহির করিয়া নিজে এসরাজ রাখিয়া যূথিকার হস্তে সেতারটা দিয়া বলিল, "নাও, খানিকক্ষণ বাজাও। কথা পরে হবে।',

সেতারে একটা মৃদু ঝঙ্কার দিয়া যূথিকা বলিল, "কী বাজাব?"

"সেদিনকার সেই জয়জয়ন্তী।"

সহসা একটা প্রবল ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া সেতার ও এসরাজে জয়-জয়ন্তী রাগিণীর আলাপ আরম্ভ হইল।

স্তব্ধ অন্ধকারময়ী ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পাঞ্জাব মেল উন্মত্ত বেগে

চলিয়াছে, স্টেশনের পর স্টেশন হু-হু করিয়া পিছাইয়া যাইতেছে, ক্রমশ রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, কিন্তু তখনও সেই করুণ মধুর জয়জয়ন্তী রাগিণীর আলাপে বিরতি মানিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না।

* * * *

তৃতীয় দিবসের প্রাতে পাঞ্জাব মেল ধীরে ধীরে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিতেছিল। দিবাকর মুখ বাড়াইয়া দেখিল, প্ল্যাটফর্মের উপর নিশাকর দাঁড়াইয়া আছে।

গাড়ি নিকটে আসিতেই ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এত শিগগির ফিরে এলে যে?"

কামরার ভিতর দিকে মুখ নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া দিবাকর বলিল, "এঁর জন্যে।"

সবিস্ময়ে নিশাকর বলিল, "কার জন্য?" পর-মুহূর্তে গাড়ি থামিতেই দরজা খুলিয়া কামরায় প্রবেশ করিল এবং সম্মুখে যূথিকাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকরের দিকে ফিরিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করিল।

দিবাকর বলিল, "বউদিদি। প্রণাম কর্।"

আশ্চর্যান্বিত হইয়া নিশাকর বলিল, "বউদিদি?"

দিবাকর বলিল, "বউদিদির মানে দাদার বউ।"

নিশাকর বলিল, "তা তো জানি, কিন্তু—"

সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নেই ঠাকুরপো, সত্যি আমি তোমার বউদিদি। তোমার দাদা লাহোরে গিয়ে হঠাৎ আমাকে বিয়ে করেছেন।"

বিস্ময় যতখানিই উগ্র হউক না কেন, এ কথার পর নিশাকরকে তাড়াতাড়ি নত হইয়া যূথিকার পদধূলি গ্রহণ করিতে হইল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকরের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ব্যাপার বল তো?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কেন, দুঃখিত হচ্ছিস্ নাকি?"

নিশাকর বলিল, "না, না, দুঃখিত হব কেন? খুশিই হচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ লাহোর পৌঁছেই—আমাদের না জানিয়ে শুনিয়ে—"

দিবাকর বলিল, "কী করি বল্! তুই ম্যাট্রিকুলেশন-পাস-করা মেয়ে নিয়ে এমন ভয় দেখালি যে, লাহোরে গিয়ে হঠাৎ আমার মনের মতো একটি মেয়ে পেয়ে টপ্ ক'রে বিয়ে ক'রে ফেললাম। মোটে দুদিন সময়, শেষ তারিখে বিয়ে, টেলিগ্রামে খবর দেবার সময়ও ছিল না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া নিশাকর মনে করিল, সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া দিবাকর একটি অশিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। নিজেও সে যূথিকাকে দেখিয়া খুশি হইয়াছিল; বলিল, "তা বেশ করেছ। কবে বিয়ে হলো?"

কুলিরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিনিসপত্র তুলিতেছিল, দিবাকর বলিল, "গত বুধবারে। বাড়ি চল্, ধীরে সুস্থে সব শুনবি।"

ট্যাক্সি করিয়া যাইতে যাইতে নিশাকর বলিল, "আমাদের বাসায় না গিয়ে চল দাদা, প্রথমে একবার বিজয়দাদের বাড়ি যাওয়া যাক।"

বিজয় পূর্বোক্ত মাধুরী বউদিদির স্বামী।

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কেন; এখন সেখানে গিয়ে কী হবে?"

সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল; "বউদিদি প্রথম আসছেন, বরণ-টরণ মাঙ্গলিক কাজ কিছু হবে না?"

দিবাকর বলিল, "ক্ষেপেছিস তুই? তার জন্যে বিজয়দাদের বাড়ি যাবার কোনও দরকার নেই। মাঙ্গলিক যা কিছু তা মনসাগাছায় গিয়ে হবে।"

যূথিকা বলিল, "তোমার বাড়িতে প্রবেশ করাই আমার প্রথম আর সবচেয়ে বড় মাঙ্গলিক হবে, ঠাকুরপো, মনসাগাছায় যা হবে তা দ্বিতীয়।"

যূথিকার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "ধন্যবাদ, বউদিদি, এত বড় সৌভাগ্য থেকে আমার বাড়িকে বঞ্চিত করতে গিয়ে ভারি ভুল করছিলাম। আপনি মনে করিয়ে দিলেন, সে জন্যে ধন্যবাদ।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া দিবাকর বলিল, "আপনি কী রকম?"

নিশাকর বলিল, "তবে?"

"'তুমি'। এ কি মাধুরী বউদিদি যে 'আপনি'?"

সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, "তা বটে।"

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পাশ দিয়া যাইবার সময়ে ট্যাক্সি থামাইয়া নিশাকর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল।

বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "এখানে নামলি যে?"

প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া নিশাকর বলিল, "একটু ব'স তোমরা, মিনিট দশেকের মধ্যে আসছি।" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে কুলির মাথায় একটা ডালা করিয়া এক রাশ ফুল, দুই ছড়া মালা এবং একটা আম্রশাখা লইয়া নিশাকর দেখা দিল। তাহার পর কুলিকে পয়সা দিয়া গাড়িতে বসিয়া বলিল, "চলো।"

দিবাকর বলিল, "এ সব কি হবে রে নিশা?"

নিশাকর হাসিমুখে বলিল, "সেটা যথাকালে প্রকাশ পাবে।"

দিবাকর বলিল, "ফুল ভালো জিনিসই, মালাও মন্দ নয়, আম্র শাখার কোনও অর্থ বোঝা যাচ্ছে না।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া নিশাকর নীরবে বসিয়া রহিল।

মিনিটখানেকের মধ্যে ট্যাক্সি নিশাকরের গলির ভিতরে প্রবেশ করিল।

অল্প দূর অগ্রসর হইয়া নিশাকর বলিল, "বাঁ হাতে ঐ সাদা বাড়ি।"

ধীরে ধীরে গাড়ি নিশাকরদের বাড়ির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াইল।

নিশাকর ড্রাইভারকে বলিল, "খুব জোরে জোরে আট দশবার হর্ন দাও—চাকররা যাঁতে শুনতে পায়।"

ভোঁ-ভোঁ করিয়া হর্ন বাজিতে লাগিল।

যূথিকার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে নিশাকর বলিল, "আপাতত এইটেই শঙ্খধ্বনি বলে মেনে নাও বউদিদি।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মুখে নিঃশব্দ মিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

হর্নের শব্দ শুনিয়া ভৃত্য বসন্ত এবং পাচক চণ্ডী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়াছিল। জিনিসপত্র নামাইবার জন্য উভয়কে আদেশ দিয়া যূথিকা এবং দিবাকরকে একতলায় বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া নিশাকর বলিল, "মিনিট দশেক তোমাদের একটু কষ্ট করে এখানে বসতে হবে দাদা। এখনই আমি আসছি।"

কপট বিরক্তির সুরে দিবাকর বলিল, "কী ছেলেমানুষি আরম্ভ করলি নিশা? কী মতলব তোর বল্ দেখি?"

যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর বলিল, "বিয়েতে তো ফাঁকি দিয়েছ। এখন থেকে কিন্তু কিছুদিন তোমাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে আমাদের হাতে। একটি কথা বললে চলবে না। তাহার পর যূথিকার দিকে চাহিয়া বলিল, এটা কি আমার অন্যায় আবদার হচ্ছে বউদিদি?"

হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না, না, একটুও অন্যায় নয়। এ তোমার সম্পূর্ণ Legitimate claim" (ন্যায়সঙ্গত দাবি।)

"শুনলে তো? আর একটি কথা বলো না।" বলিয়া সহাস্যমুখে ঈষৎ দৃপ্তনেত্রে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর প্রস্থান করিল। কিন্তু যাইবার সময় যূথিকার কথার মধ্যে ইংরেজী শব্দ দুইটির ব্যবহার এবং প্রয়োগ-সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিয়া বেশ একটু বিস্মিত এবং চিন্তিত হইয়া গেল। ইংরেজী লেখা পড়া বিশেষ কিছু না জানিয়া যাহারা শুধু শুনিয়া শুনিয়া দুই চারিটি ইংরেজী শব্দ সঞ্চয় করিয়া নিজেদের কথার মধ্যে ব্যবহার করে, Legitimate claim' তাহাদের শব্দ ভাণ্ডারের মধ্যে স্থান পাইবার মতো সামান্য নহে। অথচ দিবাকর যাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে তাহার সম্বন্ধে হিসাবমতো ধারণা করিতে হইলে Legitimate claim'কে সহজে সে ধারণার সহিত খাপ খাওয়ানো কঠিন। কিন্তু আপাতত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি কাজ করিবার আছে যে, সমস্যা সমাধানের কোনও চেষ্টা না করিয়াই নিশাকর প্রস্থান করিল।

দিবাকরের অভিসন্ধি এবং উপদেশ অনুযায়ী যূথিকা তাহার কথার মধ্যে ইংরেজী ভাষায় বুকনি প্রয়োগ করিয়াছিল। নিশাকর প্রস্থান করিলে দিবাকর

হাসিয়া বলিল, "চমৎকার হয়েছে ; এবার কিন্তু আর একটু বেশি পরিমাণে চালিয়ো।"

যূথিকা বলিল, "আচ্ছা, ঠাকুরপোকে তুমি ছেলেমানুষির কথা বলছিলে, কিন্তু আমাদেরও এটা ছেলেমানুষিই হচ্ছে না ?"

দিবাকর বলিল, "না না যূথিকা, তোমার কথা হয়তো স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার পক্ষে এ ঠিক ছেলেমানুষি নয়। তোমার লেখাপড়ার খবর পেতে পেতে সেদিন গাড়িতে আমার যে রকম খুশি হয়ে ওঠা উচিত ছিল, নিশাকে দিয়ে সেইটে দেখে আমি খুশি হতে চাই।"

স্বামীর পক্ষে এ ব্যাপারটা নিতান্তই বাহিরের স্থূল জিনিস নহে, পরন্তু অন্তরের কোনও এক গভীর অনুবেদনার সহিত ইহার যোগ আছে মনে করিয়া কিছু বলিল না।

বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বসন্তকে এবং চণ্ডীকে ডাকিয়া নিশাকর বলিল, "বুঝতে পারছ, চণ্ডী ?—লাহোর থেকে বড়বাবু বিয়ে করে এসেছেন। এখন চট করে যা হয় একটু বরণ-টরণের ব্যবস্থা করতে হবে তো ?"

দিবাকরের সহিত যূথিকাকে দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া চণ্ডী এবং বসন্ত নানা কল্পনা-জল্পনায় নিযুক্ত ছিল, এমন সময়ে নিশাকরের কথা শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চণ্ডী বলিল, "বিয়ে করে এসেছেন। কই আগে তো কিছু জানা যায় নি ছোটবাবু ?"

নিশাকর বলিল, "সে সব পরের কথা পরে হবে, এখন তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব বরণের ব্যবস্থা কর। তোমার পূজো হয়েছে ?"

চণ্ডী বলিল, "আজ্ঞে না, এখনও হয় নি।"

"তা হ'লে তো চন্দন বাটা আছে ?"

"আজ্ঞে, আছে।"

"ধূপ দীপ তো আছেই ?"

ঘাড় নাড়িয়া চণ্ডী বলিল, "আছে।"

খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "বেশ কথা। ওপর থেকে বসন্তকে দিয়ে ছোট গালচেখানা আনিয়ে উঠোনের মধ্যিখানে এমন ক'রে পাতাও যাতে বর-কনে পূর্বমুখ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। আমের শাখা এনেছি, তা দিয়ে একটা জলপূর্ণ ঘট তার সামনে স্থাপন কর। আর, বরণের জন্যে এনে রাখ এক পাত্র ফুল, এক ঘটি জল, ধূপ, দীপ, মালা আর চন্দন।"

তৎপর হইয়া চণ্ডী বলিল, "এ আমি এখনই ক'রে ফেলছি।"

বসন্ত তাড়াতাড়ি উপর হইতে গালিচা লইয়া আসিয়া পাতিয়া দিল।

নিশাকর বলিল, "এবার ওপর থেকে গ্রামোফোনটা এনে ডান দিকে টুলের ওপর রাখ বসন্ত।"

গ্রামোফোন আসিলে নিশাকর তাহাতে দম দিয়া পিন পরাইয়া রাখিল।

তাহার পর উপর হইতে আলিম হোসেনের আশাবরী রাগিণীর বিখ্যাত সানাইয়ের রেকর্ডটা আনিয়া লাগাইয়া দিল। ইত্যবসরে চণ্ডীঠাকুর বরণের ব্যবস্থা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল।

আয়োজনাদির দিকে প্রসন্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর বলিল, "সব তো এক রকম হলো, শুধু একটা শাঁখ হ'লেই চমৎকার হতো।"

বসন্ত বলিল, "তার জন্যে ভাবনা কী ছোটবাবু, এক্ষুণি আমি পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি।" বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দুই-তিনের মধ্যে শাঁখ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

নিশাকর বলিল, "শাঁখ তো এল, কিন্তু বাজায় কে?"

বসন্তর হাত হইতে শাঁখটা লইয়া চণ্ডী বলিল, "আমি বাজাতে জানি, আমি বাজাব।"

খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "বেশ তুমিই বাজিয়ো। আর দেখ্, বসন্ত, আমি ইশারা করলেই তুই গ্রামোফোনটা খুলে দিবি! আগে থাকতে খুলিস নে, তিন মিনিটের মধ্যে আমাকে বরণ শেষ করতে হবে।"

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে নিশাকর বৈঠকখানা হইতে দিবাকর এবং যূথিকাকে লইয়া আসিয়া গালিচার উপর পাশাপাশি দাঁড় করাইল, এবং পরক্ষণেই তাহার নিকট হইতে ইঙ্গিত লাভ করিয়া সানাই এবং শঙ্খ একযোগে বাজিয়া উঠিল। মূল্যবান শক্তিশালী গ্রামোফোন-যন্ত্রের কল্যাণে স্বপ্নময়ী আশাবরী রাগিণী সুর এবং তালের বিচিত্র জাল রচনা করিয়া বর্ষাদিনের সেই স্তিমিত প্রভাতকে উৎসবময় করিয়া তুলিল।

শ্বেতচন্দনের পাত্র হইতে চন্দন লইয়া নিশাকর প্রথমে বরবধূর ললাট চর্চিত করিল; তাহার পর উভয়ের কণ্ঠে মালা দুইটি পরাইয়া দিয়া যথাক্রমে দীপ, জলপাত্র এবং পুষ্প দিয়া উভয়কে অভিনন্দিত করিল, তৎপরে নত হইয়া উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া যূথিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে লক্ষ্মীহীন ঘরে লক্ষ্মীর আসনে অধিষ্ঠিত হবার জন্যে সাদরে এবং সসম্মানে আবাহন করছি বউদিদি। তোমার পুণ্যে আমাদের গৃহ পবিত্র হোক। তুমি আমাদের দুই ভাইকে চিরদিনের জন্যে সংযুক্ত কর, সুখী কর। এই আবাহনের আয়োজন অতি সামান্য; কিন্তু তাই ব'লে তুমি যেন মনে ক'রো না যে, এর আন্তরিকতা অসামান্য নয়।"

নিশাকরের এই স্বকল্পনাপ্রসূত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান এবং আবাহন-বাণী যেন কোনও মন্ত্রবলে অকস্মাৎ একটি পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ক্ষণকালের জন্য সকলকে আবিষ্ট করিয়া রাখিল।

"ঠাকুরপো!"

নিশাকর চাহিয়া দেখিল, যূথিকার মুখে হাস্য, কিন্তু চক্ষু দুইটি অশ্রুতে চকচক করিতেছে।

যূথিকা বলিতে লাগিল, "এর আন্তরিকতা যে অসামান্য, সে কথা কি ভুল করবার উপায় আছে ঠাকুরপো? এর পর হয়তো মনসাগাছায় অনেক-কিছু ব্যাপার অনেক সমারোহের সঙ্গে ঘটবে। কিন্তু এ তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সে সব কথা যদিও বা কোনদিন ভুলে যাই, তোমার আজকের এই অভ্যর্থনার স্মৃতি চিরদিন মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তোমাকে আজ আমি একান্ত মনে এই আশীর্বাদ করি ঠাকুরপো, তুমি আজ আমাকে যে গৌরব দান করলে, অপাত্রে তা দিয়েছিলে বলে কোনও দিন যেন তোমাকে পরিতাপ করতে না হয়।"

হাসিমুখে দিবাকর বলিল, "আর আজকের এই চমৎকার অনুষ্ঠানে আমি তখন বাধা দিতে যাচ্ছিলাম বলে আমি তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি নিশা।"

উৎফুল্ল স্বরে নিশাকর বলিল, "সাধু!"

গ্রামোফোন থামিয়া গিয়াছিল। রেকর্ডের অপর দিকটা চালাইয়া দিবার জন্য বসন্তকে আদেশ দিয়া যূথিকা ও দিবাকরকে লইয়া নিশাকর দ্বিতলে উপস্থিত হইল।

ঘণ্টাখানেক পরে চা-পানের পর পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া তিন জনে কথোপকথন হইতেছিল।

দিবাকর বলিল, "দিন তিনেকের মধ্যে দিদিরা এখানে এসে পৌঁছবেন। সেই আন্দাজে আমাদের মনসাগাছা যাবার দিন স্থির ক'রে ফেলা দরকার।"

নিশাকর বলিল, "আজই সেটা ঠিক করে ফেলে চিঠিপত্র দিয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে বসন্তকে মনসাগাছায় পাঠিয়ে দিতে হবে।"

যূথিকা বলিল, "আগে থেকে কিছু না জানিয়ে তোমাকে আজ যেমন একটা pleasant surprise (সানন্দ বিস্ময়) দেওয়া গেল, মনসাগাছাতেও তেমনি দিলে কেমন হয় ঠাকুরপো?"

চমকিত হইয়া নিশাকর বলিল, "মনসাগাছায় surprise দেবার কথা না হয় পরে ভাবা যাবে, কিন্তু আমাকে surprise দেওয়ার তো এখনও শেষ হয় নি দেখছি। তুমি ইংরেজী জান না-কি বউদিদি?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল. "কেন বল দেখি?"

নিশাকর বলিল, "তখন legitimate claim বললে, এখন pleasant surprise বলছ!"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "ও" সেই কথা বলছ? কিন্তু তার দ্বারাই তো সে কথা conclusively proved (নিঃসংশয়ে প্রমাণ) হয় না ঠাকুরপো।"

অপলক নেত্রে এক মুহূর্ত যূথিকার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অল্প অল্প ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে নিশাকর বলিল, "না না, নিশ্চয় হয়। তার দ্বারা না হলেও, এই conclusively proved-এর দ্বারাই conclusively proved হয়।"

তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কী ব্যাপার বল তো দাদা।"

দিবাকর প্রস্তুত হইয়া ছিল, কোনও কথা না বলিয়া পকেট হইতে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বাহির করিয়া নিশাকরের হাতে দিল।

তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলিয়া নিশাকর দেখিল, যূথিকা মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি প্রথম শ্রেণীর ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট।

দিবাকরের পক্ষে একজন ম্যাট্রিক পাস মেয়েকে বিবাহ করা এমনই অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, চোখের উপর অমন একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ থাকিতেও গভীর বিস্ময়ে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এ যূথিকা মুখোপাধ্যায় তুমিই না-কি বউদিদি?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "তা কী করে বলব ভাই, আমি তো যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কতকটা নিজের মনে নিশাকর বলিল, "সে তো মাত্র দিন চারেকের কথা।"

বিস্ময়ের প্রথম অভিভূতি হইতে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বেই চকিত স্বরে নিশাকর বলিয়া উঠিল, "এ আবার কী?"

নিঃশব্দে দিবাকর আর একটা ভাঁজ করা কাগজ নিশাকরের দিকে আগাইয়া ধরিয়াছে।

ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটখানা টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া দিবাকরের নিকট হইতে ভাঁজ করা কাগজখানা লইয়া নিশাকর তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিল, যূথিকা মুখোপাধ্যায়ের নামেই প্রথম শ্রেণীর আই. এ. সার্টিফিকেট।

টেবিলের একটা দেরাজ, তাহার ভিতর হাত ঢুকাইবার চেষ্টায় আছে লক্ষ্য করিয়া নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "ওর মধ্যেও কিছু আছে না-কি?"

"এর মধ্যে যা আছে পকেটে ঠিক তা ধরে না।" বলিয়া দিবাকর দেরাজের ভিতর হইতে একটা গোল করিয়া পাকানো বাণ্ডিল বাহির করিয়া নিশাকরের হাতে দিল।

তাড়াতাড়ি পাক খুলিয়া নিশাকর দেখিল, যূথিকা মুখোপাধ্যায়ের নামে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া বি. এ. পাস করিবার ডিপ্লোমা।

এবার আর কোনও কথা না বলিয়া সে নিঃশব্দে দিবাকরের দিকে দক্ষিণ হস্ত আগাইয়া দিল।

দেরাজের মধ্যে উঁকি মারিয়া আর একটা পাকানো কাগজ বাহির করিয়া দিবাকর নিশাকরের হস্তে প্রদান করিল।

বলা বাহুল্য, ইহা যূথিকার ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করিবার ডিপ্লোমা।

এম. এ. ডিপ্লোমাখানা পড়িতে পড়িতে তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই নিশাকর ধীরে ধীরে দিবাকরের দিকে পুনরায় হাত বাড়াইয়া ধরিল।

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "তোর লালসা তো বড় কম নয় নিশা। এর পর আবার কী চাস। বি. এল. এ-র ডিপ্লোমা? না, বি. ই.-র?"

গম্ভীর মুখে নিশাকর বলিল, "স্বপ্নজগতে সব কিছুই সম্ভব। আমার বিশ্বাস, আমি এখন স্বপ্নজগতে অবস্থান করছি। জামাইবাবুর টেলিগ্রাম থেকে আরম্ভ করে এই এম. এ. ডিপ্লোমাখানা পর্যন্ত সবটাই হয়তো একটা একটানা স্বপ্ন।"

দিবাকর বলিল, "স্বপ্ন নয়, কিন্তু স্বপ্নের মতোই আশ্চর্য।"

নিশাকর বলিল, "আর সুস্বপ্নের মতো মনোহর।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকর বলিল, "সে কথা ঠিক বলেছিস। আমারও এক এক সময়ে সেই রকমই মনে হয়। ওরে নিশা, আমার কপালে এম. এ. পাস-করা বউ রয়েছে আর তুই একটা ম্যাট্রিক পাস করা মেয়ে আমাকে গছিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলি। ম্যাট্রিক পাস-করা মেয়ের সাধ্য কী যে আমার মতো তিনবার ফেল-করা মানুষকে সহ্য করে। তার জন্যে দরকার তোর বউদিদির মতো এম. এ. পাস করা মেয়ে।"

এই নির্বিকল্প ক্ষমাশীলতার সাদর বাক্য শুনিয়া পুনরায় যূথিকার দুই চক্ষু সজল হইয়া আসিল। অবাধ্য চক্ষুকে দিবাকর এবং নিশাকরের দৃষ্টিপথের অন্তরাল করিবার জন্য সে নতমস্তকে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমাগুলা গুছাইতে আরম্ভ করিল।

'বউদিদি!'

মুখ না তুলিয়াই মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "কী ঠাকুরপো?"

"আজ আর একবার আমি তোমাকে আহ্বান করব। এবার কিন্তু লক্ষ্মীরূপে নয়, এবার সরস্বতীরূপে আমার পড়বার ঘরে।"

অবাধ্য অশ্রু যূথিকার নেত্রে অবাধ্য হইয়া উঠিল।

"কিন্তু তার আগে চট্ করে একবার আমি ঘুরে আসতে চাই।"

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এখন আবার কোথায় যাবি নিশা?"

নিশাকর বলিল, "বউ দেখবার জন্যে বিজয়দাদের নিমন্ত্রণ করে আসি, আর মাধুরী বউদিদিকে বলে আসি, আমার কপালে এম. এ. পাস করা বউদিদি রয়েছে মাধুরী-বউদিদি, আর আপনি একটা ম্যাট্রিক পাস করা বউদিদি গছিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন!"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, এবং সেই অবসরে যূথিকার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বৃহত্তর হইয়া ভূমির উপর ঝরিয়া পড়িল।

বার

নিশাকরের নিকট হইতে দুইখানি পত্র লইয়া সেই দিনই সন্ধ্যাকালে বসন্ত মনসাগাছা রওনা হইল, এবং পর দিন প্রাতে তথায় পৌঁছিয়া সমস্ত গ্রামবাসীকে একেবারে চকিত করিয়া দিল। পত্র দুইটি ম্যানেজার রাসবিহারী দত্ত এবং প্রসন্নময়ীর নামে। উভয় পত্রের বক্তব্য প্রায় একই,—বরবধূর অভ্যর্থনার জন্য যেন বিশেষরূপ সমারোহের ব্যবস্থা করা হয়।

সে সময়ে ম্যানেজার মনসাগাছায় ছিল না। একটা বিস্তৃত জমির নূতন বন্দোবস্তের জন্য ক্রোশ দেড়েক দূরবর্তী নন্দীপুর কাছারিতে অবস্থান করিতেছিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাড়াতাড়ি স্নান এবং জলযোগ সারিয়া নিশাকরের চিঠিসহ বসন্ত দ্রুতগতিতে নন্দীপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। যাইবার সময়ে একটা চরকি বাজির মতো সমস্ত গ্রামের ভিতর দিয়া আঁকা-বাঁকা পথে চক্র দিতে দিতে এবং বাক্যের ধূমোদ্গার ছাড়িতে ছাড়িতে দেখিতে দেখিতে সে গ্রামের সীমান্তদেশ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। সদর নায়েব মধুসূদন ঘোষাল পথশ্রমক্লান্ত বসন্তর পরিবর্তে একজন পাইক দ্বারা ম্যানেজারের নিকট চিঠি পাঠাইবার সংকল্প করিতেছিল। কিন্তু ম্যানেজারকে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত করিয়া দিবার বাহাদুরি হইতে বসন্ত নিজেকে কিছুতেই বঞ্চিত করিল না। নন্দীপুরে ম্যানেজারকে চিঠি দিয়া অদূরবর্তী বালিচক গ্রামে ভগ্নিপতির গৃহে উপস্থিত হইবে এবং তথায় সমস্ত দিনমান অতিবাহিত করিয়া রাত্রের গাড়িতে ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তাহার কার্যকল্পনা। দুইজন চাকর এবং যূথিকার জন্য একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করাইয়া সে আসিয়াছে। গৌরীদের কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্বেই তাহাকে তথায় পৌঁছিতে হইবে। এস্টেটের বহুদিনের সে বিশ্বস্ত ভৃত্য; নিশাকর বিদেশে একা থাকে বলিয়া সে কলিকাতায় তাহার কাছে থাকে।

দিবাকরের আকস্মিক বিবাহের সংবাদের সহিত গ্রামে এ কথাও রটিয়া গেল যে যে-কন্যা প্রায় বিনা নোটিশে মনসাগাছার জমিদার গৃহে জ্যেষ্ঠা পুরলক্ষ্মী হইয়া আসিতেছেন, তিনি বঙ্গদেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসিনী এবং ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণা।

মনসাগাছার ইতিবৃত্তে এ পর্যন্ত গৃহস্থকন্যা অথবা গৃহস্থবধূ ম্যাট্রিকুলেশনও পাস করে নাই। পাস করিতে পারিলে পুরুষদেরও মধ্যে নিশাকরই এবার সর্বপ্রথম বি. এ. পাস করিবে। সুতরাং এরূপ অনমুকূল পরিসরের মধ্যে সহসা একজন এম. এ. পাস করা মেয়ের জমিদারবধূ হইয়া আসা সমস্ত গ্রামবাসীর নিকট এমন বে-আন্দাজভাবে খাপছাড়া ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল যে, তাঁহারা যে বেশ একটু জুৎ করিয়া বিস্মিত হইবে তাহারও ঠিক বাগ

পাইতেছিল না। তথাপি ম্যানেজারের আপিস হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতিরত্নদের খিড়কির পুকুর পর্যন্ত সর্বত্র কথাটা আন্দোলিত হইতে লাগিল; এবং সেই সকল আন্দোলনের মধ্যে কোন এক সময়ে এমন কথাও শুনা গেল যে, বাংলা ভাষা এবং বাংলা শাড়ির ব্যবহারে পাঞ্জাব দেশের মেয়েটি প্রায় ততখানিই অনভ্যস্তা, যতখানি অনভ্যস্তা মনসাগাছার মেয়েরা উর্দু ভাষা এবং পেশোয়াজের ব্যবহারে। কেহ কেহ এ কথা বলিতেও ছাড়িল না যে, প্রয়োজনস্থলে মেয়েটি উর্দুর পরিবর্তে ইংরেজীতে কথা বলে এবং পেশোয়াজের পরিবর্তে বিলেতী গাউন পরিধান করে।

এই সকল কথার সত্যতার প্রমাণে উৎসুক হওয়া অপেক্ষা নির্বিবাদে বিশ্বাস করার মধ্যে এমন একটা সহজ পুলকের আস্বাদ আছে যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে কে কত বিস্মিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে যেন একটা প্রতিযোগিতা পড়িয়া গেল।

কিন্তু কয়েক দিন পরে আলোকে বাদ্যে আতশবাজিতে সমস্ত গ্রামকে চকিত করিয়া উজ্জ্বল আলোকমালা-শোভিত জমিদার গৃহের পুরদ্বারে উপনীত হইয়া যূথিকা যখন তাহার বিচিত্র কারুকার্যখচিত শিবিকা হইতে নির্গত হইল, তখন তাহাকে অবলোকন করিয়া সেই গ্রামবাসীরাই একটা উগ্রতর বিস্ময় এবং নৈরাশ্যের নূতন আঘাতে বিমূঢ় হইয়া গেল। হাই হীল বিলাতী জুতার পরিবর্তে তাহার শুভ্র নগ্নপদে অলক্তকরাগ, মুখে উর্দু অথবা ইংরেজী বাক্যের পরিবর্তে সুমিষ্ট হাস্যবিধৌত খাঁটি বাংলা ভাষা এবং পরিধানে পাঞ্জাবী পেশোয়াজের পরিবর্তে হালকা হেলিওট্রোপ রঙের মূল্যবান বেনারসী শাড়ি—দেহ-মনে পরিপূর্ণ প্রকাশে উচ্ছলিত বাংলা দেশের কল্যাণী বধূর কমনীয় শ্রী।

এম. এ. পাস করা পাঞ্জাবী বধূর প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া প্রসন্নময়ীর উদ্বেগ-পীড়িত মন কতকটা আশ্বস্ত হইল।

পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী হেমেন্দ্রনাথ সপরিবারে লাহোর হইতে কলিকাতায় আসিয়া মিলিত হইয়া বরবধূর সহিত মনসাগাছায় উপনীত হইয়াছিল।

বরণ সমাপ্ত হইলে এক সময়ে গৌরী জনান্তিকে প্রসন্নময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বউ পছন্দ হয়েছে তো পিসিমা?"

প্রসন্নময়ী বলিলেন, "এমন ঘর আলো করা সুন্দরী বউ পছন্দ হবে না আবার খুব পছন্দ হয়েছে; কিন্তু—"

স্মিতমুখে গৌরী বলিল, "তা হলে আর 'কিন্তু' কী পিসিমা?"

প্রসন্নময়ীর মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, "এম. এ. পাস করা বিদ্বান মেয়ে, মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে পিসশাশুড়ীকে পছন্দ করবে কি-না সেই কথাটাই ভাবি।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিল, "না না পিসিমা, সে ভয় করো না। তোমাকে যদি পছন্দ না করে, তা হ'লে বৃথাই যূথিকার এ ঘরে আসা আর বৃথাই তার এম. এ. পাস করা। কিন্তু যূথিকা আমার জানা মেয়ে, ওকে আমি বেশ

চিনি, ওর আকৃতি দেখে আজ তুমি যেমন খুশি হয়েছ, ওর প্রকৃতি দেখেও ঠিক তেমনি খুশি হবে।"

এই কথার সত্যতার সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রমাণ লাভ করিতে প্রসন্নময়ীর বিলম্ব হইল না; এবং যে প্রমাণ তিনি লাভ করিলেন, তাহা অপর কোনও ব্যক্তির প্রসঙ্গে নহে, নিজেরই ব্যাধিবিধুর দেহের নিরলস পরিচর্যা লাভের মধ্যে। কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি গৌরীকে বলিলেন, "মিছে ভয় করছিলাম গৌরী, বউমার প্রকৃতি অমন সুন্দর আকৃতিকেও হার মানায়। ব্যবহার দেখলে কে বলবে, ও মেয়ে এম. এ. পাস করেছে!"

প্রসন্নময়ীর কথা শুনিয়া খুশি হইয়া গৌরী বলিল, "তা নয় পিসিমা, ব্যবহার দেখলে কে বলবে, ও মেয়ে এম. এ. পাস করে নি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

গৌরীর কথার মর্ম উপলব্ধি করিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "তাই বটে। বউমাকে দেখে লেখাপড়ার ওপর শুধু ভয়ই গেল না, শ্রদ্ধাও হলো।"

এইরূপ দেখিতে দেখিতে দিকে দিকে যূথিকার বিজয় অভিযান আরম্ভ হইল। আত্মীয়-কুটুম্বেরা পরিতুষ্ট হইল, দাস-দাসীগণ বশীভূত হইল, পাড়া-প্রতিবেশীগণ প্রশংসা করিল, শত্রুপক্ষীয়েরা মুখ লুকাইল এবং আশ্রিত অনুগতের দল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গভীর রাত্রে দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের ঘর হইতে এসরাজ ও সেতারের সুনিবিড় ঐক্যতান প্রতিদিন দিবাকরের অকুণ্ঠিত প্রসক্তির সাক্ষ্য দিতে লাগিল। উৎসবান্তে সংসার যখন ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল, যূথিকাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে প্রসন্নতা উচ্ছল হইয়াছে।

একই দিনে একত্রে হেমেন্দ্র গৌরী এবং নিশাকর লাহোর এবং কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইল।

যাইবার পূর্বে নিশাকর এক সময়ে দিবাকরকে একান্তে বলিল, "দাদা আর তো গোলমাল থাকবে না, এখন থেকে প্রতিদিন বউদিদির কাছে একটু ইংরিজী পড়ো।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে কৌতুকের প্রসন্ন হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "ঠাট্টা করছিল নিশা?"

গভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নিশাকর বলিল, না না, ঠাট্টা করছি নে, সত্যই বলছি। এত বড় জমিদার তুমি, ক্রমশ জজ ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার,—এমন কি কখনও হয়তো বা লাট সাহেবের সঙ্গে কথা কইতে হবে, ইংরিজী না জানলে চলবে কেন তোমার?"

দিবাকর বলিল, "তুইও তো জমিদার,—তুই কথা কইবি।"

"আমি কেন জমিদার হতে গেলাম! আমি তো জমিদারের ছোট ভাই। না না ঠাট্টা নয় দাদা,—বউদিদির মতো একজন মাস্টার রাখতে গেলে মাসে মাসে তোমার দুশো আড়াইশো টাকা খরচ পড়ত। এমন সুযোগ ছেড়ো

না, পড়ো।"

দিবাকর বলিল, "তুই পড়িস।"

নিশাকর বলিল, "আমি তো পড়বই। বউদিদির সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে, এবার পূজোর ছুটিতে এসে অনার্সের বইগুলো একসঙ্গে পড়ে একবার ভালো করে ঝালিয়ে নিতে হবে।"

দিবাকর বলিল, "তা নিস। আমার কিন্তু পড়তে নেই। স্ত্রীর কাছে লেখাপড়া শিখলে মানুষ ভেড়া হয়, তা বুঝি জানিস নে?"

"না তা জানি নে; কিন্তু বউদিদির মতো স্ত্রীর কাছে শিখলে ভেড়া মানুষ হয়, তা জানি।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকরের চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—"তুই আমাকে ভেড়া বলছিস না-কি নিশা?" অধরপ্রান্তে কিন্তু কৌতুক-হাস্যের অনাবিল দীপ্তি।

সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, 'তা কখনও বলতে পারি তোমাকে। ভেড়ার তুলনা দিয়ে শুধু বউদিদির শক্তির তুলনা করছিলাম।"

ঠিক সেই সময়ে অপর এক কক্ষে যুথিকার নিকট বিদায় গ্রহণকালে হেমেন্দ্রনাথ বলিতেছিল, "যদিও অনুমানে বুঝতে বিশেষ বাকি নেই, তবুও যাবার দিন তোমার কাছ থেকে কথাটা পাকাভাবে জেনে যেতে যাই যুথিকা।"

সকৌতূহলে যুথিকা বলিল, "কীকথা, দাদা।"

"তোমার এম. এ-পাস এখন সম্পূর্ণভাবে নিষ্কণ্টক হয়েছে তো? দিবাকরের ম্যাট্রিমোনিয়াল পীনাল কোডে এখন তো আর তা অপরাধ বলে স্থান অধিকার ক'রে নেই?"

হেমেন্দ্রের প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ আরক্ত মুখে মৃদু কণ্ঠে যুথিকা বলিল, "মনে তো হয় নেই।"

প্রসন্ন মুখে হেমেন্দ্র বলিল, "তোমার যখন মনে হয়—নেই, তখন নিশ্চয়ই নেই। এ বিষয়ে আমার চেয়ে গৌরীর বিশ্বাসের জোর অনেক বেশি। তোমার এম এ পাস করা লুকিয়ে রেখে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে আমি যখন মনে মনে ভয় পেতাম, গৌরী তখন জোরের সঙ্গে বলত, বিয়ে হয়ে গেলে তুমি অনায়াসে দিবাকরকে তোমার এম.এ. পাস করা হজম করিয়ে নিতে পারবে।"

কিন্তু সেই দিন রাত্রে শয্যাগ্রহণ করিবার পূর্বে দিবাকর যখন কথায় কথায় বলিল "যুথিকা, নিশা আজ আমাকে উপদেশ দিয়ে গেল, প্রত্যহ তোমার কাছে একটু করে ইংরেজী শিখতে। আর বলছিল, তোমার মতো স্ত্রীর কাছে লেখাপড়া শিখলে ভেড়াও মানুষ হয়।"—তখন সহসা যুথিকার মনে হইল, কিছু পূর্বে অপরাহ্নকালে হেমেন্দ্রনাথের প্রশ্নে "মনে তো হয় নেই" বলিয়া সে যে আশ্বাস দিয়াছিল হয়তো তাহা নির্ভুল হয় নাই। কোন কোন কঠিন রোগ বাহ্যত একেবারে সারিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও কখনও কখনও যেমন তাহার

বীজ দেহের মধ্যে দমিত হইয়া থাকে, কিন্তু লুপ্ত হয় না, মনে হইল হয়তো আমার স্বামীর মানসিক ব্যাধিও ঠিক সেইভাবে একেবারে লুপ্ত না হইয়া মনের কোনও গভীর গোপন কোণে দমিত হইয়া আছে।

যূথিকার নির্বাক বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া দিবাকর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "অত চিন্তিত হবার কারণ নেই তোমার। ঠিক ভেড়া বলে নি, ভেড়ার মতো বলছিল।" তাহার পর নিশাকরের সহিত তাহার যে সকল কথা হইয়াছিল, যথাযথ বিবৃতি করিয়া বলিল, "তোমার উপর নিশার যে-রকম শ্রদ্ধা আর ভক্তি, তাতে বোধ হয় তুমি তাকে লক্ষ্মণ দেওর বলতে পার।"

যূথিকা বলিল, "নিশ্চয় পারি। ঠাকুরপোর মধ্যে লক্ষ্মণের অনেক লক্ষণ আছে।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "আর আমার মধ্যেও রামচন্দ্রের কতক লক্ষণ আছে। প্রথমত লক্ষ্মণের আমি বড় ভাই; দ্বিতীয়ত, হাতে ধনুর্বাণের বদলে টোটা-বন্দুক; আর তৃতীয়ত বুদ্ধিতে রামচন্দ্রের মতোই বোকা।"

যূথিকা বলিল, "রামচন্দ্র তো বোকা ছিলেন না।"

দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় ছিলেন। বিনা অপরাধে যিনি স্ত্রীকে অগ্নি-পরীক্ষা করিয়ে নির্বাসন দেন, তারপর সতীত্বের নিখুঁত প্রমাণ পেয়ে বাড়ি ফিরিয়ে এনে কয়েকজন প্রজার অন্যায় আবদারে আবার নূতন করে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বলে পাতাল-প্রবেশ করান, তিনি বোকা ছিলেন না তো কি? সেইজন্যেই তো বোকা মানুষকে লোকে বোকারাম বলে।"

ফিকা হাসি হাসিয়া যূথিকা বলিল, "আমার রামচন্দ্র কিন্তু তেমন নন। অপরাধিনী স্ত্রীকে তিনি নির্বাসন দিয়ে আসেন নি, ক্ষমা করে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।"

কিছুক্ষণ হইতে আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা বড় রকম বৃষ্টি-বাদলের আয়োজন চলিতেছিল। দিবাকর বলিল, "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে, জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ রভসে, ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা। এখন থামাও যূথিকা রামায়ণের তুলনা। চল, শুয়ে শুয়ে বর্ষার গান শোনা যাক।"

"চল।"

রামায়ণের তুলনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া যূথিকা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

তের

আশ্বিন মাস। পূজার ছুটিতে নিশাকর বাড়ি আসিয়াছে।

দুর্গাপূজার পর একদিন দিবাকর তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিল. এমন সময়ে নিশাকর এবং যূথিকা প্রবেশ করিয়া দুইখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

বইখানা টেবিলের উপর উল্টাইয়া রাখিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কী মতলব তোমাদের ? বনভোজন সঙ্গীত-বৈঠক, নৌকা-ভ্রমণ, না অন্য কিছু ?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "অন্য কিছু।"

নিশাকর বলিল, "এ অন্য-কিছু কিন্তু বেশ-কিছু দাদা। এ আর চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার কথা নয়। এর মূলধন হবে আপাতত পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে দিবাকর বলিল, "পঞ্চাশ হাজার টাকায় কী হবে রে নিশা ? ধানের কল না চিনির কারখানা ?"

নিশাকর বলিল "বিদ্যের কারখানা। মেয়েদের জন্য মনসাগাছায় স্কুল তো দূরের কথা একটা ভাল পাঠশালাও নেই। মনসাগাছার পরম সৌভাগ্যক্রমে বউদিদির মতো একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা মনসাগাছা জমিদারবড়ীর বড় বউ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি এ ত্রুটির প্রতিকার না করি তা'হলে আমার মতে সে আচরণের দ্বারা আমরা গভীরভাবে নিজেদের অপমানিত করব।"

নিশাকারর কথা শুনিতে শুনিতে দিবাকরের মুখে কৌতুকে নিঃশব্দ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিল "বাপ রে! তোর মুখে যে সাধু ভাষার খৈ ফুটছে। লিখে মুখস্থ করে এসেছিস না-কি ? কী চাস সাদা বাংলায় বল্ না ?"

"সাদা বাংলায়, আমরা একটা প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় চাই। আর তার জন্যে চাই পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা।"

কথাটা দিবাকরের একেবারে অবিদিত ছিল না। কিছুকাল পূর্বে যূথিকা একদিন এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিল এবং কথা হইয়াছিল পূজার ছুটিতে নিশাকর আসিলে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে।

দিবাকর বলিল, "বুঝলাম। কিন্তু এভাবে আমরা যদি মনসাগাছার ত্রুটির প্রতিকার করি তা'হলে আমরা নিজেদের সম্মানিত করব তো ?"

নিশাকর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না না তা'হলে আমরা বউদিকেই সম্মানিত করব।"

এবার দিবাকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ কারবার কিন্তু তোমার পক্ষে মন্দ নয় যূথিকা। কেউ যদি অপমানিত হয় তো সে আমরা, আর কেউ যদি সম্মানিত হয় তো সে তুমি।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমি যে এ কারবারে শূন্য বখরাদার। লোকসানের ভয় নেই কিন্তু লাভের ভাগ আছে।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া নিশাকর বলিল, "না না বউদিদি, শূন্য বখরাদার কেন তুমি হবে? তুমি হচ্ছ ষোল আনার মালিক। সব টাকাটা তুমিই দেবে। আমরা দু ভায়ে শুধু টাকাটা তোমাকে যোগাব। পঁচিশ হাজারের অঙ্ক পড়বে দাদার অংশে আর বাকি পঁচিশ হাজারের পড়বে আমার অংশে।"

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এই ছোট গ্রামে একটা মেয়ে স্কুলের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা কা হবে রে? পঞ্চাশ হাজার টাকায় যে একটা কলেজ হয়।"

নিশাকর বলিল, "এ স্কুল তো প্রকৃতপক্ষে কলেজের সূত্রপাতই হবে। প্রথম যে-মেয়েরা ম্যাট্রিক পাস করবে তাদের নিয়েই আমরা কলেজের প্রতিষ্ঠা করব।"

দিবাকর বলিল, "কলেজ যখন হবে তখনকার কথা তখন। এখন স্কুল করতে পঞ্চাশ হাজার টাকার কিসের দরকার শুনি?"

পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া নিশাকর বলিল, "রীতিমত স্কীম তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে করা যাবে, উপস্থিত আমরা দুজনে মিলে এই খসড়াটা তৈরী করেছি।" দিবাকরের সম্মুখে কাগজখানা স্থাপিত করিয়া বলিল, "এটা তুমি সময়মত পড়ে দেখো। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা থাকবে রক্ষিত পুঁজি, যার আয়ের সাহায্যে চালাতে হবে স্কুলের নিয়মিত খরচ। কারণ ছাত্রীর সংখ্যা এমন কিছু হবে না, যার মাইনে থেকে সব খরচ চলতে পারবে। বাকি দশ হাজার খরচ হবে লাইব্রেরি, আসবাবপত্র, স্কুলের বাড়ি, হস্টেল আর চার-পাঁচখানা পালকি তৈরি করতে।"

"অতগুলো পালকি কী হবে?"

নিশাকর বলিল, "কাছাকাছি দু-তিনখানা গ্রাম থেকে মেয়েরা পালকি করে আসা-যাওয়া করবে। আর দূরের গ্রামের মেয়েরা থাকবে টীচারদের সঙ্গে হস্টেলে। মোটামুটি এই হলো স্কুলের পরিকল্পনা। তারপর পাঁচ-ছ বছর পর যখন কলেজের পত্তন হবে তখন আবার নূতন উদ্যমে নূতন কল্পনা নিয়ে লাগা যাবে। সে কলেজের বউদিদি হবেন প্রিন্সিপাল, আমি হব লেকচারার, আর তুমি হবে—"

নিশাকরকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া দিবাকর বলিল, "দফতরি।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিশাকর বলিল, "বা রে! তুমি দফতরি হবে কোন্ দুঃখে? তুমি হবে অধিনায়ক—ডিরেক্টার। আমরা চালাব মেয়েদের, আর তুমি চালাবে আমাদের।"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে তোরা ভুল পথে চলবি। তার চেয়ে আমি দফতরিই হব।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি তোমার প্রিন্সিপালের খাস-কামরায় বসে দুবার বেল টিপে আমার নম্বরে আমাকে

ডাক দেবে। আমি সাদা চাপকান পরে কোমরে লাল-সবুজ রঙের পাকানো দড়া এঁটে বারান্দায় টুলে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে টপ করে লাফিয়ে উঠে 'হুজুর' বলে সাড়া দিয়ে ছুটে তোমার ঘরে হাজির হব। তুমি কড়া চোখে আমার দিকে চেয়ে বলবে, 'চার নম্বর আলমারীতে তিনটে বই উলটে পালটে রেখেছ কেন? খুঁজে বার করতে অসুবিধে হয় যে।' দু হাত কচলাতে কচলাতে আমি বলব, এখনি ঠিক ক'রে দিচ্ছি মেমসাহেব, কসুর মাফ করতে আজ্ঞা হয়।"

দেখা গেল, দিবাকরের কথা শুনিতে শুনিতে সহসা কোন মুহূর্তে যূথিকার মুখ হইতে পূর্বের উৎসাহ-উদ্দীপনার দীপ্তি খানিকটা অন্তর্হিত হইয়াছে। ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল, "তা নয়। তুমি তোমার ডিরেক্টারের ঘরে বসে বেল টিপে দফতরিকে ডেকে বলবে, 'প্রিন্সিপালকে সেলাম দাও।' অসময়ে হঠাৎ তোমার ডাক পেয়ে ভয়ে ভয়ে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তুমি আমার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলবে, 'দেখুন' আপনার কাজকর্মে তেমন আর সন্তুষ্ট হতে পারছি নে। আপনার চেয়ে যোগ্য লোক আমি পেয়েছি। আসছে মাস থেকে আর আমাদের আপনাকে প্রয়োজন হবে না।' তোমার হুকুম শুনে দুঃখ আর অপমানে মাথা হেট করে আমি ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসব।"

নিশাকর বলিল, "তার আধ ঘণ্টার মধ্যে অগ্নিমূর্তি ধরে ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে ক্রুদ্ধ স্বরে আমি বলব, "শুনুন ডিরেক্টার মশায়, যূথিকা ব্যানার্জির মতো সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যালকে অকারণ অযোগ্য বলে যেখানে অপমানিত করা হয় সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি কোন সংস্রব রাখতে চাই নে। যূথিকা ব্যানার্জি যখন ইচ্ছা ইস্তফা দেবেন, আমি কিন্তু আমার ইস্তফাপত্র লিখে এনেছি, এই নিন। কাল থেকে এ কলেজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে না।"

দিবাকর বলিল, "আমি ধীরে ধীরে কলমে টুপি লাগিয়ে, দেরাজে চাবি দিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলব, 'যখন দেখছি আমার প্রতি আপনাদের এই রকম আস্থার অভাব তখন আমিই আপনাদের ডিরেক্টরের পদে ইস্তফা দিয়ে চললাম। এর পরও যদি আমাকে আপনাদের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন, তাহ'লে গৌরী সেনের পদে আমাকে নিযুক্ত করবেন। টাকার প্রয়োজন হলে স্মরণ করবেন আমাকে।"

নিশাকর বলিল, "গৌরী সেনের পদে তো তুমি আজ থেকেই নিযুক্ত হচ্ছ, ডিরেক্টারের পদ থেকেও তোমাকে ইস্তফা দিতে দেওয়া হবে না।"

"অর্থাৎ আমাকে জরিমানাও দিতে হবে, কারাদণ্ডও ভোগ করতে হবে।" বলিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিল। তাহার পর সম্মুখ হইতে নিশাকরদের খাসড়াখানা তুলিয়া দেখিয়া বলিল, "নাম করেছিস শুধু বালিকা-বিত্যালয়? 'মনসাগাছা' কিংবা অন্য কোনও কথা ওর সঙ্গে যোগ থাকবে না?"

নিশাকর বলিল, "নিশ্চয় থাকবে। শুধু 'বালিকা-বিত্যালয়'—ন্যাড়া নাম কখনও হয়? নামটা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করার পর পুরোপুরি

লেখা হবে।' যদিও মনে মনে নাম আমি স্থির করে ফেলেছি।"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দিবাকর বলিল, "চমৎকার তো। আমার সঙ্গে পরামর্শ করেও স্থির করতে হবে, অথচ মনে মনে স্থির করেও ফেলেছিস?"

"কিন্তু সে নাম যে তোমার নিশ্চয় পছন্দ হবে।"

"সর্বনাশ। সে কথাও মনে মনে জেনে রেখেছিস?" তার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "তোমার পছন্দ হয়েছে যূথিকা?"

যূথিকা হাসিয়া বলিল, "কী করে হবে বল? ঠাকুরপো এখনও সে নাম আমাকে বলে নি।"

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কেন রে? নাম নিয়ে এত লুকোচুরি কিসের?"

নিশাকর বলিল, "তুমি ডিরেক্টর, শুনে মঞ্জুর নামঞ্জুর করবে। তোমার আগে বউদিদিকে বলে কী হবে?"

"তা বেশ, আমাকেই বল্?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করিয়া নিশাকর বলিল, "যূথিকা-বালিকা-বিদ্যালয়।"

"যূথিকা-বালিকা-বিদ্যালয়।" সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "বেশ নাম রেখেছিস। খাসা নাম।"

বিস্ফারিত নেত্রে যূথিকা বলিল, "ও। এই জন্যেই তুমি কিছুতেই আমাকে বলছিলে না।" তাহার পর প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "না না ঠাকুরপো ও-নাম কিছুতেই হতে পারে না,—ও-নাম হবার কোনও কারণই নেই।

দৃপ্ত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "কেন নেই, শুনি?"

যূথিকা বলিল, "তোমাদের বাড়িতে আসার এপর্যন্ত তিন মাসও হয় নি, এরই মধ্যে আমার নাম স্মরণীয় করতে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে বল? তার চেয়ে আমি যে নাম মনে মনে স্থির করেছি সেই নাম খাসড়ায় লিখে নাও।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিশাকর বলিল, "তুমি আবার কী নাম স্থির করেছ?"

যূথিকা কথা কহিবার পূর্বে দিবাকর সকৌতুকে বলিল, "বোধ হয় নিশাকর বালিকা-বিদ্যালয়।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া নিশাকর এবং যূথিকা উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

যূথিকা বলিল, "নিশাকর-বালিকা বিদ্যালয়'ও নয়। আমার নাম হচ্ছে "যোগমায়া-বালিকা-বিদ্যালয়।"

"হ্যাঁ, মার নামে। কেন নাম পছন্দ হয় না তোমার?"

উৎসাহভঙ্গের স্তিমিত স্বরে নিশাকর বলিল, "পছন্দ হয় না তা বলি নে; তবে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তোমার নাম যোগ হওয়ার বেশি সার্থকতা আছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। মার নামের স্মৃতিতে আমরা তো অন্য কিছুও করতে পারি।"

যূথিকা বলিল, "কিন্তু ঠাকুরপো, স্মৃতিরক্ষা যে সব সময়ে ব্যক্তিগত দাবির হিসেবেই করতে হবে, তার কোনও মানে নেই। তা ছাড়া, পিসিমার মুখে শুনেছি সন্ধ্যের পর পাড়ার গিন্নী-বান্নী বউ-ঝিয়েদের নিয়ে মা নিয়মিত রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করতেন। সুতরাং মনসাগাছায় স্ত্রী-শিক্ষাদানের দিক দিয়ে মার নামের দাবিও তো কম নয়।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকরের দিকে চাহিয়া নিশাকর বলিল, "তুমি কী বল দাদা ?"

দিবাকর বলিল, "তোরা দুজনে একমত হতে পারছিস নে, তার মধ্যে আমি কী বলব ?"

নিশাকর বলিল, "বা রে! আজকের এ মীটিং-এর তুমি তো প্রেসিডেণ্ট, কাস্টিং ভোট তো তোমারই।"

দিবাকর বলিল, "তা যদি বলিস তা হলে তোর বউদিদির দিকেই আমার ভোট।"

ঈষৎ অভিমানের সুরে নিশাকর বলিল, "তোমার ভোট তো বউদিদির দিকে হবেই।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কী করি বল, তোমার জেদের কাছে হার স্বীকার করতেই হলো। কিন্তু পাঁচ-ছ বছরের পরে যখন কলেজ হবে, তখন কারও কথা শুনব না, কলেজের নাম হবে যূথিকা-গার্লস্-কলেজ'।'

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে যূথিকা বলিল, "বেশ তো, তখন যদি এ জগতে কোথাও আমাকে খুঁজে না পাওয়া যায়, তা হ'লে ঐ নামই দিয়ো। কিন্তু দোহাই তোমার, অসময়ে আমার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করে বেঁচে থাকার লজ্জা আমাকে দিয়ো না।"

নিশাকর বলিল, "স্মৃতিরক্ষার পক্ষে বেঁচে থাকার সময় অসময়—এ তোমার একটা কুসংস্কার।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "কিন্তু এ-সব কুসংস্কারকে কাটিয়ে ওঠাও ভারি কঠিন ঠাকুরপো।"

সপুলক আনন্দে দিবাকর স্ত্রী এবং সহোদরের কপট বিবাদ উপভোগ করিতেছিল। খসড়ার কাগজখানা যূথিকার হস্তে তুলিয়া দিয়া সে বলিল, "আজ কিন্তু এই পর্যন্তই। ঐ পুবদিকের বাগানে বকুলগাছের তলায় বেঞ্চে বসে যতক্ষণ ইচ্ছে তোমরা ঝগড়া করগে,—আপাতত আমি একটু পড়ায় মন দিই।" বলিয়া টেবিলের উপর হইতে বইটা তুলিয়া লইল।

খসড়াটা দিবাকরের দিকে আগাইয়া ধরিয়া যূথিকা বলিল, "এটা তোমার কাছেই থাক না।"

দিবাকর বলিল, "না না, তোমাদের কাছেই থাক্, দরকার হলে চেয়ে নিলেই হবে। অন্যমনস্ক মানুষ, হঠাৎ কান চুলকে উঠলে হয়তো খসড়ারই খানিকটা

ছিঁড়ে নিয়ে পাকিয়ে ফেলব।"

যূথিকার হস্ত হইতে কাগজখানা লইয়া দিবাকরের সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিশাকর বলিল, "তা হ'লে স্কুলের পুরো নামটা তুমি লিখে দাও।"

"তাতে অবশ্য আপত্তি নেই।" বলিয়া দিবাকর একটা কলম খুলিয়া 'বালিকা-বিদ্যালয়ে'র পূর্বে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিল 'যোগমায়া'। তখন সম্পূর্ণ নাম হইল 'যোগমায়া-বালিকা-বিদ্যালয়'।

চৌদ্দ

পরদিন হইতে বর্ধিত উৎসাহে বিদ্যালয়ের গঠনকার্য আরম্ভ হইয়া গেল। অট্টালিকার এক প্রান্তের একটা কোণের ঘর খালি করিয়া অফিস-ঘর করা হইল। তাহাতে পড়িল একটা আলমারি, গোটা দুই হোয়াট্‌নট্‌, পাঁচ-ছয়খানা চেয়ার, ডিরেক্টর দিবাকরের জন্য একটা সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল এবং সেক্রেটারি যূথিকা ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি নিশাকরের জন্য দুইটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের টেবিল। কাজ করিয়া সেক্রেটারি পরিশ্রান্ত হইলে বিশ্রাম লইবার জন্য নিশাকর নিজের ঘর হইতে একটা ভালো ইজি-চেয়ার আনিয়া সেক্রেটারির টেবিলের এক পার্শ্বে স্থাপন করিল।

খুচরা খরচ-পত্র চালাইবার জন্য আপাতত পাঁচ শত টাকার একটা ক্ষুদ্র হিসাব খোলা হইল; এবং সেই হিসাব রাখিবার ভার পড়িল উপস্থিত জমিদার-সেরেস্তার একজন কর্মচারীর উপর। কলিকাতা হইতে অর্ডার দিয়া আসিল দশ-বারোখানা নানা আকারের বাঁধানো খাতা এবং এবং তাহার সহিত কালি কলম কাগজ পেন্সিল ইত্যাদি স্টেশনারির যাবতীয় সরঞ্জাম। রোকড়ের খাতায় বিশ হাজার টাকার অঙ্ক পড়িল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খোলা হইল, খতিয়ানির খাতা প্রস্তুত হইল, এবং জমা-খরচের খাতা পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠায় বাড়িয়া চলিল।

ইহার পর সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি যখন-তখন ডিরেক্টার এবং সেক্রেটারিদের বৈঠক বসিতে লাগিল; এবং সেই সকল ঘন-ঘন আহূত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী বৈঠকে কল্পনা-জল্পনা বিবাদ-বিতর্কের অন্ত রহিল না।

প্রথম প্রথম দিবাকর এই সকল আলাপ-আলোচনায় কতকটা উৎসাহ বোধ করিত, কিন্তু ক্রমশই যেন সে উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। এখন সে সাধ্যমতো অফিস-ঘর হইতে দূরে দূরে পালাইয়া বেড়ায়—কিন্তু অক্ষীয়মাণ তৎপরতার সহিত নিশাকর এবং যূথিকা বারংবার নূতন নূতন গুপ্ত আশ্রয় হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ডিরেক্টরের আসনে আনিয়া বন্দী করে।

একদিন দুইঘণ্টাব্যাপী বিস্তৃত আলোচনার পর যূথিকার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত

করিয়া দিবাকর বলিল, "দোহাই যূথিকা, ম্যাট্রিক পাস না করতে পারা অপরাধের যথেষ্ট শাস্তিভোগ হয়েছে; এবার থেকে একটু করে আমাকে অব্যাহতি দিতে আরম্ভ করো।"

নিশাকর বলিল, "এ কথার মানে কী দাদা?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "ওরে, গাঁথনি যদি শক্ত করতে চাস তা হ'লে মরা চুনের মসলা দিলে চলবে না। আমি হচ্ছি মরা চুন।"

তীক্ষ্ণ নেত্রে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর বলিল, "ও! তুমি হচ্ছে মরা চুন? আর আমরা?"

"তোরা? তোরা হচ্ছিস বালি আর সুরকি। তুই বরাকরের বালি আর তোর বউদিদি লাল-টুকটুকে সুরকি। বালি সুরকি অবশ্য উচ্চশ্রেণীর; কিন্তু তা হ'লে কি হয় তার সঙ্গে মরা চুনের মিশেল হ'লে মসলা হবে দুর্বল।"

নিশাকর বলিল, "আর মরা চুন বাদ দিলে শুধু বালি আর সুরকিতে খুব জোরালো মসলা হবে তো?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "তাই কখনও হয়ে থাকে? আমি কলকাতা থেকে তোদের জন্যে চুন আনিয়ে দেবো,—একেবারে খাস সিলেট লাইম।"

অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, ডক্টর সুনীথনাথ চ্যাটার্জি এম.এ.,পি-এইচ. ডি।"

"কে? সুনীথদাদা?"

"হ্যাঁ, সুনীথদা। কেন?—খুব ঝাঁঝালো চুন নয় কি?"

সে বিষয়ে অবশ্য অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তথাপি নিশাকর আপত্তির প্রবল সুরে বলিল, "মনসাগাছায় স্কুল, আর দু'শো মাইল দূরে কলকাতায় সুনীথদা, চমৎকার কাজ চলবে!"

দিবাকর বলিল, "চলবে, রে চলবে, চমৎকারই চলবে। জানিস নে সেকরার ঠুক্‌ঠাক্ আর কামারের এক ঘা। আমি মনসাগাছায় বসে প্রতিদিন ঠুক্‌ঠাক করে যা করব, ন মাসে ছ-মাসে কলকাতা থেকে একদিনের জন্য সুনীথদা এসে এক ঘায়ে তার দশগুণ করে দিয়ে যাবে। বিদ্যের থৈ নেই, অগাধ টাকা, যথেষ্ট সময়;—এমন লোক আর পাবি কোথায়?"

নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "সুনীথদাদাকে তুমি এ বিষয়ে কিছু লিখেছ না-কি?"

দিবাকর বলিল, "না, এখনও লিখি নি কিছু। মেয়ের অসুখের পর মেয়েকে নিয়ে শিলং-এ ছিল বলে বিয়ের সময়ে তো সুনীথদাদা আসতে পারে নি; বড়দিনের সময়ে স্কুল-প্রতিষ্ঠার উৎসবে আসতে লিখব।"

"তা একশোবার লিখো; কিন্তু স্কুল-কমিটিতে সুনীথদাদাকে নেওয়ার প্রস্তাব আমার একটুও ভালো লাগছে না। তোমার কী মত বউদি?"

যূথিকা বলিল, "আমি তো এ ব্যবস্থার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখছি নে!"

তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সুনীথবাবু কে? তোমাদের কোনও আত্মীয়?"

দিবাকর বলিল, "সাধারণ অর্থাৎ আত্মীয় বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে; তবুও সুনীথদা আমাদের পরমাত্মীয়। বসো, বুঝিয়ে বলছি, তার আগে চুরুটটা একটু ধরিয়ে নিই।" বলিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইতে প্রবৃত্ত হইল।

দিবাকরের পিতামহ ছিলেন সুনীথের পিতামহর সহোদর ভ্রাতার ভায়রাভাই। সুতরাং, সম্পর্কের হিসাব কষিলে আত্মীয়তার মূল্য বিশেষ কিছু দাঁড়ায় না। কিন্তু কিছুকাল নিবিড়ভাবে কাছাকাছি বাস করিবার ফলে এই অকিঞ্চিৎকর আত্মীয়তাকে অবলম্বন করিয়া যে প্রগাঢ় সৌহৃদ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার মূল্য সামান্য নহে। কলেজে পড়িবার সময়ে সুনীথ দুই-তিনটা পূজার এবং গ্রীষ্মের ছুটি মনসাগাছায় মাতুলালয়ে অতিবাহিত করে। সেই অবসরে দিবাকরদের সহিত, বিশেষত দিবাকরের সহিত, সাধারণ পরিচয় হইতে ক্রমশ তাহার গভীর অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়। কালক্রমে মনসাগাছার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সুনীথের মাতুলেরা অন্যত্র চলিয়া গেলেও সে কয়েকবার মনসাগাছায় আসিয়া দিবাকরদের গৃহে বাস করিয়া গিয়াছে; এবং দিবাকরও কয়েকবার কলিকাতায় গিয়া সুনীথের গৃহে বাস করিয়া পাল্টা থাকিয়া আসিয়াছে। সুনীথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র। দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনার জন্য কলিকাতার একটি বিশিষ্ট কলেজ কর্তৃক বৎসর দুই পূর্বে সে আমন্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় সে প্রত্যাখ্যান করে।

সেই দিন রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে যূথিকা দিবাকরকে বলিল, "শোন, মেয়ে-স্কুলের কল্পনা তোমার যদি ভালো না লাগে তো ছেড়ে দেওয়া যাক।"

হাসিমুখে দিবাকর বলিল, "কেন বলো দেখি? তোমাদের কমিটি ছেড়ে দেবো বলছিলাম বলে অভিমান হয়েছে?"

যূথিকা বলিল, "না, অভিমান কেন। তোমার ভালো না লাগলে আমারও ভালো লাগবে না।"

দুই আঙুলে যূথিকার নাসিকাগ্র ঈষৎ নাড়িয়া দিয়া প্রগাঢ়ভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "সত্যি?"

"সত্যি।"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "বেশ তো, ছাড়তে চাইলে-ই কি হয়? তোমরা তো কমলি হয়ে আমাকে ধরে রাখতে পার। কিন্তু একটা কথা বলি। মূর্খ স্বামীকে স্কুল কমিটির ডিরেক্টর করে কী লাভ হবে তোমাদের? মাটির পুতুলকে রাংতা দিয়ে মুড়লেই কি দেবতা হয়?"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া যূথিকা বলিল, "আবার ঐ সব কথা?"

ব্যস্তভাবে দিবাকর বলিল, "না না অপরাধ হয়েছে। মূর্খ স্বামী নয়, খুব

বিদ্বান স্বামী। এখন চল, শোবার আগে একটু সিন্ধু-রাগিণী বাজানো যাক।"

যূথিকা বলিল, "আর একটা কথা আছে।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া দিবাকর বলিল, "আবার কী কথা? তোমার কথা আছে শুনলেই আমার ভয় করে।"

যূথিকা হাসিয়া বলিল, "ভয়ের কথা একবারই বলেছিলাম। এ কথায় কোনও ভয় নেই।"

"কী কথা তা হলে বল?

"আমাদের স্কুল কমিটিতে সুনীথবাবুকে ঢুকিয়ো না।"

সবিস্ময়ে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা এর মানে কী বলো দেখি? এ বিষয়ে তোমাদের দুজনের এত আপত্তি কেন? সুনীথদাদার মতো পণ্ডিত লোককে পাওয়া তো মহা সৌভাগ্যের কথা।"

যূথিকা বলিল, "আমাদের সামান্য মেয়ে স্কুলের পক্ষে খুব বেশি পণ্ডিত লোকের কাছে হাঁপিয়ে উঠতে হবে।"

যূথিকার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দিবাকর বলিল, "যত-সব বাজে কথা বললেই আমি বিশ্বাস করব কি না! আমার মতো লোক তোমার কাছে দিব্যি সহজেই নিশ্বেস ফেলে কাটাচ্ছে, আর তুমি অত ভালো করে এম. এ. পাস করে সুনীথদার কাছে হাঁপিয়ে উঠবে?"

যূথিকার মুখে শান্ত আনন্দের সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "সব সমর্পিয়া প্রাণ-মন দিয়া নিশ্চয় হয়েছি দাসী, আর তুমি আমার কাছে সহজে নিশ্বাস ফেলবে না? আমাদের কথার সঙ্গে সুনীথবাবুর কথার কখনও তুলনা হয়?"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে দিবাকর বলিল, "আরে খেয়াল করি নি এতক্ষণ! তখন থেকে তুমি সুনীথদাকে অনায়াসে 'সুনীথবাবু' 'সুনীথবাবু' বলে চলেছ? আমার চেয়ে পাঁচবছরের বড় — সুনীথদা।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সুনীথদাদাই।" বলিয়া হাসি মুখে যূথিকা সেতার ও এসরাজ আনিতে উঠিয়া গেল।

পনের

পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া নিশাকরের শয়ন কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যূথিকা দেখিল, ইতিপূর্বেই নিশাকর নিদ্রাভঙ্গের পর নামিয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া প্রথমেই ফুলবাগানে প্রবেশ করার অভ্যাস নিশাকরের, এ কথা তাহার জানা ছিল। বাগানের এক নিভৃত অঞ্চল হইতে সে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। কয়েকটি পুরাতন গোলাপগাছের অনাবশ্যক ডাল কাঁচি দিয়া নিশাকর কাটিতেছিল। নিঃশব্দে তার পিছন দিকে উপস্থিত হইয়া যূথিকা বলিল, "সুপ্রভাত ভাই লক্ষণ।"

কাঁচি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে নিশাকর বলিল, "সুপ্রভাত। কিন্তু তাই বলে তোমাকে সীতা বলে সম্বোধন করলাম না বউদিদি।"

সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, "সীতা সম্বোধনের আমি যোগ্য তা অবশ্য বলছি নে; কিন্তু কেন করলে না, সে কথাও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

নিশাকর বলিল, "কারণ আমি ইচ্ছে করি নে যে, সীতার মতো তুমি দুর্বলচরিত্র হও। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস, সীতার চেয়ে তোমার চরিত্রবল অনেক বেশি। সুতরাং সীতা বলে সম্বোধন করলে একদিক দিয়ে তোমাকে খাটো করাই হয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "সীতাকে তুমি দুর্বলচরিত্র বলছ ঠাকুরপো!"

নিশাকর বলিল, "বলব না? নিজেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ জেনেও স্বামীর অন্যায় আবদারে যিনি নিজের নিষ্কলুষতার পরীক্ষা দিতে রাজী হয়েছিলেন, তিনি দুর্বল চরিত্র নন তো কী?"

ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত যূথিকা বলিল, "না না ঠাকুরপো, একে তুমি দুর্বলচরিত্র বলছ কী করে? আমার তো সীতা চরিত্রের এই দিকটাই খুব চমৎকার লাগে। নিজের স্বাধীন মত স্বাধীন সত্তা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করতে সামান্য স্ত্রীলোকেও পারে। কিন্তু স্বামীর ইচ্ছার মধ্যে নিজের সত্তাকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে দরকার চরিত্রের বল আর অবিচল ভালোবাসা।"

কুঞ্চিত চক্ষে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর বলিল, "আর অচপল ভক্তি নয়?"

দিবাকরের গত রাত্রের সদয় ব্যবহারের স্মৃতিতে মনটা তখনও কৃতজ্ঞ হইয়া ছিল, সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ অচপল ভক্তিও।"

বিস্মিত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "কী আশ্চর্য বউদিদি! তুমি না একজন উচ্চ-শিক্ষিতা আধুনিক মেয়ে? পতিভক্তির এই সেকেলে পুরোনো ভঙ্গিকে এমন অসংকোচে প্রশংসা করতে তুমি একটুও কুণ্ঠা বোধ করছ না?"

তেমনি স্মিত মুখে যূথিকা বলিল, "আমি তো আধুনিক মেয়ে নই ঠাকুরপো,

আমি আল্ট্রা আধুনিক মেয়ে। তাই যে কথা আধুনিক মেয়েরা প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করে আমি তা অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করি।"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া নিশাকর বলিল, "না না বউদি, তুমি আমাকে বেশ একটু ভাবিয়ে তুললে। খুব বেশি পৌরাণিক হলে কিন্তু তোমার চলবে না। তোমার ঐ রামচন্দ্র পতিটির মধ্যে ত্রেতা যুগের রামচন্দ্রের অনেক কিছু দৃঢ়তা আর দুর্বলতা আছে। এ কথা নিশ্চয়ই জেনো, ও-ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে তোমাকে ফাইট্ দিতেই হবে, আর জয়ী হতেও হবে।"

যূথিকার মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল, "কাল রাত্রেই তো ফাইট্ দিয়েছি।"

উল্লসিত হইয়া নিশাকর বলিল, "সাধু! কিন্তু স্কুলের বিষয়েই ফাইট্ তো?"

"তা নইলে আর কোন্ বিষয়ে?"

আগ্রহসহকারে নিশাকর বলিল, "বল বল, সমস্ত কথা খুলে বল।"

যূথিকা বলিল, "অনেকক্ষণ তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, কাজ শেষ কর। চা খাওয়ার পর বলব এখন।"

নিশাকর বলিল, "সে ধৈর্য থাকলে এতদিন অনেক কিছু করতে পারতাম। চল, ঐ বেঞ্চে বসে সব কথা শুনি।"

উভয়ে গিয়া বেঞ্চে উপবেশন করিল।

সেতার ও এসরাজের ঐকতানবাদনের পরও গত রাত্রে দিবাকর এবং যূথিকার মধ্যে স্কুল-পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। যূথিকা সংক্ষেপে সে সকল কথা নিশাকরকে শুনাইল।

খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "সাধে কি আমি সেদিন তোমাকে ষ্টীম্-লঞ্চ আর দাদাকে গাধা বোট বলেছিলাম। তুমি তো একেবারে চটেই লাল।"

সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "চটি নি ঠাকুরপো, আপত্তি করেছিলাম। কারণ, আমি তো জানি, তোমার ষ্টীম-লঞ্চ কতবার তোমার দাদার আগে আগে চলে আর কতবার পিছনে পিছনে যায়।"

নিশাকর বলিল, "কিন্তু আমি চাই যে ষ্টীম-লঞ্চ কখনও দাদার পিছনে পিছনে না যায়। হয় আগে আগে চলে, নয় পাশে পাশে। হে আর্যপুত্র, আপনার মত ছাড়া দাসীর আর দ্বিতীয় মত নেই—একথা আর আধুনিক স্ত্রীর মুখে চলে না। 'তোমার গরবে গরবিণী'র যুগ গত হয়েছে।"

যূথিকা বলিল, "আচ্ছা, আসুক আগে উর্মিলা এ সংসারে, তারপর তার কানের মধ্যে এই মন্ত্রগুলো ঢুকিয়ে দেবো। তখন চলো তাকে ষ্টীম-লঞ্চ করে তার পিছনে পিছনে গাধা-বোট হয়ে।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

স্মিতমুখে নিশাকর বলিল, "ষ্টীম-লঞ্চের যোগ্যতা নিয়ে যদি উর্মিলা কখনও আসে, তা হলে তার পিছনে পিছনে চলার সৌভাগ্যকে তোমার আজকের আশীর্বাদের সুফল বলে মনে করব। কিন্তু শোন বউদি, দাদার মতিগতি যখন

ফিরেছে, তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা শেষ করে তারপর নিঃশ্বাস ফেলা।”

বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যূথিকা বলিল, “এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত।”

ষোল

সেই দিনই বৈকালে কুলপুরোহিত বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থের তলব পড়িল উদ্বোধনের শুভদিন স্থির করিবার জন্য। পাঁজি দেখিয়া নানাপ্রকার বিচার বিবেচনা করিয়া বাণীকণ্ঠ স্থির করিলেন, ১১ই পৌষ—২৮শে ডিসেম্বর।

পরদিন সকালবেলা দিবাকর নিশাকর এবং যূথিকা অফিস-ঘরে মিলিত হইয়া যথাবিধি শাসন-সংসদ অর্থাৎ গভর্নিং বডি গঠিত করিল। সংসদের অধিনায়ক অর্থাৎ ডিরেক্টর হইল দিবাকর, যূথিকা হইল সেক্রেটারি অর্থাৎ সম্পাদিকা এবং নিশাকর হইল সহযোগী সম্পাদক অর্থাৎ জয়েন্ট সেক্রেটারি।

অল্প সময়—মাস আড়াইয়ের মাত্র দুই চার দিন বেশি; ইহারই মধ্যে সকল ব্যবস্থা শেষ করিতে হইবে। স্থির হইল, উপস্থিত বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র গৃহ নির্মিত না করিয়া জমিদার-ভবন হইতে অল্প পূর্বে একই প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা যে একতলা পাকা বাড়ি আছে, প্রয়োজনমতো পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত করিয়া আপাতত তাহাতেই কাজ চালাইতে হইবে। রাজসাহী হইতে পুরাতন কন্‌ট্রাক্‌টর ও হেড মিস্ত্রি আসিয়া কাজ বুঝিয়া ইট বালি চুন প্রভৃতি মাল মসলার হিসাব করিয়া দিয়া গেল। কলিকাতার এক পরিচিত বড় কাঠের কারখানায় স্কুলের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্র ও পাঁচখানা পালকি ফরমাস দেওয়া হইল। পাঠ্য পুস্তক ও পঠনসূচী প্রস্তুত হওয়ার পর কলিকাতা হইতে এক বিখ্যাত পুস্তকালয়ের কর্মচারী আসিয়া বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজী মিলাইয়া প্রায় দুই হাজার টাকার মূল্যের পুস্তকের অর্ডার লইয়া গেল। কয়েকটা প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে স্কুলের প্রধান এবং অপরাপর শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। চতুর্দিকে নানাবিধ কর্মপরতার আলোড়ন জাগিয়া উঠিল।

গ্রামের কয়েকজন মহিলাকে লইয়া একটা কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত করিয়া যূথিকা প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়া দিল। সে স্বয়ং পালকি চড়িয়া মনসাগাছার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসিল, এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে কার্য-নির্বাহক সমিতির অপর সদস্যদিগকে পাঠাইতে লাগিল। ফলে বালিকারা উৎফুল্ল হইল, জননীরা সন্তুষ্ট হইল, বৃদ্ধারা পরিহাস করিল, এবং অভিভাবকেরা ব্যয়বৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইল।

ছুটির শেষে কলিকাতায় ফিরিবার দিন নিশাকর বলিল, "খুব খুশি হয়ে চললাম বউদি, চমৎকার কাজ এগোচ্ছে। ২৪শে ডিসেম্বর ফিরে এসেও যদি এই রকম খুশি হই, তা হলে চাই-কি, সেক্রেটারির পদ থেকে তোমাকে বরখাস্ত করে জয়েণ্ট ডিরেক্টারের পদে বসিয়ে দিতেও পারি।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া যূথিকা হাসিতে লাগিল।

দিবাকর বলিল, "তবু ভালো, জয়েণ্ট ডিরেক্টারের পদে! তা নইলে যূথিকাকে ডিরেক্টারের পদে বসিয়ে আমাকে ডিগ্রেড করে সেক্রেটারির পদে বসালেই গিয়েছিলুম আর কি! পাথরের ঠাকুর হয়ে তবু এক রকম চলে যাচ্ছে। পুরুত ঠাকুর হলে আর রক্ষে ছিল না!"

নিশাকর বলিল, "এ কথা আমি স্বীকার করি নে দাদা। ডিরেক্টরের কাজ তুমি যে রকম চালাচ্ছ তাতে তোমাকে—"

নিশাকরের কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল, "তাতে আমাকে শ্রীযুক্ত তথাস্তু বলাও চলে। যা কিছু তোরা দুজনেই তো করিস, আমি শুধু করি তথাস্তু—এই বই তো নয়।"

যূথিকা বলিল, "কিন্তু আমাদের সঙ্গে মতের অমিল না হলে তথাস্তু করা ছাড়া আর উপায় কী আছে বল?"

দিবাকর বলিল, "তোমাদের সঙ্গে মতের মিল না করেও তো উপায় নেই; না করলেই যে ভুল করব। কিন্তু সে কথা যাক।" নিশাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কলকাতা গিয়ে সভাপতি স্থির করে ফেলবি, নিশা। নামজাদা লোক সভাপতি হলে সকলের উৎসাহ বাড়বে।"

যোগ্যতা অনুসারে ক্রমিক সংখ্যা দিয়া কয়েকজন সম্ভাবিত সভাপতির নামের তালিকা করা হইয়াছিল। নিশাকব বলিল, "বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ লোককে সভাপতি করব, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো। আমাদের লিস্টের এক দুই তিনের নিচে যাব না।"

"সুনীথদার সাহায্য নিস্।"

"নিশ্চয় নোব।"

কিন্তু সুনীথনাথের সাহায্য লইয়াও এক দুই তিনের মধ্যে তো দূরের কথা, লিস্টের কোনও সভাপতিই স্থির করা গেল না। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নিশাকর লিখিল, "বড়দিনের সময়ে কলকাতায় আর কলকাতার বাইরে এত সভাসমিতি যে, পছন্দমত কোনও সভাপতিই পাওয়া গেল না। যা দু-একজন পাওয়া যেতে পারে তাদের চেয়ে সুনীথদাদা ভালো।"

যূথিকাকে নিশাকরের চিঠি দেখাইয়া দিবাকর বলিল, "কিন্তু সুনীথদাদা যত উপযুক্তই হোক তবু গেঁয়ো যোগী, লোকে যথেষ্ট উৎসাহ পাবে না। তা হলে কি ঈস্টার পর্যন্ত পেছিয়ে দেওয়া যাবে?"

মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না না, অত পেছিয়ে দিলে লোকে আরও বেশি

উৎসাহ হারাবে। তুমি রাজসাহী গিয়ে দেখে শুনে একজন সভাপতি স্থির করে এসো। কলকাতার প্রত্যাশায় এখানকার স্থানীয় লোককে এত উপেক্ষা করবার কোনও দরকার নেই।"

শেষ পর্যন্ত সেই পরামর্শই স্থির হইল। পরদিনই রাজসাহী রওনা হইয়া দিন তিনেকের মধ্যে সভাপতি স্থির করিয়া দিবাকর প্রসন্নচিত্তে মনসাগাছায় ফিরিয়া আসিল।

দিবাকরের মুখে সভাপতির নাম শুনিয়া সকৌতুকে যূথিকা বলিল, "সি. ফরেস্টার? ফরেস্টার কে?"

দিবাকর বলিল, "রাজসাহীর নতুন কালেক্টার। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে ফরেস্টারকে খুশি রাখবার জন্যে আমাদের স্টেটের সিনিয়র উকিল ভবতোষ মিত্র ফরেস্টারের দিকেই ঝোঁক দিলেন। কিন্তু তা হোক, দিব্য ভদ্রলোক ফরেস্টার, আর সত্যিকার পণ্ডিত মানুষ। কেমব্রিজের এম. এ.—স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে খুব উৎসাহী। কেন, তোমার ভালো লাগছে না যূথিকা?"

যূথিকা বলিল, "লাগবে না কেন, ভালোই লাগছে। তবে ইংরেজ সভাপতি, সভার অধিকাংশ কাজ ইংরেজীতে করতে হবে, এই যা।"

দিবাকর বলিল,, "তাতে আর ক্ষতি কী? আমাদের পক্ষে ভবতোষবাবু থাকবেন, সুনীথদা থাকবে, তুমি আছ,—কাজের কোন অসুবিধা হবে না। স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন মিসেস ফরেস্টার। যেমন দেখতে সুন্দরী, তেমনই অমায়িক মানুষ। ভবতোষবাবুর মুখে তোমার কথা শুনে আমাকে কত কন্‌গ্রাচুলেট করলেন। সত্যি যূথিকা তুমি যে আমার জীবনের মধ্যে কতখানি গৌরব এনেছ তা সব সময়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারি নে।" বলিয়া পরম পরিতোষের সহিত দিবাকর যূথিকার স্কন্ধে তাহার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিল।

ইতস্তত চাহিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর হস্ত নামাইয়া দিয়া যূথিকা স্মিতমুখে বলিল, "যখন বুঝতে পার না, তখনই ঠিক বোঝ। একান্তই যদি কোন গৌরব এনে থাকি তো অগৌরবের জিনিসকে স্বীকার করে নেবার গৌরবই এনেছি। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক, ভোলা তোমার চা আর খাবারের উয্‌যুগ করছে, গোসলখানা থেকে মুখ-হাত পা ধুয়ে এস।"

সাদরে যূথিকার নাসিকাগ্র ঈষৎ নাড়িয়া দিয়া হাসিমুখে দিবাকর প্রস্থান করিল।

সতের

নানাপ্রকার কাজকর্ম ও উদ্যোগ আয়োজনের মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে উদ্বোধনের দিন আসিয়া পড়িল।

২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে কলিকাতা হইতে মনসাগাছায় পৌঁছিয়া নিশাকর পরদিন সকালে দিবাকরের সহিত চতুর্দিকের বিধি-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে খুশি হইয়া উঠিল। সুবৃহৎ অট্টালিকা পরিপূর্ণ সংস্কারের দ্বারা নূতন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বোক্ত একতলা গৃহটিকে ছাঁটিয়া-কাটিয়া কমাইয়া বাড়াইয়া এমন করা হইয়াছে যে, দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। তাহার শীর্ষদেশের মধ্যস্থলে নবনির্মিত ক্ষেত্রের উপর মসলার বলিষ্ঠ অক্ষরে খচিত—যোগমায়া-বালিকা-বিদ্যালয়। ঘরে ঘরে চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ, ডেস্ক, ব্ল্যাকবোর্ড। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ঘরে তিনটি বৃহৎ আলমারি ভরিয়া পুস্তকাবলী। বিদ্যালয়-গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উদ্বোধন-সভার বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে। তাহার প্রবেশ-পথ হইতে জমিদার গৃহের প্রধান গেট পর্যন্ত সুরকি বিছানো নূতন পথ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই লৌহ-গেটকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া উঠিতেছে সুবৃহৎ তোরণ, তাহার মধ্যে রোশন চৌকির মঞ্চ।

মনসাগাছার জমিদারের বড় বড় ক্রিয়া-কর্মে কলিকাতা হইতে যে ডেকোরেটাররা চিরকাল আসিয়া কাজ করে, তাহারাই মণ্ডপ তোরণ প্রভৃতি নির্মাণের এবং সাজাইবার ঠিকা লইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতা, রাজসাহী, দিনাজপুর এবং অন্যান্য স্থান হইতে যে-সকল মান্য অতিথি আসিবেন তাঁহাদের পরিচর্যা এবং পানাহারের ভারও ইহাদের উপর।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে দেখাইতে এক সময় দিবাকর বলিল, "এই মাস দুই-আড়াই তোর বউদিদি অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। রাত্রে ঘুম নেই, দিনে বিশ্রাম নেই; স্কুলের কাজ নিয়ে একেবারে তন্ময়। এ ছাড়া যেন আর কোনও জিনিসেরই আকাঙ্ক্ষা নেই। পরীক্ষা করে দেখেছি, অলঙ্কার চায় না, কাপড়-চোপড় চায় না, শৌখিন জিনিসপত্র চায় না; কিন্তু যখনই স্কুলের বিষয়ে কোন কিছু বলেছি, নিঃশব্দে শুধু হেসেছে। তাই, কোনরকমে মনের সাধটা জানতে পারলেই সেটা ভালোকরে মেটাতে গিয়ে খরচ পত্র একটু বেশি হয়ে গিয়েছে।"

মনে মনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া নিশাকর বলিল, "বেশ করেছ দাদা—যে ফুলে যে দেবতা খুশি হন সেই ফুল দিয়ে সেই দেবতাকে পূজো করতে হয়। দেখ না, দুর্গাপূজোর সময়ে পদ্মফুলের জন্য পিসিমা কী রকম ব্যস্ত হন!"

দিবাকর বলিল, "তা সত্যি, লেখাপড়াটা ভালো করে করেছে বলে লেখাপড়া ছাড়া আর বড় কিছু বোঝে না। গ্রন্থকীট বলে এক রকম জীবের কথা এতদিন

শুনেই এসেছিলাম, এবার স্বচক্ষে দেখলাম। কলকাতা থেকে বইয়ের এক-একটা পার্সেল আসে, আর দুই তিন ধরে তোর বউদিদির কোনও জ্ঞান থাকে না। তখন অগত্যা আমি বন্দুক-টন্দুক বার করে সাফ করতে বসি। যূথিকা—উঁ, যূথিকা—অ্যাঁ, যূথিকা—বলো করে আর কাঁহাতক চালানো যায় বল্ ?" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিস্ময়ে নিশাকর বলিল, "সে কি দাদা? যূথিকা—উঁ, যূথিক—অ্যাঁ, যূথিকা—বলো, আবার কী ?"

দিবাকর বলিল, "সে আর বলিস কেন। একদিন একটা পার্সেল খোলা হয়েছে। ঘণ্টাখানেক পরে কী একটা কথা বলতে এসে দেখি, একটা মোটা বাঁধানো বই কোলের উপর খুলে তোর বউদিদি তন্ময় হয়ে পড়ছে। পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলাম—'যূথিকা', উত্তর দিলে—'উঁ',—কিন্তু ঐ পর্যন্তই আর কোনও কথা নেই। আবার ডাকলাম, 'যূথিকা',, এবার উত্তর দিলে অ্যাঁ—কিন্তু এবারেও ঐ একটি মাত্র অক্ষর, ঘাড় নিচু করে পড়তে লাগল। তখন বেশ-একটু জোরে ডাক দিলাম—যূথিকা।' এবার একটু অপ্রতিভ হয়ে 'বলো' বলে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, মুখ আমার দিকে থাকলেও মন তখনও বাইরের দিকেই আছে। এখন এ রকম অবস্থায় বন্দুক খুলে সাফ করতে বসা ছাড়া আর কী করা যায় বল ?" বলিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

স্মিতমুখে নিশাকর বলিল, "তা সত্যি।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে পুনরায় বিদ্যালয়ের সোপানের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল। দিবাকর বলিল, "এতক্ষণে তোর বউদিদি নিশ্চয় এসে বইয়ের ক্যাটালগ করার কাজে লেগেছে।"

নিশাকর বলিল, "চলো না দাদা, পা টিপে টিপে গিয়ে দেখা যাক কোন্ কাজে বউদিদি আপাতত ব্যস্ত আছেন,—ক্যাটালগ করার কাজে, না, বই পড়ার কাজে।"

সন্তর্পণে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কক্ষে পদার্পণ করিয়া উভয়েই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া চেয়ার হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "কী ব্যাপার। এত হাসি কিসের ঠাকুরপো।"

নিশাকর হাসিতে হাসিতে বলিল, যূথিকা—উঁ, যূথিকা—অ্যাঁ, যূথিকা—বলো'র চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া আরক্ত-স্মিতমুখে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, "বেশ। এর মধ্যে সে কথাও হয়ে গেছে ?"

কোন কথা না বলিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

নিশাকর বলিল, "শুধু সে কথাও নয়, এমন অনেক কথাই হয়েছে। তোমার কীর্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমার কথা বাদ দেবার উপায় আছে বউদি ?

প্রতিবাদের সুরে যূথিকা বলিল না না ঠাকুরপো, এরই মধ্যে অত বড় বড় কথা বলে ভয় দেখিয়ো না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত যদি কীর্তিই দাঁড়ায়, তা হ'লে সে কীর্তি তোমাদের দু ভাইয়েরই হবে। আমি তো একজন সামান্য কর্মী মাত্র।"

নিশাকর বলিল, "কিন্তু ঐ সামান্য কর্মীর মুখের দিকে তাকিয়েই তো দু-ভাই যা কিছু প্রেরণা পেয়েছি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

নিশাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার সহসা মনে পড়িয়া গেল, সুনীথনাথের অভিভাষণের একটা অংশ, যেখানে সুনীথ তাহার বিষয়ে ঠিক এই কথা না লিখিলেও, এই ধরনের কথাই লিখিয়াছিল। দিবাকরদের অনুরোধে অভ্যর্থনা-পক্ষের সভাপতি হইয়া সুনীথ তাহার অভিভাষণ লিখিয়া দিবাকর ও যূথিকার দেখিবার জন্য মনসাগাছায় প্রুফ পাঠাইয়াছিল। অভিভাষণে তাহার প্রতি প্রযুক্ত প্রশস্তির অংশটুকু লাল পেন্সিল দ্বারা চিহ্নিত করিয়া যাহাতে সুনীথ উক্ত অংশ পরিবর্জন করে, সেজন্য বিশেষভাবে অনুরোধপূর্বক যূথিকা নিশাকরকে পত্র লিখিয়াছিল।

ব্যস্ত হইয়া যূথিকা বলিল, "শোন ঠাকুরপো, প্রুফে যে জায়গাটা আমি লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিয়েছিলাম, সে জায়গাটা সুনীথদাদা বাদ দিয়েছেন তো?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিবার ভান করিয়া নিশাকর বলিল, "যতদূর মনে পড়ছে, তার একটি কথাও বাদ দেন নি; উপরন্তু, তোমার চিঠি পড়ে অতিশয় খুশি হয়ে আরও দু-চার লাইন যোগ করে দিলেন। সেই জন্যেই বোধ হয় অ্যাড্রেস ছাপাতে দেরি পড়ে গেল বলে আমার সঙ্গে আসতে পারলেন না।"

ব্যগ্রকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "তুমি আমার সে চিঠি সুনীথদাদাকে দেখিয়েছিলে?"

"সগর্বে। অমন চমৎকার একখানা চিঠি দেখাবার সৌভাগ্য বাংলা দেশে কজন দেওরের ভাগ্যে ঘটে বল দেখি? আমি বাজি রেখে বলতে পারি, শতকরা পাঁচ জনেরও নয়।"

হতাশামিশ্রিত বিহ্বল কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "নাঃ, তোমরা দেখছি সেদিন সভায় আমার মুখ দেখাবার পথ রাখবে না!"

দিবাকর বলিল, "চল যূথিকা, সেদিন সকালবেলা তোমাতে আমাতে কোথাও পালিয়ে যাই,—দুজনেই নিজের নিজের মুখ লুকোবার উদ্দেশ্যে।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বাহিরে চুড়ির ঠুনঠুন শব্দ শুনিয়া বারান্দায় উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিয়া নিশাকর বলিল, "বউদি, আনন্দ তোমাকে কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে।"

আনন্দ যূথিকার খাস পরিচারিকা।

যূথিকা বলিল, "বলবে না কিছু। ও এসেছে আলমারিতে বই গুছিয়ে রাখবার কাজে আমাকে সাহায্য করতে।"

"বুঝছি। আমরা তা হ'লে এখন সরে পড়ি?"

স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "আচ্ছা।"

উচ্ছ্বাসের সহিত নিশাকর বলিল, "কী আশ্চর্য! একেবারে সরাসরি বলে দিলে 'আচ্ছা'? ভদ্রতার খাতিরে আর পাঁচ মিনিটও সবুর সইল না? কী দারুণ কাজের লোক হয়েছ তুমি বউদি!"

সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, "বউদি নয়, সেক্রেটারি। ১১ই পৌষ পর্যন্ত বউদিদিকে দাবিয়ে রেখে এই রকম সংক্ষিপ্ত ভদ্রতা করবে তোমাদের সেক্রেটারি। তারপর ১২ই পৌষ থেকে, যখন সেক্রেটারি পিছনে সরে দাঁড়াবে, তখন পাঁচ দিন সবুরও সইবে!"

"আচ্ছা, আপাতত তা হ'লে মাননীয়া সেক্রেটারি মহাশয়াকে নমস্কার।" বলিয়া স্মিতমুখে নিশাকর দিবাকরের সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আঠার

উৎসবের পূর্বদিন সময়ে সুনীথনাথ কলিকাতা হইতে মনসাগাছায় পৌঁছিল।

প্রথম অভ্যর্থনা তাহাকে দিল যূথিকা। নত হইয়া প্রণাম করিয়া সলজ্জ স্মিতমুখে বলিল, "আসুন দাদা আসুন। কিন্তু এত দেরি করে আসতে হয়?"

শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি," বলিয়া সহাস্যমুখে সে কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া নিশাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুনীথ বলিল, "ইনি যে তোর বউদিদি সে কথা বোধ হয় জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই নিশা?"

নিশাকর বলিল, "না নিশ্চয়ই নেই। ইনিই বউদিদি।"

"অত বেশি প্রশংসা ক'রে ভয় দেখিয়েছিলি ভাই—চোখে দেখে সে ভয় কাটল।"

সকৌতুকে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের ভয়, সুনীথদা?"

সুনীথ বলিল, "ডিস্যাপয়েন্টমেন্টের,—নৈরাশ্যের। কোনও কিছুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলেই ভয় হয়, সাক্ষাৎ পরিচয়ে হয়তো নৈরাশ্যের আঘাত ভোগ করতে হবে। জানিস দিবা, আগ্রায় তাজমহল দেখেও প্রথমটা আমি সেই আঘাত অনুভব করেছিলাম, যদিও পরে ক্রমশ তা কেটে গিয়েছিল।"

সুনীথের কথা শুনিয়া মনে মনে অতিশয় খুশি হইয়া সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, "বউদিদিকে দেখে কী মনে হলো শুনি?"

"কী মনে হলো?" যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এক মুহূর্ত নীরবে

অবস্থানের পর সুনীথ বলিল, "মনে হলো যেমন আধেয়, তেমনি আধার ; ঠিক যেন গোলাপ ফুলের মধ্যে জুঁই ফুলের গন্ধ।"

যূথিকা বলিল, "দোহাই দাদা, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলে শুধু আপনারই ভয় হয় না, আমারও হয়। নওগাঁ থেকে মনসাগাছা তিন ক্রোশ পথ আসতে কী রকম কষ্ট হয় তা সকলেরই জানা আছে। সুতরাং এ সব বাজে কথা ছেড়ে একেবারে সোজা গোসলখানায় গিয়ে ঢুকুন,—সেখানে আপনার জন্যে গরম জল, ধুতি, তোয়ালে, সাবান, মাজন—সব তৈরি আছে। আমি চললাম আপনাদের চা পানের ব্যবস্থা দেখতে। চা খেতে খেতে আবার কথাবার্তা হবে, কিন্তু দোহাই আপনার, দয়া করে তখন আর এ ধরনের বাজে কথা বলবেন না।"

কিন্তু আধ ঘণ্টাটাক পরে চায়ের আসরে সুনীথনাথ কথায় কথায় এই ধরনের কথাই পুনরায় উত্থাপিত করিল। দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি তোকে গভীরভাবে অভিনন্দিত করছি, দিবা। একাধারে এই লক্ষ্মী সরস্বতীর সংযোগ কী করে লাভ করলি তখন থেকে তাই শুধু ভাবছি।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "সৌভাগ্যের জোরে সুনীথদা—আর কোনও রকমে নয়। ঠিক যেমন, দুর্ভাগ্যের জোরে যূথিকা আমাকে লাভ করেছে। সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য—দুই খুব জোরালো জিনিস।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথ বলিল, "বাজে কথা বলিস নে দিবা। মনে নেই, এবারকার চায়ের বৈঠকে বাজে কথা বলতে নিষেধ আছে।" তাহার পর যূথিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে যদিও-বা আমি যৎসামান্য বাজে কথা বলে থাকি, আপনার স্বামী তার তুলনায় অনেক বেশি বলেছেন। সুতরাং সামলান আপনার স্বামীকে।"

যূথিকা কোনও কথা বলিবার পূর্বে বিস্ময়চকিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "আপনার স্বামী—কী বলছ সুনীথদা।"

ততোধিক বিস্মিত কণ্ঠে সুনীথ বলিল, "তবে কার স্বামী বলব ?"

সুনীথের কথা শুনিয়া যূথিকা ও নিশাকর একযোগে হাসিয়া উঠিল।

দিবাকর বলিল, "আহা-হা। সে কথা নয়। 'তোমার স্বামী' বলবে। আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে যূথিকাকে 'আপনি' বললে মনে করব, তুমি একটা অঙ্ক কষেছ।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথনাথ বলিল, "সর্বনাশ। কিসের অঙ্ক রে ?"

দিবাকর বলিল, "ত্রৈরাশিকের। ম্যাট্রিক ফেলের সম্বোধন যদি 'তুই' হয়, তা হ'লে এম. এ. পাসের সম্বোধন কী হবে ? উত্তর—'আপনি'। এই অঙ্ক। ম্যাট্রিকের অঙ্কে ফেল করতাম বলে মনে ক'রো না—এ অঙ্কেও ফেল করব।"

সুনীথনাথ বলিল, "না, এ অঙ্কেও তুই ফেল করেছিস।"

এবার কথা কহিল যূথিকা। সুনীথনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,

"আমারও একটা অঙ্কের কথা বলবার আছে দাদা। ওঁকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে আমাকে 'আপনি' বললে, আমিও মনে করব, আপনি একটা অঙ্ক কষেছেন।"

গভীর কৌতূহলের সুরে সুনীথ বলিল, "সত্যি না-কি? সে আবার কিসের অঙ্ক কষলাম শুনি?"

যূথিকা বলিল, "ঐ ত্রৈরাশিকেরই। গভীর স্নেহের সম্বোধন যদি 'তুই' হয়, তা হ'লে 'আপনি' কী রকম স্নেহের সম্বোধন হবে? উত্তর—'অল্প স্নেহের'। এই অঙ্ক।"

যূথিকার কথা শুনিয়া সুনীথ দিবাকর এবং নিশাকর তিনজনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

নিশাকর বলিল, "নির্ভুল অঙ্ক। একেবারে নির্ভুল।"

সুনীথ বলিল, "দেখা যাচ্ছে, শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই নয়, যুক্তি তর্কের শাস্ত্রেও তোমার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। সুতরাং আর তোমাকে 'তুমি' না বলবার পথ খুঁজে পাচ্ছি নে যূথিকা।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আরও আগেই সে পথ হারানো উচিত ছিল।"

চা পান করিতে করিতে এক সময়ে সুনীথ জিজ্ঞাসা করিল, "শিক্ষয়িত্রীদের, তোমাদের পছন্দ হয়েছে তো যূথিকা?"

যূথিকা বলিল, "আপনি বাছাই করে দিয়েছেন, পছন্দ হবে না আবার? প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে তো খুবই উপযুক্ত মনে হলো, অন্য দুটিও বেশ ভালো।"

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের ফলে যে-সকল আবেদন আসিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে দেখিয়া শুনিয়া তিনজনকে সুনীথ মনোনীত করিয়াছিল।

সুনীথ জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে তোমরা ক'জন নিযুক্ত করলে?"

যূথিকা বলিল, "তিনজন। দুজন রাজসাহী থেকে, আর দিনাজপুর থেকে একজন। ছাত্রী তো সবে চল্লিশটি; উপস্থিত ছজন শিক্ষয়িত্রীতেই চলে যাবে।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

সুনীথ বলিল, "দুশো ছাত্রীর পক্ষেও ছ'জন শিক্ষয়িত্রী যথেষ্ট।"

কথায় কথায় চা-পানের সুপ্রচুর পর্ব শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রসন্নমনে দিবাকর বলিল, "কথা আছে, চা খাওয়ার পর তোমার সম্মানে আজ একটু ঐকতানবাদন হবে সুনীথদা। যূথিকা বাজাবে এসরাজ, আর আমি সেতার।"

"আর নিশা কিছু বাজাবে না?"

সুনীথের কথায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। দিবাকর বলিল, "নিশার বাজাতে হলে একমাত্র খাতা-পেন্সিলই বাজাতে হয়; কারণ, তা ছাড়া তো আর কোনও জিনিসের চর্চা ও করে নি।"

স্মিতমুখে নিশাকর বলিল, "পরীক্ষার পর এ দুর্নামের শেষ করব বউদিদির কাছে এসরাজ শিখে।"

নিশাকরের মুখে সুনীথনাথ সংগীত বিষয়ে যূথিকার পারদর্শিতার কথা শুনিয়াছিল। নিজে সংগীতজ্ঞ না হইলেও চিরদিন সে সংগীতের অনুরাগী শ্রোতা। দিবাকরের প্রস্তাবে অতিশয় প্রীত হইয়া বলিল, "তোরা দুজনে আমাকে সেতার আর এসরাজ শোনাবি—এর চেয়ে আনন্দ আর সম্মানের ব্যবস্থা আমার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না দিবা। কিন্তু তার আগে সামান্য একটু কাজ সেরে নিই।"

সকৌতূহলে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কী কাজ সুনীথদা?"

"এমন কিছু নয়।—" বলিয়া সুনীথ কলিকাতা হইতে তাহার সহিত নন্দ নামে যে পরিচারক আসিয়াছিল, তাহার দ্বারা পুরু ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা লম্বা আকারের প্যাকেট আনাইল। তাহার পর ফিতা খুলিয়া কাগজ ছিঁড়িয়া বাহির করিল একটা সুদৃশ্য মূল্যবান স্টীল-কেস, তাহার মধ্যস্থলে উজ্জ্বল পালিশ করা নিকেলের মোটা মোটা ইংরেজী অক্ষরে লেখা—যূথিকা ব্যানার্জি।

সবিস্ময়ে যূথিকা বলিল, "এ কী ব্যাপার দাদা?"

সুনীথ বলিল, "অতি সামান্য ব্যাপার। এর মধ্যে কিছু ফল এনেছি তোমার জন্যে। কিন্তু আমার বাগানে যে ফল ফলে, সেই ফলই এনেছি। তোমার বাগানে যে ফল ফলে, সে ফল আনি নি। এ তোমার মিষ্টি লাগবে কি-না জানি নে।"

শুনিয়া ফলের স্বরূপ জানিবার জন্যে যূথিকা হইতে নিশাকর পর্যন্ত কাহারও কৌতূহলের অবধি রহিল না।

দিবাকর বলিল, "ও ফলে আমি যদি ভাগ বসাই, তা হলে আমারও মিষ্টি লাগবে তো সুনীথদা?"

স্মিতমুখে সুনীথ বলিল, "কী করে জানব ভাই? এক আধটা চেখে দেখিস, তা হ'লেই বুঝতে পারবি।"

মানিব্যাগ হইতে রিং-এ গাঁথা এক জোড়া চাবি বাহির করিয়া সুনীথ যূথিকার হস্তে প্রদান করিল।

চাবি লইয়া যূথিকা বলিল, "খুলব?"

সুনীথ বলিল, "নিশ্চয় খুলবে।"

বাক্স খুলিয়া বাহির হইল ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রের এক সেট বাছাই করা পুস্তক। মূল্যবান লাল মরক্কো চামড়ায় প্রত্যেকটিই বাঁধানো এবং প্রত্যেকটিতে স্বর্ণাক্ষরে যূথিকার নাম মুদ্রিত।

আনন্দোৎফুল্ল মুখে একখানা বই হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে যূথিকা বলিল, "ফলই বটে! ঠিক যেন লাল টুকটুকে বিলিতী আপেল।

দিবাকরের হাতেও একখানা বই ছিল, সে বলিল, "দেখতে বিলিতী আপেল

হলেও কাজে কিন্তু আমার পক্ষে কাবলী আখরোট। সাধ্য কি যে দাঁত বসাই!" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিবাকরের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "আমার পক্ষেও তাই।" তাহার পর সুনীথের দিকে চাহিয়া বলিল, "গেট তো খুলে দিলেন দাদা, কিন্তু বাগানে পা দিতে ভয় পাচ্ছি।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুনীত জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের ভয়?"

যূথিকা বলিল, "অনধিকার প্রবেশের।"

মাথা নাড়িয়া সুনীথ বলিল, "না না, অনধিকার প্রবেশের তোমার কোনও ভয় নেই,—যেখানে তুমি পদার্পণ করবে, দেখবে সেখানেই তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

নিশাকর বলিল, "কিন্তু দোহাই বউদি, উপস্থিত দিন দুই যেন বেশি করে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ো না। ও-বাগানে একবার তোমাকে হারালে কালকের কাজে সমূহ ক্ষতি হবে।"

সুনীথ বলিল, "সর্বনাশ! সে ভয় যখন আছে, তখন আপাতত আমি বাগানের গেট বন্ধ করে দিই, শেষকালে নিশাকর না বলে—বাগানের ফল অতীব কুফল।" বলিয়া যে কয়খানা বই হাতে হাতে অবস্থান করিতেছিল এবং টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল কেসের মধ্যে ভরিয়া ফেলিয়া চাবি লাগাইয়া রিংটা যূথিকার হস্তে দিয়া বলিল, "এবার আরম্ভ কর তোমার ঐকতানবাদন। কে সেতার আর কে এসরাজ?"

দিবাকরের আদেশে একজন পরিচারক সেতার ও এসরাজ নিকটে রাখিয়া গিয়াছিল; সেতারটা তুলিয়া দিবাকর বলিল, "আজ আমি সেতার।"

যূথিকা এসরাজ তুলিয়া লইল।

সুনীথ বলিল, "বেশ। কী রাগিণী বাজাবে?"

দিবাকর বলিল, "কেদারা।"

"উত্তম!" বলিয়া সুনীথ পার্শ্ববর্তী ফরাসে উঠিয়া গিয়া একটা তাকিয়া টানিয়া জুৎ করিয়া বসিল।

পূর্ব হইতে সুর বাঁধাই ছিল; অল্প-স্বল্প মিলাইয়া লইয়া উভয়ে বাজাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে যূথিকা কিছুক্ষণ কেদারা রাগের আলাপ করিল; তাহার পর করিল দিবাকর; তৎপরে পুনরায় যূথিকা; তৎপরে দিবাকর। এইরূপে কয়েকবার পর্যায়ক্রমে আলাপের পর সহসা এক সময়ে একটা বিশেষ ইঙ্গিতে উভয়ের চক্ষু মুহূর্তের জন্য মিলিত হইল এবং পর-মুহূর্তেই সমস্বরে আরম্ভ হইয়া গেল কেদারা রাগের গৎ।

মুগ্ধচিত্তে তন্ময় হইয়া সুনীথ বাজনা শুনিতেছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া বাজিয়া বাদ্য শেষ হইলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া অবশেষে সে বলিল, "বেশি আর কী বলব ভাই, আশীর্বাদ করি তোমাদের দুজনের জীবনও যেন এই দুটি বাজনার

মতো এমনই একসুরে এই রকম মাধুর্যের সঙ্গে চিরদিন একত্রে বাজে।"

প্রসন্নমুখে দিবাকর বলিল, "তোমার এ আশীর্বাদের চেয়ে আর কোন আশীর্বাদই আমাদের পক্ষে বড় হতে পারে না সুনীথদা, কারণ এই দুটি বাজনাই প্রথম কারণ হয়ে আমাদের দুজনের মিলন ঘটিয়েছিল। তা নইলে, দুজনের মধ্যে এতবড় একটা বাধা ছিল যে, সাধারণভাবে অগ্রসর হলে আমাদের দুজনের বিয়ে বোধ হয় কিছুতেই সম্ভব হতো না।"

যূথিকার চক্ষে মৃদু ভৎর্সনায় কুঞ্চিত দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া দিবাকর হাসিয়া বলিল, "এ কথায় রাগ করছ কেন যূথিকা? এ কথা তো বাজে কথা নয়।"

উত্তর দিলে সুনীথনাথ; বলিল, "না, এ কথাও বাজে। নিশার মুখে আমি সব শুনেছি। জানিস তো কলম বাঁধতে হ'লে দুটো কলমের গাছে বাঁধা হয় না,—কলমের গাছে আর আঁটির গাছে বাঁধতে হয়। তোদের মিলনের ফলও কলম বাঁধার মতোই শুভ হবে।"

দিবাকর বলিল, 'তা হলে মনে রেখো যূথিকা, একজন মস্ত বড় পণ্ডিত মানুষের মতে তুমি হচ্ছ কলমের গাছ, আর আমি হচ্ছি আঁটির।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি বাড়িয়া গিয়াছিল, আহারের জন্য প্রসন্নময়ীর নিকট হইতে তলব আসিয়াছিল, সুতরাং সেদিনের মতো নৈশ বৈঠক সেইখানেই শেষ হইল।

উনিশ

পরদিন প্রত্যুষে সানাইয়ের সুমিষ্ট রবে প্রখর শীতের সুখশয্যায় সুপ্ত গ্রামবাসী সানন্দে জাগ্রত হইল। উৎসবের দিন, আনন্দের দিন। স্কুল-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম, ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে ভোজনের জন্য মধ্যাহ্নে জমিদার-বাড়িতে নিমন্ত্রিত; সুতরাং আজ অবকাশেরও দিন।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নানাদি সারিয়া যূথিকা চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি পরিয়া এবং একটা লাল রঙের মূল্যবান শাল গায়ে দিয়া চতুর্দিকের কর্ম কোলাহলের মধ্যে তাহার কমনীয় কান্তি বিকীর্ণ করিতে করিতে মূর্তিমতী উৎসব লক্ষ্মীর মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সুবৃহৎ পাকশালায় আট-দশটা বৃহৎ উনান জ্বালিয়া শেষ রাত্র হইতে রন্ধন আরম্ভ হইয়াছে। সেই রন্ধনের আয়োজন পূর্বদিবসের মধ্যাহ্ন হইতে শুরু হইয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চলিয়াছে। সভামণ্ডপ সাজানোর কর্ম সমাপ্তপ্রায়; সদ্যচয়িত তাজা পুষ্পপল্লবের দ্বারা যেটুকু হইবার শুধু সেইটুকুই বাকি। মণ্ডপের ভিতরে

একদিকে বসিয়া আট-দশজন মালী অজস্র উপকরণ লইয়া তোড়া এবং মাল্য রচনায় ব্যস্ত। ভারীরা দলে দলে চতুর্দিকে জল সরবরাহ করিতেছে। পরিচারকগণ স্থানে স্থানে অভ্যাগতদের জন্য চা এবং খাবার তৈয়ার করিতে নিযুক্ত। মিস্টার এবং মিসেস্ ফরেস্টার এবং তাঁহাদের সহিত আরও যে দুই-একজন ইংরেজ অতিথির আসিবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের পানাহারের ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা হইতে দুইজন সুদক্ষ খানসামা আসিয়াছে; কাছারি বাড়ির একটা চওড়া বারান্দার কিয়দংশ ঘিরিয়া তাহারা রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যূথিকা সন্তুষ্টচিত্তে সকল উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সভায় গীত হইবার জন্য সুর তালের যোগে সে দুইটি গান রচিত করিয়াছিল, কয়েকটি বালিকাকে সেই গান দুইটি শিখাইবার ভার পড়িয়াছিল স্কুলের সদ্য নিযুক্তা প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ করুণা মিত্রের উপর। স্কুল গৃহের একটা ঘরে দোর জানালা বন্ধ করিয়া চলিতেছিল তাহার শেষ মহড়া। এক-আধ স্থানে সামান্য যাহা ভুল-ভ্রান্তি ছিল তাহা সংশোধিত করিয়া দিয়া প্রসন্ন মনে যূথিকা সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছে এমন সময়ে দেখা হইল সুনীথ এবং দিবাকরের সহিত।

সহাস্য মুখে সুনীথ বলিল, "সমস্ত আয়োজন এমন সুচারুভাবে এগিয়ে চলেছে যে, মনে হচ্ছে সবটা যেন একটা একসূত্রে বাঁধা যন্ত্র।"

খুশি হইয়া যূথিকা বলিল, "ঠিক চলেছে ?"

"একেবারে ঠিক। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার একটু অভিযোগ আছে।"

কৌতূহলী হইয়া যূথিকা বলিল, "কোন বিষয়ে দাদা ?"

পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া সুনীথ বলিল, "একটু আগে নিশা আজকের সভার প্রোগ্রামের এই কপিটা আমাকে দিয়েছে। এতে স্বস্তিবাচকরূপে বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থকে দেখছি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে নিজেকে দেখছি, মূল সভাপতিরূপে মিস্টার ফরেস্টারকে দেখছি, স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটিকারূপে মিসেস ফরেস্টারকে দেখছি, প্রবন্ধপাঠিকারূপে মিস মিত্রকে দেখছি, আলোচনাকারীরূপে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে দেখছি, এমন কি ধন্যবাদদাতারূপে ভবতোষ মিত্রকেও দেখছি। কিন্তু তোমাদের তিনজনকে কোনরূপেই দেখছি নে কেন ?"

এ কথার উত্তর দিল দিবাকর, বলিল, "দেখবে বইকি, আমাদের তিনজনকে কাণ্ড, শাখা আর ফুলরূপে দেখবে; আর তোমরা দেখা দেবে ফলরূপে। পূর্বে আলোচনা হয়ে এইরকম স্থির হয়েছে।"

সবিস্ময়ে সুনীথ বলিল, "তার মানে ?"

"তার মানে, আজকের সভা হবে একটি গাছের মতো, যার কাণ্ডরূপে আমি বিরাজ করব নির্বাক নিশ্চল হয়ে; শাখারূপে নিশা এদিক-ওদিক অল্পস্বল্প নড়বে চড়বে; ফুলরূপে যূথিকা শোভা বর্ধন করে ফুটে থাকবে; আর ফলরূপে তোমরা কয়েকজন বাক্যরস বিতরণে সকলকে তৃপ্ত করবে।" বলিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

সুনীথ বলিল, "এই পরামর্শ? রসো না, সভার মধ্যে কাণ্ড ধরে আমি এমন টানাটানি লাগাব যে, কেমন করে কাণ্ড নিশ্চল হয়ে বসে থাকে তা দেখা যাবে।"

সভয়ে দিবাকর বলিল, "সর্বনাশ! তা হলে কাণ্ড বেচারা লজ্জায় একেবারে মাটির মধ্যে ঢুকে যাবে।"

যূথিকা স্মিতমুখে বলিল, "আর ফুল বেচারী ভয়ে একেবারে বাড়ির ভিতরে খসে পড়বে।"

সুনীথ একটা কী উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু সদর নায়েব মধুসূদন ঘোষাল আবির্ভূত হইয়া তাহাতে বাধা দিল। নত হইয়া তিনজনকে নমস্কার করিয়া দিবাকরকে বলিল, "জলযোগের আয়োজন প্রস্তুত বড়বাবু, আপনারা গেলেই বাবুদের ডাকা হয়।"

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "নিশা কোথায়?"

"আজ্ঞে, ছোটবাবু আর ম্যানেজারবাবু দুজনে মিলে সেখানে দেখাশুনো করছেন।"

"আচ্ছা, চলুন যাচ্ছি।" বলিয়া সুনীথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "চল সুনীথদা, চা খাবে চল।"

"আজ আমরাও একসঙ্গেই চা খাব না কি?"

"হ্যাঁ, যতক্ষণ বাইরের অতিথিরা আছেন, আমাদের যা কিছু খাওয়া সব একসঙ্গেই হবে।"

সুনীথ বলিল, "অতি উত্তম প্রস্তাব। চল, যাওয়া যাক।" তাহার পর যূথিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি যাবে না যূথিকা?—অন্তত অতিথিদের চা খাওয়ার সময়ে তত্ত্বাবধান করবার জন্যে?"

যূথিকা বলিল, "না, দাদা, সে কাজ ম্যানেজারবাবুরাই করবেন। আমি এবার অন্দর মহলে ডুব মারব।"

"কিন্তু সভার সময়ে তো অন্দর মহল থেকে তোমাকে বেরুতে হবে, চায়ের আসরে এখন আবির্ভূত হলে তখনকার জন্যে একটা রিহার্সাল দেওয়া হতো।"

"আমার তখনকার পার্ট এত সহজ যে, যে কোন একজন মেয়েকে মিসেস ফরেস্টার কল্পনা করে পাশে নিয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকলেই রিহার্সাল দেওয়া হবে। সে রিহার্সালের জন্যে অন্দর মহলও অসুবিধের জায়গা নয়।" বলিয়া সহাস্যমুখে যূথিকা প্রস্থান করিল।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময়ে রাজসাহী হইতে ভবতোষ মিত্রের সহিত মিস্টার এবং মিসেস ফরেস্টার এবং মিস্টার উইলসন নামক অপর একজন ইংরেজ রাজকর্মচারী এবং তাঁহার স্ত্রী মিসেস উইলসন আসিয়া পৌঁছিলেন। ঐ দুইটি ইংরেজ মহিলাকে অভ্যর্থনা করিবার এবং সাহচর্য দিবার ভার যূথিকার।

স্বচ্ছ নির্মল স্ফটিক পাত্রে সুমিষ্ট পানীয়ের ন্যায় যূথিকার লাবণ্যময় অবয়বের মধ্যে সুমিষ্ট বাক্যের সম্বর্ধনা লাভ করিয়া ইংরেজ অতিথিগণ যত না তৃপ্ত হইল, বিস্মিত হইল ততোধিক তাহার মুখনিঃসৃত ইংরেজী ভাষার সাবলীলতায়। ভারতবর্ষীয় মেয়ের মুখে ইংরেজী ভাষার পরিচয় এই তাহাদের নূতন নহে; ইংলণ্ডে, ভারতবর্ষে এমন কি সমুদ্রপথে জাহাজে অবস্থানকালে বহুবার তাহার সন্ধান মিলিয়াছে। কিন্তু মূল্যবান চীনার পাত্রে রক্ষিত কৃত্রিম ফুলগাছের সহিত মৃত্তিকা-রসবর্ধিত পুষ্পবল্লীর যে পার্থক্য, তাহার সহিত ইহার যেন সেই পার্থক্য। অনুকরণের চমক তাহাতে যথেষ্ট, কিন্তু জীবনের রসায়নে ইহা সরল। লালপাড় গরদের শাড়ির মহিমা, দেহের সুমিষ্ট সঙ্কোচ, মুখের ইংরেজী ভাষা—সমস্ত মিলিয়া একটা যেন অপরূপের ঝলমলানি।

ধূলা-পায়ে ক্লান্তদেহে একটা সংক্ষিপ্ত চা-পানের ব্যবস্থা ছিল, তাহার পর স্নান; তৎপরে বেলা একটার সময়ে লাঞ্চে ভূরিভোজনের আয়োজন।

রাজসাহী হইতে সদ্য-উপনীত পাঁচজন অতিথি এবং সুনীথ ও নিশাকর—এই সাতজনের একত্রে লাঞ্চে বসিবার কথা। সাহেব এবং মেম সাহেবদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দিবাকর গিয়াছিল অপর নিমন্ত্রিতদের দলে যোগ দিতে।

ভোজন টেবিলের চতুর্দিকে আটখানা চেয়ার পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে একটা চেয়ারের সম্মুখে ছুরি কাঁটা চামচ প্লেটের অভাব। যথাকালে বোঝা গেল, সেই বিশেষ চেয়ারটা যূথিকার জন্য অভিপ্রেত।

সবিস্ময়ে মিস্টার ফরেস্টার বলিল, "এ কী ব্যাপার! আপনি খাবেন না মিসেস্ ব্যানার্জি?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমি পরে খাব।"

"কেন? পরে কেন?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিল সুনীথনাথ, বলিল, "আমি জানি তার কারণ। আমাদের আহারপর্ব যাতে অব্যাহত হয়, আপাতত তিনি শুধু সেই দিকেই আত্মনিয়োগ করতে চান। তাই তিনি এখন খাবেন না।"

মিস্টার উইলসন বলিল, "কিন্তু সে কাজটা তিনি তো আমাদের সঙ্গে খেতে বসেও করতে পারতেন ডক্টর চ্যাটার্জি।"

সুনীথ বলিল, "তা হয়তো পারা উচিত। কিন্তু মিস্টার উইলসন, সংসারে যদি এমন একদল মিসেস্ ব্যানার্জি থাকেন যাঁরা খাওয়ার চেয়ে খাওয়ানোতেই বেশি তৃপ্তি পান, তা হ'লে আমরা কী করতে পারি বলুন?"

মিসেস্ উইলসন বলিল, "কিন্তু সংসারে আবার যদি এমন একজন মিসেস্ উইলসনও থাকে যে অভুক্ত হোস্টেসকে পিছনে ফেলে খাওয়ার চেয়ে সঙ্গে নিয়ে খেতেই বেশি তৃপ্তি পায়, তা হ'লেই বা আপনারা কী করতে পারেন বলুন?"

মিসেস্ উইলসনের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

সুনীথ বলিল, "তা হলে মিসেস ব্যানার্জি এবং মিসেস উইলসনদের যথাসম্ভব

শীঘ্র একটা মীমাংসায় উপনীত হবার জন্যে অনুরোধ করে ক্ষুধা চাপতে থাকা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি নে।"

স্নীথনাথের কথায় আর একটা উচ্চতর হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

এবার কথা কহিল ভবতোষ মিত্র ; বলিল, "অভুক্ত অবস্থায় অতিথি-সৎকার করা হিন্দু কল্পনায় একটা পুণ্যাচরণ। মিসেস ব্যানার্জি যদি আজ সেই পুণ্য অর্জন করবার সঙ্কল্প করে থাকেন তা হলে তাঁকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করে আমাদের বসে পড়াই বোধ হয় সমীচীন।"

ঠিক এই যুক্তির দ্বারাই প্রবর্তিত না হইলেও, ভবতোষ মিত্রের উপদেশ পালন করিয়া সকলে খাইতে বসিয়া গেল এবং কখনও চেয়ারে বসিয়া গল্প করিয়া করিয়া, কখনও বা ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকের প্রয়োজন দেখিয়া দেখিয়া যূথিকা সকলকে খাওয়াইতে লাগিল।

ইউরোপীয় আহার-টেবিলে ঠিক এরূপ উপরোধ-অনুরোধের প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও ইংরেজ অতিথিগণ ইহার দ্বারা পরিতুষ্টই হইল। এমন কি, অভুক্ত হোস্টেসকে পিছনে ফেলিয়া আহার কার্যের মধ্যে মিসেস উইলসনের ক্ষেত্রেও তৃপ্তির কিছুমাত্র অল্পতা লক্ষ্য করা গেল না।

কুড়ি

বেলা তিনটা হইতে সভা আরম্ভ হইবার কথা—তাহার মিনিট দশেক পূর্বেই স্থানীয় এবং স্থানান্তরের দর্শকমণ্ডলীতে সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সভা-বেদীর উপরে বিশিষ্ট সদস্যগণের আসন। তাহা হইতে কিছুদূরে দক্ষিণ দিকে শুভ্র সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরালে মনসাগাছা এবং সন্নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের ভদ্র মহিলাদিগের বসিবার স্থান।

আড়াইটা হইতে তোরণ-মঞ্চে সানাই বাজিতেছে। ঠিক বেলা তিনটার সময়ে উৎসব-সভা হইতে কিয়দ্দূরে বোমা বিদারণের একটা প্রচণ্ড শব্দ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপের ভিতর আরম্ভ হইয়া গেল উদ্বোধন-সঙ্গীত। সঙ্গীত শেষ হইলে সুনীথনাথের প্রোগ্রামের কপিতে যেরূপ দেখা গিয়াছিল, স্বস্তিবাচন হইতে আরম্ভ হইয়া তদনুক্রমে সভার কার্য অগ্রসর হইল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সুনীথ তাহার ইংরেজী অভিভাষণের পাঠ শেষ করিয়া ইংরেজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বুঝিবার জন্য বাংলা ভাষায় তাহার সারমর্ম বিবৃত করিল। তৎপরে উপস্থিত হইল বালিকা-বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার পালা।

ফিকা নীল রঙের বস্ত্রের উপর শ্বেতপুষ্পখচিত একটি সুদৃশ্য আবরণের দ্বারা স্কুল প্রবেশের প্রধান পথটি অবরুদ্ধ ছিল। মূল সভাপতি মিস্টার

ফরেস্টার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মিসেস ফরেস্টার তথায় গমন করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে নিনাদিত সাতটি শঙ্খের সমবেত ধ্বনির মধ্যে একটা রেশমী ফিতার টানে আবরণটি অপসারিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল,—এবং তাহার পশ্চাতে অনুসরণ করিল সর্বোচ্চ ক্লাসের জন্য নির্বাচিত পাঁচটি ছাত্রীর সহিত প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ করুণা মিত্র, অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীগণ, স্কুল-কর্তৃপক্ষ এবং মিস্টার ফরেস্টার প্রমুখ জন দশ-বারো বিশিষ্ট অভ্যাগত।

স্কুলের বিভিন্ন কক্ষগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করিয়া সকলে অবশেষে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কক্ষে সমবেত হইলে সেখানে ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীদিগের মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান আচরিত হওয়ার পর সকলে পুনরায় সভামণ্ডপে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর মিস্ করুণা মিত্র তাহার ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে সভাপতির আহ্বানে দর্শকমণ্ডলীর ভিতর হইতে রাজসাহী কলেজের একটি অধ্যাপক এবং মিস্টার উইলসন অল্প কিছু আলোচনা করিল।

আর কাহারও কিছু বলিবার লক্ষণ না দেখিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মিস্টার ফরেস্টার মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি কিছু বলুন না মিস্টার ব্যানার্জি ?"

প্রস্তাব শুনিয়া সঙ্কোচে ও ভয়ে দিবাকরের কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সে তাহার সুদৃঢ় অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

সভাপতির কানে কানে সুনীথ মৃদুস্বরে কিছু বলিতেই সভাপতি আর দিবাকরকে অনুরোধ করিল না। সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে দিবাকর বুঝিল, সুনীথের অনুকম্পায় সে রক্ষা পাইয়াছে।

পর মুহূর্তে সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যূথিকার নিকট গমন করিয়া সুনীথ মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার শুধু নির্বাক হয়ে ফুঠে থাকলে আর চলবে না যূথিকা,—সবাক হতে হবে।"

ত্রস্তকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কেন দাদা ?"

"সভাপতির অনুরোধ, তুমি কিছু বল।"

আরক্তমুখে যূথিকা বলিল, "না দাদা, সে আমি কিছুতেই পারব না। আপনি দয়া করে সভাপতিকে বুঝিয়ে বলুন।"

সুনীথ বলিল, "ঐ দেখ, আগ্রহভরে সভাপতি তোমার দিকে চেয়ে আছেন।"

যূথিকা চাহিয়া দেখিতেই মিস্টার ফরেস্টার একটু উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দয়া করে আপনি কিছু বললে আমরা অতিশয় আনন্দিত হব মিসেস্ ব্যানার্জি। আপনি কিছু না বললে আজকের এ অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকবে।"

দূর হইতে ভবতোষ মিত্র বলিল, "অল্প করে কিছু বলুন বউমা।" দক্ষিণ দিক হইতে মিসেস্ ফরেস্টার অনুরোধ করিল; বাম দিক হইতে মিসেস্ উইলসনের উপরোধ আসিল; পিছন দিক হইতে নিশাকর বলিল, "দোহাই বউদিদি, আমাদের মুখ রক্ষে কর।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কিছু ভাবিয়া, হয়তো বা কিছু না ভাবিয়াই, যূথিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, ঠিক যেরূপে ইহার পূর্বে অনেক সভায় অনেক ব্যক্তিই উপরোধ অনুরোধের পীড়নে নিরুপায় হইয়া কিছু বলিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক্ষণকাল মনে মনে নিজেকে যথাসাধ্য সংবিষ্ট করিয়া লইয়া একবার সম্মুখস্থ জনমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিতে আরম্ভ করিল, "শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমি—"

"ইংরিজীতে, ইংরিজীতে, ইংরিজীতে ?"

চতুর্দিকে রব উঠিল যূথিকাকে ইংরেজীতে বলিবার অনুরোধের। দৈবাৎ, অথবা ইচ্ছাবশেই হউক, যূথিকার দৃষ্টি মিলিত হইল স্বামীর দৃষ্টির সহিত। দিবাকরও ঘাড় নাড়িয়া সেই একই কথা বলিল, "ইংরিজীতেই বল।"

পুনর্বার এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া অবস্থান করিয়া যূথিকা ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, "মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, লেডিস্ অ্যাণ্ড জেনট্‌লমেন্" —তাহার পর তরল সুমার্জিত ইংরেজিতে প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাহার বক্তৃতা শেষ করিয়া দীর্ঘস্থায়ী করতালি এবং হর্ষোচ্ছ্বাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করিল।

যূথিকার বক্তৃতার প্রধান অংশের মর্ম কতকটা এইরূপ—বিধাতা মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যা দেন নাই। একমাত্র মানুষ ছাড়া যে পরমা বুদ্ধি হইতে জীব-জগতের অপর সকল প্রাণী বঞ্চিত, যে পরমা বুদ্ধি মানুষ বিধাতার বরপাত্ররূপে তাঁহার নিজ হস্ত হইতে পাইয়াছে, সেই শানিত বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানের ক্ষেত্র কর্ষিত করিয়া করিয়া সে স্বয়ং বিদ্যার ফসল অর্জন করিয়াছে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কর্ষণের ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্র উর্বর হইয়া বিদ্যা সমৃদ্ধ হইয়াছে। যেখানে উপযুক্ত কর্ষণের অভাবে ভূমি যথেষ্ট উর্বরা নহে, যেখানে বিদ্যার স্বল্পতা, সেখানে মানুষের অসম্পূর্ণতা, সেখানে মানুষের পরাজয়, অপমান। কিন্তু আজ যদি বলি মনসাগাছা অঞ্চলের বালিকাদের চিত্তভূমি অনুর্বর ক্ষেত্র, ঘাটতি জমি,—তাহা হইলে সত্যভাষণ হইবে, কিন্তু সে সত্যভাষণের মধ্যে অপমান নাই; কারণ আজ আমরা অনুর্বর ক্ষেত্রকে উর্বর করিবার জন্য উদ্যত। অভাবের মধ্যে দৈন্য আছে, কিন্তু অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৈন্য নাই। এইরূপ সংগ্রামে আমরা রত হইয়াছি বলিয়া ডক্টর চ্যাটার্জি তাঁহার অভিভাষণে আমাদিগকে প্রচুর বাহাদুরি দিয়াছেন। কিন্তু সহৃদয়তাবশত তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা আমাদের যথার্থ প্রাপ্য—এ ভুল যেন আমরা কদাচ না করি। আজ যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কর্তব্যপালনে গৌরব নাই, অপালনে অগৌরব আছে। আমাদের নিকটবর্তী আশপাশের মানুষের অসম্পূর্ণতা লাঘব করিবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা তদ্বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকি তাহা হইলেই কর্তব্যের অপালন। কারণ, বিদ্যা মানুষের অপরিহার্য অংশ বলিয়া, এক পক্ষে তাহা যেমন দাবি করিবার আছে, অপর পক্ষেও ঠিক তেমনি তাহার যোগান দিবার দায়িত্ব।

সংকার্যের পথে বহু বাধা। আমাদের এ কার্য যে সৎকার্য, বাধার দিক দিয়াও আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি। আপনারা আজ আশীর্বাদ করুন, বাধার মধ্যেই যেন বাধাকে অতিক্রম করিবার শক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই। ডক্টর চ্যাটার্জি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আজিকার এই গার্লস্ স্কুল, যাহা ফুল হইয়া আজ ফুটিল, পাঁচ বৎসর পরে গার্লস কলেজের ফলে পরিণত হইবে। আমাদের এই প্রচেষ্টার সফলতা ডক্টর চ্যাটার্জির সাংকেতিক মূর্তিতেই যেন আমাদিগকে চরিতার্থ করে, এই আমার অন্তরের ঐকান্তিক কামনা।

যাহারা ইংরাজী বুঝে যূথিকার ভাব এবং ভাষার পারিপাট্যে তাহারা চমৎকৃত হইল, যাহারা বুঝে না, তাহাদিগকে মুগ্ধ করিল যূথিকার শান্ত সুন্দর মূর্তি এবং সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। মিস্টার ফরেস্টার তাহার বক্তৃতাকালে যূথিকার বক্তৃতার প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলিল, "একটা কথা সুস্পষ্ট করবার জন্যে যদি আমাকে উপমার সহায়তা অবলম্বন করতে হয় তা হ'লে বলব, আজকের এই স্কুল এবং স্কুল প্রতিষ্ঠাকে যদি 'দেহ' বলে অভিহিত করি তা হ'লে মিসেস ব্যানার্জিকে বলব তার 'প্রাণ', আর সেই প্রাণশক্তির মধ্যে যে সঞ্জীবতা এবং গতিবেগের প্রাচুর্য লক্ষ্য করছি তাতে দেহের ঋদ্ধি এবং বৃদ্ধি সুনিশ্চিত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। প্রতিভা যখন কার্যকরী শক্তির কর্ণধার হয়ে বসে তখন সাফল্যের তীরভূমিতে উপনীত হতে বিলম্ব হয় না। মিসেস্ ব্যানার্জির মধ্যে প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের যে মণিকাঞ্চন যোগ দেখছি তাতে সাফল্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বন্ধনরজ্জু হাতে নিয়ে তাঁকে ধরা দেবে – এ কথা আমি এখানে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলে যাচ্ছি।"

সভাভঙ্গের পর দেখা গেল প্রথম আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে যূথিকা। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে উৎসুক এবং আগ্রহশীল ব্যক্তির আবর্তন। প্রশ্নে প্রশ্নে এবং প্রশংসায় প্রশস্তিতে তাহার নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে যূথিকার নিকট লইয়া আসিয়া ভবতোষ মিত্র বলিল, "ইনি শ্রীযুক্ত শিবনাথ চৌধুরী, রাজসাহীর একজন বড় উকিল। সারদাশঙ্কর গার্লস হাই ইংলিশ স্কুলের ইনি প্রেসিডেন্ট। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এঁদের স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে। তার পরের যে কথা, তা শিবনাথবাবুর মুখ থেকেই শুনুন!"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "সেই উৎসবে আপনাকে যোগদান করতে হবে। যথাসময়ে আপনার কাছে আমাদের সাদর নিমন্ত্রণ পৌঁছবে, কিন্তু তার আগে আমি নিজ মুখে বিশেষভাবে অনুরোধ করে যাচ্ছি আমাকে কথা দিন মিসেস ব্যানার্জি।"

ঈষৎ আরক্ত মুখে যূথিকা বলিল, "আপনি আমাদের উৎসবে যোগদান করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন চৌধুরী মশায়—কিন্তু যে ঋণে আমাদের আবদ্ধ করেছেন, আমার মতো সামান্য মানুষ আপনাদের উৎসবে যোগদান করলে সে ঋণ

শোধ হবে না। সুতরাং দয়া করে আমাকে যদি ক্ষমা করেন তা হলে ভালো হয়।"

নির্বন্ধসহকারে শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "না না মিসেস ব্যানার্জি অযথা কথা বলে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করবেন না। আপনাকে যেতেই হবে। আপনি দয়া করে আমাকে কথা দিন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা না কয়ে আমি তো কিছু বলতে পারছি না চৌধুরী মশায়। চিঠি লিখে পরে আপনাকে জানাব। কেমন?"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "এর জন্যে চিঠি লেখালেখির অপেক্ষায় থাকবার দরকার কী মিসেস ব্যানার্জি,—আমি এখনিই দিবাকরবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর সম্মতি নিয়ে নিচ্ছি।"

অদূরে ফরেস্টারের নিকট দাঁড়াইয়া দিবাকর, নিশাকর এবং সুনীথ কথোপকথন করিতেছিল। কয়েক পা আগাইয়া গিয়া শিবনাথ চৌধুরী একটু ইশারা করিতে দিবাকর আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুক্তকরে শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "একটা প্রার্থনা আছে দিবাকরবাবু, দয়া করে মঞ্জুর করতে হবে।"

ব্যগ্র কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "প্রার্থনা বলবেন না চৌধুরী মশায়, আদেশ বলুন।"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "আজ এখানে এসে এত আনন্দ পাব তা একবার কল্পনাও করি নি। আমাদের কালেক্টার সাহেবের ভাষাতেই বলি এই স্কুল সংগঠন ব্যাপারে প্রাণশক্তির অপরূপ লীলা দেখে বিস্মিত হয়েছি। আমার এই পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের মধ্যে রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে ঐশ্বর্যে বাক্যে এমন একটি বাঙালী মেয়ে দেখি নি যার তুলনা মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে করা যেতে পারে। মিসেস ব্যানার্জি আমাদের রাজসাহী জেলার গৌরব। কিন্তু সেই গৌরবের বস্তুকে মনসাগাছা যদি নিজের চতুঃসীমার মধ্যে আটকে রাখে তা হলে কারাগার বলে মনসাগাছার আমরা নিন্দে করব।" বলিয়া শিবনাথ চৌধুরী হাসিতে লাগিল।

ঈষৎ আরক্ত মুখে প্রথমে স্বামীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে চৌধুরী মশায়, আপনার স্নেহ বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে আমি সমর্থ হয়েছি। কিন্তু—"

যূথিকাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "না, না, মিসেস ব্যানার্জি, শুধু স্নেহই নয়, শ্রদ্ধাও যথেষ্ট। যে জিনিস আপনার অবশ্যপ্রাপ্য তার জন্যে কুণ্ঠিত হবার কোনও কারণ নেই।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "কিন্তু চৌধুরী মশায় আসল কথাটা শোনবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। কারাগার বলে মনসাগাছার নিন্দিত হবার আশঙ্কা কেন সে কথা তো বুঝতে পারছি নে!"

তখন শিবনাথ চৌধুরী তাহার প্রকৃত বক্তব্য দিবাকরের নিকট সবিস্তারে প্রকাশ করিয়া বলিল।

সকল কথা শুনিয়া যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "চৌধুরী মশায়ের প্রস্তাব তো অসঙ্গত নয় যূথিকা।—এতে তুমি সম্মতই বা হচ্ছিলে না কেন, আর এর জন্যে আমার সঙ্গে পরামর্শের অপেক্ষায় থাকবারই কী দরকার ছিল ?"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "দরকার হয়তো ছিল না, কিন্তু তবুও আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে রাজী না হওয়ায় মিসেস ব্যানার্জির উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়েই গেছে।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তা হলে নিশ্চয়ই আর আপত্তি নেই ?"

কিছু না বলিয়া যূথিকা অল্প একটু হাসিল।

দিবাকর বলিল, "শাস্ত্রে বলে মৌনং সম্মতি লক্ষণং,—আর এ মৌন যখন হাস্যের সহিত বর্তমান, তখন বোঝা যাচ্ছে মনসাগাছার দুর্নামের আর ভয় রইল না।"

দিবাকরের মন্তব্য শুনিয়া শিবনাথ চৌধুরী ও ভবতোষ মিত্র হাসিয়া উঠিল।

প্রসঙ্গ শেষ হইয়াছে মনে করিয়া দিবাকর পূর্বস্থানে যোগ দিবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে এমন সময়ে শিবনাথ চৌধুরী তাহাকে পুনরায় ডাক দিয়া বলিল, "একটা কথা বাকি রয়ে যাচ্ছে দিবাকরবাবু।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকর বলিল, "বলুন ?"

"বলা বাহুল্য, মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে আপনিও নিশ্চয়ই যাবেন।"

মনে মনে দিবাকর বলিল, 'মিস্টার বাহুল্য ব্যানার্জি হয়ে না-কি ?' মুখে বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন চৌধুরী মশায়, আপনাদের উৎসব সভায় মিসেস ব্যানার্জি যাতে উপস্থিত থাকেন সে ব্যবস্থা আমি নিশ্চয় করব।"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "শুধু সে ব্যবস্থা করলেই হবে না, সে ব্যবস্থার মধ্যে আপনার যাওয়ার ব্যবস্থাও নিশ্চয় থাকা চাই।"

"মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে পরামর্শ করে সে কথা স্থির করলেই হবে।" বলিয়া দিবাকর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর সাহেবদের ডিনার এবং অপর অভ্যাগতগণের ভোজন শেষ হইলে বিদায়ের পালা আরম্ভ হইল। যাহাদের রাত্রে যাওয়া অসুবিধাজনক, তাহারা পরদিনের অপেক্ষায় রহিয়া গেল।

কাজকর্ম চুকিয়া গেলে দিবাকর যখন তাহার শয়ন-কক্ষে যূথিকার সহিত মিলিত হইল, তখন রাত এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্লান্ত দেহ একটা ইজি-চেয়ারে এলাইয়া দিয়া সে বলিল, "উৎসব কেমন হল যূথিকা ? সাক্সেসফুল তো ?"

প্রসন্নমুখে যূথিকা বলিল, "খুব সাক্সেসফুল।"

"খুশি হয়েছো ?"

"নিশ্চয় হয়েছি। তুমি ?"

"আমি তোমার দ্বিগুণ খুশি হয়েছি। একগুণ নিজের হিসাবে, আর একগুণ

তোমাকে খুশি করেছি। তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছিল যূথিকা।"

উৎফুল্ল স্বরে যূথিকা বলিল, "হয়েছিল ? তোমার ভালো লেগেছে ?"

দিবাকর বলিল, "খুব ভালো লেগেছে; জামাইবাবু এখানে একদিন যে বলছিলেন, কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে তুমি অনেক প্রফেসারের চেয়েও ভালো ইংরিজী বলতে, আজ তার প্রমাণ পেলাম। তোমার ইংরিজী বক্তৃতার মধ্যে আমি আমার বাঙালী বউকে বারে বারে হারিয়ে ফেলছিলাম। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হচ্ছিল, মিসেস ফরেস্টারই বা বুঝি বক্তৃতা দিচ্ছে !"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "সে তুমি আমাকে ভালোবাসো বলে মনে হচ্ছিল। যতই ভালোবলুক, ময়না পাখী কখনও মানুষের কণ্ঠস্বরে পৌছতে পারে না।"

দিবাকর বলিল, "আমার ময়না পাখী কিন্তু আজ পৌচেছিল।" তাহার পর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আর না; ঘুমে চক্ষু হয়েছে ভারি, ক্লান্তিতে দেহ হয়েছে অলস,—এবার চললাম ময়না, তোমার নীড়ে আশ্রয় নিতে।"

"চল, আমিও আসছি।" বলিয়া জল খাইয়া আলো কমাইয়া যূথিকা হৃষ্টচিত্তে শয্যায় আসিয়া লেপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দিবাকর বলিল, "কার পাশে শুলে বুঝতে পারছ যূথিকা ?"

কপট বিহ্বলতার স্বরে যূথিকা বলিল, "অন্ধকারে ঠিক ঠাওর পাচ্ছি নে তো। গলার শব্দে মনে হচ্ছে শেফালীর সেজ জামাইবাবুর পাশে।"

দিবাকর বলিল, "ঠিক ধরেছ। কিন্তু শেফালীর সেজ জামাইবাবু সর্বদা তোমার পাশে পাশে থাকে, নিতান্ত নিকটের লোক,—সুতরাং তাকে সম্পূর্ণ করে তোলবার ব্যবস্থা তুমি যদি না কর তা হ'লে তোমার নিজের বক্তৃতা অনুসারে তোমার কর্তব্যের চ্যুতি হবে। এখন কী ব্যবস্থা করবে বলো ?"

অকস্মাৎ কথোপকথনের ভঙ্গীর এমন তাল বদলাইয়া গেল যে, কী বলিলে দিবাকরের কথার সহজ অথচ সম্পূর্ণ প্রতিবাদ হয়, সহসা যূথিকা তাহা ভাবিয়া পাইল না। এ পর্যন্ত যে-কথোপথনের গতি ছিল অবাধ এবং লীলায়িত, তাহাতে ছেদ পড়িল। অন্ধকারের মধ্যেই চিন্তার ছায়াপাতে যূথিকার প্রসন্নতা হইল ম্লান।

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "প্রশ্ন যদি কঠিন মনে হয়, ভেবে চিন্তে পরে না হয় উত্তর দিয়ো।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে উত্তর দিতে হইলে প্রশ্নের কঠিনতাকে কঠিনতর করা হইবে। সুতরাং আর অধিক বিলম্ব না করিয়া যূথিকা বলিল, "শেফালীর সেজদিদি যদি শেফালীর সেজ জামাইবাবুকে অসম্পূর্ণ মানুষই মনে করত, তা হ'লে কখনই তার মুখ দিয়ে অত সহজে ও কথা বার হ'তো না।"

পূর্বের ন্যায় কৌতুকের ছন্দ অনুসরণ করিলেও যূথিকার নিজের কানেও উত্তরটা ঠিকমত সহজ সুরে বাজিল না। মনে হইল যেন দুর্বল কৈফিয়তের বেসুর

ধ্বনির দ্বারা তাহা অসরস। দিবাকরের প্রশ্নের ঠিক পিঠে পিঠে দিতে পারিলে হয়তো এই উত্তরটাই মানাইয়া যাইত। কিন্তু অতর্কিত বিমূঢ়তাজনিত ক্ষণস্থায়ী বাক্‌রোধ সমস্ত জিনিসটার রঙ বদলাইয়া দিয়াছে।

দিবাকর বলিল, "রাত হয়েছে যূথিকা, এবার ঘুমানো যাক।"

একুশ

কয়েকদিন বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া দুর্দান্ত শীত পড়িয়াছে। বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, ঘণ্টা দুই আড়াই সূর্যকরের উত্তাপ ভোগ করিয়াও তাহার প্রকোপ বিশেষ কমে নাই। গাছপালা পথঘাট তখনও হিমে আড়ষ্ট।

চৌধুরীপাড়ার পশুপতি ঘোষালের বাড়ির বাহিরের অঙ্গনে রৌদ্রের মধ্যে কম্বল বিছানো তক্তাপোশের উপর পল্লীবৃদ্ধগণের আড্ডা বসিয়া ছিল। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল যোগমায়া বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব। এক সপ্তাহ হইল তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত গ্রামবাসীর মনে এমন অভিনব এবং সুগভীর ছাপ মারিয়া গিয়াছে যে, আজ পর্যন্ত তদ্বিষয়ে আলাপ-আলোচনার বেগ হ্রাস পাইল না। অবশ্য বৃষ্টি বাদলের জন্য তিন চার দিন এমন করিয়া একত্র হইয়া জটলা পাকাইবার সুবিধা ছিল না সে কথাও সত্য।

দুই পুরুষ পূর্বে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জেদের অবস্থা যখন সমৃদ্ধ ছিল তখন বাঁড়ুজ্জেদের বিরুদ্ধে একটা ভারী মামলা হারিয়া তাহাদের মনে যে অসূয়া উৎপন্ন হইয়াছিল, নির্বাপিত আতসবাজির পিছনে ভস্মরেখার ন্যায় আজ পর্যন্ত তাহা নিঃশেষিত হয় নাই। সেই ভস্মের খানিকটা অংশ উদ্‌গিরণ করিতে করিতে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিতেছিল, "এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয় হে ঘোষাল,— বিদ্যের ছদ্মবেশে এম. এ. পাশ করা যে-অবিদ্যে বাঁড়ুজ্জ্যে-বংশে প্রবেশ করেছেন, তাঁর দাপটে লক্ষ্মী-বিদায় পালা সাঙ্গ হবার বেশি দেরি হবে না জেনো। বল কি হে! একটা পাঠশালা খুলতে পনেরো হাজার টাকা খরচ, আর চালাতে মাসে মাসে পাঁচ শো টাকা ব্যয়!"

পশুপতি ঘোষাল বলিল, "না না, এত হয়তো নয়। তবে এ টাকা খরচ করবার শক্তি যে বাঁড়ুজ্জেদের নেই তাও তো নয়।"

উত্তরে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্বে তারিণী বরাট কথা আরম্ভ করিল; বলিল, "শুধু বালিকা বিদ্যালয়ই তো নয় ঘোষাল মশায়, শুনলেন তো সুনীথের বক্তৃতায় বালিকা বিদ্যালয় হচ্ছে ফুল, যা থেকে বছর পাঁচেক পরে ফল ফলবে গার্লস কলেজ। ফুল ফোটাতেই যদি এই, তা হ'লে ফল ফলাবার হিসেবটা কী দাঁড়ায় একবার কষে দেখুন।"

তারিণী বরাটের মন্তব্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পশুপতি ঘোষালের প্রতি সদর্পে দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তবে? উত্তর দাও কবরেজ মশায়ের কথার!"

কিন্তু উত্তর দেবার সময় হইল না, দেখা গেল অদূরে পথে দিবাকর আসিতেছে। পিছনে তাহাকে অনুসরণ করিতেছে ম্যাস্টিফ জাতীয় একটা বৃহৎ কুকুর। আকাশ পরিষ্কার পাইয়া দিবাকর ও নিশাকরকে সঙ্গে লইয়া সুনীথ পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়াছিল কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য। ফিরিবার কালে প্রয়োজনবশত দিবাকর ভিন্ন পথে ফিরিতেছিল।

দিবাকর নিকটে আসিতে উভয়পক্ষে দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও জমিদারকে দেখিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। পশুপতি ঘোষাল বলিল, "এস, এস দিবাকর, তোমাদের কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল।"

গৃহে ফিরিবার একটু তাড়া ছিল, কিন্তু তথাপি এত লোকের সম্মুখে এ আহ্বান দিবাকর একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিল না; বলিল, "আসি।"

ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত পশুপতি ঘোষাল বলিল, "তোমার ঐ কুকুরটিকে যদি বাবাজি—"

"আজ্ঞা, হ্যাঁ," বলিয়া দিবাকর তাহার চেস্টারফিল্ডের পকেট হইতে একটা লোহার চেন বাহির করিয়া কুকুরটাকে বাঁশে বাঁধিয়া দিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিল।

অদূরে পশুপতি ঘোষালের পৌত্র মাধব দাঁড়াইয়া ছিল। ব্যগ্রকণ্ঠে পশুপতি বলিল, "ওরে মাধব শীগ্‌গির ঘর থেকে চেয়ারটা বের করে নিয়ে আয়।"

হস্ত সঙ্কেতে মাধবকে নিরস্ত করিয়া দিবাকর বলিল, "ব্যস্ত হবেন না জেঠামশায়, আমি তক্তাপোশেই বসছি; আপনারা সকলে বসুন।" বলিয়া তক্তাপোশের এক কোণে উপবেশন করিল।

একে একে সকলে উপবেশন করিলে কথাটা পশুপতি ঘোষালই পুনরায় উত্থাপিত করিল, বলিল, "কথা হচ্ছিল তোমাদের স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে। বৃহৎ ব্যাপার করলে বাবা। কদিন ধরে মনে হচ্ছিল গ্রামে যেন একটা বড় রকম যজ্ঞ টজ্ঞ চলেছে।"

পিছন দিকে ঘরের দাওয়ায় ভৈরব দত্ত বসিয়া ছিল। কন্যাদায় সংক্রান্ত তাহার সনির্বন্ধ আবেদন দিবাকরের নিকট কিছুদিন হইতে ঝুলিয়া আছে। সুযোগ বুঝিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "যজ্ঞই তো বটে! আগেকার রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন, এতদিন তা কানেই শুনে এসেছি; আর এ যজ্ঞ আজ স্বচক্ষে দেখলাম।" তাহার পর সম্মুখে উঠিয়া আসিয়া দিবাকরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একটা কীর্তি স্থাপন করলেন বড়বাবু। এ তল্লাটে কোনদিন এমন ব্যাপার হয় নি। আমাদের বামুনকায়েতদের কথা ছেড়েই দি, আমরা তো ছলে ছুতোয় আপনাদের বাড়ি পাত পেড়ে আসি; কিন্তু কাঙালী যা দুদিন খেলে তা পাঁচ হাজারের কম কিছুতেই হবে না। এ যজ্ঞ নয় তো আর কি!"

পাঁচ হাজার সংখ্যাটা অবশ্য অযথা বাড়ানো, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ না করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে অন্য দিক দিয়া বাণ নিক্ষেপ করিল ; বলিল, "যজ্ঞ তো বলছ ভৈরব, কিন্তু এ কোন্ যজ্ঞ তা বল ? অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব বধ হতো। এ কি তা হ'লে কন্যামেধ যজ্ঞ ?" বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ অবশ্য ভৈরবের সঙ্গে একটা পরিহাস করলাম, এটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু বাবাজী, যদি কিছু মনে না কর তো একটা কথা বলি।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "মনে করব, কি করব না, কথা শোনবার আগে কেমন করে বলি ? কিন্তু সে যাই হোক, আপনি বলুন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তুমি অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলে, কিন্তু এর দ্বারা দেশের মঙ্গল হবে বলে মনে কর কি বাবাজি ? আমাদের এই অজ পাড়াগাঁ অঞ্চলে বিশ-পঁচিশখানা গ্রামের মধ্যে বারো আনা ছেলেই হয়তো ম্যাট্রিক পাস করাও নয়। এই মূর্খের দেশে মেয়ে-গুলোকে অযথা লেখাপড়া শিখিয়ে পাস করালে,—আর তুমি যে রকম বৃহৎ ব্যবস্থা করলে তাতে তো পাঁচ-ছ বছর পরে তারা আই. এ., বি. এ. পাস করতেও আরম্ভ করবে,—তখন কি আর তাদের বিয়ে থাওয়া হতে পারবে বলে মনে কর ?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কেন, না হবার কী কারণ আছে ?"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "একেই তো আমাদের দেশে মেয়ের বিয়ে দেওয়া একটা অতিশয় কঠিন ব্যাপার, তার ওপর মূর্খ পাত্র দেখে মেয়েরাও যদি নাক সিঁটকাতে আরম্ভ করে তা হ'লে কী রকম করে তাদের বিয়ে হয় বল ? আর ও-রকম বিয়ে যদিও বা হয়, সুখের হবে না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।"

এবার কথা কহিল পশুপতি ঘোষাল। বাহ্যত দিবাকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে বলিল, "তাই বলে তুমি বলতে চাও যে, মূর্খ ছেলেদের খাতিরে মেয়েদের আরও মূর্খ করে রাখতে হবে ?"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "কথাটা ও-ভাবে বললে একটু কটু শোনাবে। আমি বলতে চাই, সমাজের মঙ্গলের খাতিরে যে-রকম করেই হোক মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের উঁচু ক'রে রাখতে হবে। ছেলেদের দাবিয়ে রেখে মেয়েরা বড় হলে শুভ হবে না, এ নিশ্চয় জেনো।" তাহার পর তারিণী বরাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনি কী বলেন কবরেজ মশায় ?"

স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইলে দিবাকরের প্রতিকূলে কোন কথা না বলাই উচিত ছিল ; তথাপি একটু ইতস্তত করিয়া তারিণী বরাট বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কথা সমীচীন বলেই তো মনে হয়। নাড়ী সম্বন্ধে চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে, 'দুর্বলে সবলা নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা'। নারী সম্বন্ধেও তেমনি বলা যেতে পারে, 'দুর্বলে সবলা নারী সা নারী প্রাণঘাতিকা।' আর এই দুর্বলতা যদি

বিত্তার দুর্বলতা হয় তা হ'লে প্রাণঘাতিকার পরিবর্তে মানঘাতিকাও বলা যেতে পারে।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুযোগ পাইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে এবার কঠোরতর অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তারিণী বরাটের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নিরীহ মসৃণ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু তাই ব'লে সব ক্ষেত্রেই এ কথা বলা চলে না কবরেজ মশায়। এই আমাদের কথাটাই বিবেচনা করুন না কেন! আমাদের মা-লক্ষ্মী যে এম. এ.-পাস করা মেয়ে,—আর আমাদের বাবাজি যে ম্যাট্রিক পাশও করেন নি, এ ক্ষেত্রেও কি আপনি মানঘাতিকা বলবেন?" বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় তারিণী বরাটের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রশ্ন শুনিয়া তারিণী বরাট সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কথাটা যে অকস্মাৎ এমন উৎকট আকার ধারণ করিয়া তাহারই উপর ফিরিয়া আসিবে তাহা জানিলে কখনই সে নাড়ী এবং নারী লইয়া ঐটুকু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিত না। শাস্ত্রীয় শ্লোক আওড়াইয়া এবং তাহার নূতন ভাষ্য করিয়া এখন দিবাকরের ক্ষেত্রে মানঘাতিকা শব্দ প্রযুক্ত হইবে না বলাও কঠিন এবং হইবে বলা কঠিনতর।

একপক্ষে তারিণী বরাটের মুখে নিঃশব্দ বিহ্বলতার আর্তি এবং অপরপক্ষে উত্তরের জন্য ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের দৃষ্টিতে নির্বাক অনিবার প্রতীক্ষা লক্ষ্য করিয়া দিবাকর প্রচুর কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "বলুন কবরেজ মশায়, যা বলবার আছে আপনার। সঙ্কোচ করছেন কেন?"

দিবাকরেরপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে তারিণীশঙ্কর বলিল, "আমি তো ও ভাবে কোন কথা বলি নি, আমি সাধারণভাবেই কথাটা বলেছিলাম।"

"সাধারণভাবে কথা আমাদের বিষয়েও বলা চলে, এ কথাটুকুই বা বলতে ইতস্তত করছেন কেন? আমরা তো আর সাধারণের বাইরে নই। কী বলুন জেঠামশায়?" বলিয়া দিবাকর ত্রৈলোক্য চাটুজ্জ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জ্যে বলিল, "না বাবাজি তোমরা নিশ্চয় সাধারণের বাইরে। কথায় বলে অর্থে সর্বে বশাঃ। মা লক্ষ্মীর কৃপায় সেই অর্থ তোমাদের এত প্রচুর আছে যে, তোমাদের সোনার শেকলে বাঁধা না পড়ে এমন কোন শক্তি নেই; তা সে শক্তি বিত্তেরই বলো বা অন্য কিছুই বলো। লক্ষ্মীর দরজায় সরস্বতী চিরদিনই জোড়হস্ত। সুতরাং তোমাদের ক্ষেত্রে মানঘাতিকার কথা উঠতে পারে না। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সেদিনকার সভায় আমাদের পক্ষে অর্থাৎ মনসাগাছার সাধারণ অধিবাসীদের পক্ষে ব্যাপারটা একটু মানঘাতক হয়েছিল।"

প্রসঙ্গটা প্রথম হইতে দিবাকরের ভালো লাগিতেছিল না; কিন্তু তাহার পক্ষে ভালো লাগিবার কথা নহে বলিয়াই সে ইহাকে বন্ধ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল; বলিল, "কেন, আপনাদের পক্ষে মানঘাতক কেন হয়েছিল?"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জ্যে বলিল, "তুমি বাবাজি মনসাগাছা গ্রামের প্রধান পুরুষ,

জমিদার-ঘরের তুমি হচ্ছ প্রথম শরিক—সেদিনকার সভায় কালেক্টার সাহেবের ডান পাশে বসে সমস্তক্ষণ তুমি নিঃশব্দে কাটালে; অথচ মেমসাহেবের বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে বউমা ইংরেজীতে আধ ঘণ্টা ধরে অনর্গল বক্তৃতা দিলেন। এতে আমরা কী করে ঠিক খুশি হই বলো ?'

দিবাকর কিছু বলিবার পূর্বে ভৈরব দত্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কেন চাটুয্যে মশায়, আমরা তো সেদিন খুবই খুশি হয়েছিলাম।'

ভৈরবচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ অকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জ্যে বলিল, "তোমরা ?—না তুমি ?"

নিজের সহিত আর কাহাদের নাম যোগ করিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া ভৈরব বলিল আমি তো নিশ্চয় খুশি হয়েছিলাম।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জ্যে বলিল, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র হে ভৈরব আমি সাধারণ লোকের কথা বলছি। কন্যা দায়ের উৎকট দুশ্চিন্তায় যার বোধ শক্তি আচ্ছন্ন আমি তাকে সাধারণ লোক বলি নে।"

এই তাড়নার মধ্যে যে গুপ্ত হুলটুকু বর্তমান ছিল তাহা বুঝিতে শুধু ভৈরবেরই নহে, অনেকেরই বিলম্ব হইল না। উত্তর দিলে পাছে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জ্যে অধিকতর নিষ্ঠুর অপমান করিবার সুযোগ পায় সেই ভয়ে সে চুপ করিয়া গেল।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জ্যে বলিতে লাগিল, "ভৈরব যা বলছিল এক হিসেবে তা অবশ্য নিতান্ত অন্যায় কথাও নয়। সেদিন খুবই একটা নতুন ব্যাপার দেখা গেল বলতে হবে। সে হিসেবে খুশি হওয়া একেবারে যে চলে না তা বলতে পারি নে। তোমাদের বাড়িতে ম্যাজিস্ট্রেট আসা এই প্রথম নয় বাবাজি। চাকরি নিয়ে বিদেশে থাকতাম, তবু আমি নিজেই কোন-না বার তিন-চার দেখেছি। শুনেছি পালংঘাটার বিলে পাখী শিকার করতে এসে একবার না-কি কোন্ লাট সাহেবও তোমাদের কানাইডাঙার কাছারিতে ছাউনি করেছিল। তখনকার দিনে এ সব ব্যাপারে কর্তারা অগ্রণী হয়ে কাজ কারবার করতেন, দরকার হলে মদদ দেবার জন্যে এস্টেটের উকিলরা পিছনে পিছনে থাকতেন। কোনও বারের দরবারে নাচ-গান আমোদ প্রমোদ সমারোহ থাকলে বউঝিদের নিয়ে জমিদার গিন্নীরা পুরু পর্দার আড়ালে এসে বসতেন। তাঁদের মুখদর্শন করতে হলে মেমসাহেবদের অন্দর মহলে ঢুকতে হতো। সে সব ছিল এক রকমের ব্যাপার, আর এ দেখলাম অবশ্য অন্য রকমের।"

দিবাকর বলিল, "জগৎ পরিবর্তনশীল, বেঁচে থাকলে এমন সব পরিবর্তন দেখতেই হয়। সুতরাং এরকম আক্ষেপের কোনও কারণ নেই। আসল আক্ষেপের কথা এই হচ্ছে যে, জগতের পরিবর্তন হয়, কিন্তু সে পরিবর্তনের হিসেবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় না।"

'আমাদের' শব্দটি প্রয়োগের ছলে দিবাকর যে বিশেষ করিয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিল তাহা উপলব্ধি করিতে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জ্যের বিলম্ব হইল না। আঘাতটা সুদ-

সুদ্ধ ফিরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে বলিল, "কিন্তু সে পরিবর্তনের ফলে পুরুষেরা যদি তাদের চিরদিনের জায়গা থেকে হটে গিয়ে মেয়েদের বাঁ পাশে এসে দাঁড়ায় তা হলে আক্ষেপের কথা হয় দিবাকর।" পাছে আঘাতটা ষোলো আনা গ্রহণ করিতে দিবাকর কোনও প্রকারে ভুল করিয়া বসে সেইজন্য মনে করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "অবশ্য তোমার কথা যে স্বতন্ত্র কথা সে কথা পূর্বেই বলেছি।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; অনুচ্ছ্বসিত শান্ত কণ্ঠে সে বলিল, "আমার কথা স্বতন্ত্র, এ কথা বার বার বলে অর্থকে আপনি অন্যায়ভাবে মর্যাদা দিচ্ছেন জেঠামশায়। অর্থের জোরে বিদ্যাকে উপেক্ষা করা যায় না, আমাদের সামান্য যা অর্থ আছে তার দ্বারা তো কিছুতেই যায় না। পুরুষেরা ক্রমশ যদি মেয়েদের বাঁ দিকে যেতে আরম্ভই করে তা হ'লে তার জন্যে বৃথা আক্ষেপ না করে তার প্রতিকারের উপায় করাই বোধ হয় ভাল। কিন্তু তাই বলে মেয়েদের জোর করে পুরুষদের বাঁ দিকে আটকে রেখে নয়।" তাহার পর তক্তাপোশ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেলা বাড়ছে, এখন তা হলে আসি।"

দিবাকরের সহিত সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "এস। যদি কোন অন্যায় কথা বলে থাকি কিছু মনে করো না বাবাজি।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথায় হাসিয়া ফেলিয়া দিবাকর বলিল, "অন্যায় কথা বলে থাকলেও কিছু মনে করব না জেঠামশায়? তা হ'লে কিসে মনে করব বলুন?"

তাহার কপট সহৃদয়তার প্রকাশ হইতে উদ্ভূত এই অপ্রত্যাশিত কূট প্রশ্নের উত্তরে কী বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে চুপ করিয়া রহিল।

কুকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দিবাকর তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিল; তাহার পর চেন ধরিয়া অল্প একটু টান দিতেই কুকুরটা একবার বদ্ধ গভীর স্বরে গর্জন করিয়া উঠিল। এ গর্জনের অর্থ যে প্রতিবাদ অথবা ক্রোধ নহে, পরন্তু প্রভুর আহ্বান-সঙ্কেতের উত্তরে সানন্দ উৎসাহ জ্ঞাপন দিবাকর তাহা নিঃসন্দেহেই জানে, তথাপি পশুপতি ঘোষালের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "কোনও অপরাধ করি নি জেঠামশায়, তবু টবির অন্যায় রাগ দেখুন।"

দিবাকরের মন্তব্যে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; হাসিল না শুধু ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে। তাহার উচ্চারিত 'অন্যায় কথা' এবং দিবাকরের উচ্চারিত 'অন্যায় রাগে'র সূত্র ধরিয়া টবির সহিত নিজেকে কোনরূপে জড়িত করিয়া সে ক্রুদ্ধ হইল কি-না তাহা সে-ই বলিতে পারে।

পশুপতি ঘোষাল বলিল, "তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল বাবাজি, কিন্তু টবির রাগ দেখে সাহস পাচ্ছি নে।"

দিবাকর বলিল, "টবি ভদ্রলোক চেনে, আপনাকে কিছু বলত না। কিন্তু দরকার নেই জেঠামশায়, আপনি বসুন।"

পথে বাহির হইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা মনে করিয়া দিবাকর ঈষৎ দুঃখিতই হইল। প্রকাশ্যে না হইলেও টবির প্রসঙ্গের ইঙ্গিতে সে তাহাকে একটু অপমানিত করিয়াই আসিয়াছে। অথচ অপরাধ তাহার কোথায়? সৌজন্যবশত অপরে যে কথা চাপিয়া গিয়াছে, পৈতৃক বিদ্বেষের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে না হয় তাহা খুলিয়াই বলিয়াছে, কিন্তু যাহা বলিয়াছে তাহা তো মিথ্যা নহে। যূথিকার দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে দিবাকর যে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্কুল প্রতিষ্ঠার দিবসেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মনে পড়িয়া গেল, তারিণী বরাটের আয়ুর্বেদীয় সূত্রের ছাঁচে ঢালা শ্লোক,—দুর্বলে সবলা নারী সা নারী মানঘাতিকা। অথচ, এই মানঘাতিকা নারী তাহার স্ত্রী, তাহার অর্ধাঙ্গিনী, অবিচ্ছেদ্য, অপরিত্যাজ্য যূথিকা,—যাহাকে সে ভালোবাসিয়াছে এবং সম্ভবত সে তাহাকেও ভালোবাসিয়াছে। দিবাকরের অস্থি মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া যে বস্তু অদৃশ্য ছিল, যাহাকে অহমই বলো অথবা অহমিকাই বলো, যাহা কোনও আকারের পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না, কোনও প্রকারের হীনতা সহ্য করিতে পারে না, সেই তাহার দুর্মদ পৌরুষ ভিতরে পীড়িত হইতে লাগিল।

গৃহে পৌঁছিয়া টবিকে তাহার পরিচারকের জিম্মায় লাগাইয়া দিয়া দিবাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। সুনীথ, নিশাকর অথবা যূথিকার মধ্যে কাহাকেও নিচে না দেখিয়া দ্বিতলে উপনীত হইয়া দেখিল, অদূরে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া সুনীথ একটা বই পড়িয়া শুনাইতেছে এবং সম্মুখে আর একটা চেয়ারে বসিয়া যূথিকা তদ্গতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছে। মধ্যে একটা গোল টেবিলের উপর সুনীথের উপহার দেওয়া লাল চামড়ায় বাঁধানো পাঁচ ছয়খানা বই ইতস্তত পড়িয়া আছে। সুতরাং যে বই হইতে সুনীথ পড়িয়া শুনাইতেছে, বুঝা গেল, সেটা উপহৃত গ্রন্থাবলীর অন্তর্গতই দর্শনশাস্ত্রের বই। পাঠে এবং শ্রবণে উভয়ে এত নিবিষ্ট যে, দিবাকরকে কেহ লক্ষ্যও করিল না।

মুহূর্তের জন্য দিবাকর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর যে পথে আসিয়াছিল অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই পথে ফিরিয়া গেল।

পূর্বাহ্লিক জমিদারী আপিস তখনও চলিতেছিল। সেরেস্তায় আসিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দিবাকর সদর নায়েব মধুসূদন ঘোষালের নিকট হইতে চলতি সালের কড়চা বহি এবং খতিয়ান তলব করিয়া পাঠাইল।

বাইশ

পরদিন নিশাকর এবং সুনীথ উভয়ের একত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার কথা। তেসরা জানুয়ারী নিশাকরের কলেজ খুলিয়াছে, ইতিমধ্যেই কামাই হইয়া গিয়াছে তিন দিন; সুতরাং তাহাকে আর থাকিবার জন্য কেহ বলিল না। এমন কি, প্রসন্নময়ীও মাত্র একবার অনুরোধ করিয়াই নিরস্ত হইলেন।

সুনীথকে কিন্তু দিবাকর কিছুতেই নিশাকরের সহিত যাইতে দিল না, বহুতর অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা তাহাকে আরও কয়েকদিনের জন্য আটকাইয়া রাখিল। যূথিকাকে লইয়া সম্প্রতি তাহার মনের মধ্যে যে বিক্ষোভ জাগ্রত হইবার উপক্রম করিয়াছে, সে দিক হইতে বিবেচনা করিলে দিবাকরের প্রকৃতির মধ্যে এমন কোন উপকরণ হয়তো আছে, যাহার জন্য সাধারণ লোকে সচরাচর এ অবস্থায় যাহা করিত সে ঠিক তাহার বিপরীত করিতে সমর্থ হইল।

স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে অবশ্য অবসর ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে অবসর প্রথম দেখা দিয়াছে তখন হইতেই সুনীথ এবং যূথিকা বহুবার সাধারণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে কথায় কথায়, কখনও ইংরেজী সাহিত্যের সূত্র ধরিয়া, কখনও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া জ্ঞান এবং বিদ্যার যে সমুন্নত পরিবেশ রচিত করিয়াছে, তন্মধ্যে দিবাকর পাঁচ মিনিটও তিষ্ঠিতে পারে নাই। যেখানে তাহার প্রতিষ্ঠা অবিদ্যমান, যে ভূমির উপর তাহার স্থিতি প্রয়োজন অথবা অধিকারের দ্বারা সমর্থিত নহে, যেখানে তাহার উপস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে বিস্মৃত হইবার আশঙ্কা আছে,—অযথা সেখানে টিঁকিয়া থাকিবার মতো তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা নাই, দুর্বলতাও নাই। তাই অলক্ষিতে সে উঠিয়া গিয়াছে, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কদাচ অনুযোগ অথবা প্রতিবাদ করে নাই। দুঃখ যদি হইয়া থাকে তো নিজের অক্ষমতা স্মরণ করিয়াই হইয়াছে এবং অভিমান যদি করিয়া থাকে তো স্বীয় অদৃষ্টের প্রতিই করিয়াছে। কিন্তু যে বস্তু যূথিকাকে সে নিজে দিতে পারিতেছে না, সুনীথকে ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে প্রতিরোধক না হইলে প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তু হইতে যূথিকাকে বঞ্চিত করাই হইবে, হয়তো মনের মধ্যে এইরূপ একটা কোনও চেতনা বহন করিয়াই সে নিশাকরের সহিত সুনীথকে যাইতে দিল না।

তাই রাত্রে তাহাকে একান্তে পাইয়া যূথিকা যখন বলিল, "অত পীড়াপীড়ি করে সুনীথদাদাকে আটকালে কেন?" দিবাকর বলিল, "তোমার জন্যে।"

বিস্মিত হইয়া যূথিকা বলিল, "আমার জন্যে? আমার জন্যে কেন?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "সে কথা বললে হয়তো আমাকে তুমি ভুল বুঝবে যূথিকা।"

যূথিকা বলিল, "ভুল যদি না বোঝাও তা হ'লে ভুল বুঝব কেন? বল কী জন্যে?"

"একটা উপমার সাহায্যে বলব ?"

"তাতে যদি সুবিধে হয় তো তাই না-হয় বলো।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া দিবাকর বলিল, "তোমাকে যদি পদ্ম বলা যায়, তা হ'লে সুনীথদাদা সূর্য। আমিও অবশ্য সূর্য। কিন্তু সে শুধু নামে; আসলে আমি চন্দ্র।"

"এ কথার মানে কী ?"

"এ কথার মানে সূর্য, যেমন পদ্মকে বিকশিত করে, সুনীথদাদার কাছে তুমি তেমনই বিকশিত হও। সুনীথদাদার সঙ্গে যখনই তোমাকে লেখাপড়ার চর্চায় রত দেখেছি, প্রতিবারই আমার এই উপমার কথা মনে হয়েছে। সুনীথদাদা তোমাকে ফোটাতে জানেন। কিন্তু তাই বলে তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই যূথিকা। যদি কোনও অভিযোগ থাকে তো নিজের প্রতি তা আছে।

যূথিকা বলিল, সে তোমার মহত্ত্ব। কিন্তু তোমার নিজের উপমা দিয়েই একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি যদি চন্দ্রই হও, তা হ'লে কখনও কি আমাকে কুমুদের মতো তোমার কাছে ফুটতে দেখ নি ? আমাকে ফোটাতে তো অনেকেই অনেক রকমে পারে। লেখাপড়ার চর্চা দিয়ে সুনীথদাদা যেমন পারেন, ধর, বাজি দেখিয়ে তেমনি একজন বাজিকরও হয়তো পারে। তাই বলে কি একজন বাজিকরকে আমার কাছে আটকে রাখবে তুমি ?"

দিবাকর বলিল, "কিন্তু একজন বিদ্বান আর একজন বাজিকরের কথা এক নয় যূথিকা। যে মানুষ বাজিকর নয়, বাজিকর না হওয়া'র জন্যে তার বিশেষ কোনও বিশেষণ নেই, কোনো বিশেষ অখ্যাতি নেই তার সে জন্যে। কিন্তু বিদ্বান যে নয়, তার বিশেষণ হচ্ছে মূর্খ, মূর্খ বলে তার বিশেষ একটা অখ্যাতি আছে। বলো সত্যি কি না ?"

"তা হয়তো সত্যি—কিন্তু তুমি মূর্খ নও।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এ তোমার বিচারবুদ্ধির কথা নয় যূথিকা, এ নিতান্তই পতিভক্তির কথা। সংসারে অনেক জিনিসই আপেক্ষিক। সেদিন ট্রেনে যতক্ষণ কথা কও নি তুমি, ততক্ষণ ইংরিজি ভাষা না জানা সেই পশ্চিমা ভদ্রলোকটি আমাকে হয়তো ইংরিজি ভাষায় পণ্ডিত বলেই মনে করছিল। তুমি কথা কওয়ার পর কিন্তু ইংরিজি ভাষা না জানা সত্ত্বেও সে বুঝতে পেরেছিল তোমার তুলনায় আমি মূর্খ। আমার তুলনায় আমাদের বাজার সরকার বেণীমাধব হয়তো মূর্খ; কিন্তু তোমার তুলনায় আমি যে মূর্খ, বেণী মাধবকে জিজ্ঞাসা করলে সে-ও সে কথা বলবে।"

যূথিকা বলিল, "তর্কে কোনও দিন তোমাকে হারাতে পারি নি, তর্ক থাক। কিন্তু সুনীথদাদাকে তুমি আটকে রেখো না। কালই যাতে তিনি কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন সে ব্যবস্থা করো।"

"সে ব্যবস্থা করতে হলে প্রথমে আমাদের দিক থেকেই তাঁর যাবার কথা

তুলতে হয়। কিন্তু আজ তাঁকে চার পাঁচ দিন থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে আটকে রেখে কাল সকালে উঠে যদি বলি 'আজই' যাও তাহলে তিনি কি আমাকে শুধু অব্যবস্থিতচিত্ত বলেই মনে করবেন না ?"

"তা আমি জানি নে ; কিন্তু আমার জন্যে তাঁর থাকবার একটুও দরকার নেই।"

"কিন্তু আমার জন্যে হয়তো একটু আছে।"

"কী তোমার দরকার ?"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "সুনীথদাদাকে অবলম্বন করে আত্মদর্শনের একটু সুযোগ পাই আমি। তোমার পাশে সুনীথদাদা যখন থাকেন তখন তোমাকে দেখে বুঝতে পারি, কী হওয়া আমার উচিত ছিল। কী হওয়া আমার উচিত, সে কথা ভাববার দুঃসাহস অবশ্য ঠিক পাই নে।"

এ কথার উত্তরে কোনও কথা না বলিয়া যূথিকা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দিবাকর বলিল, "আমার উপর রাগ করছ যূথিকা ?"

শান্ত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "না নিজের অদৃষ্টের উপর করছি।"

সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল, "অদৃষ্ট তোমাকে মূর্খ স্বামী জুটিয়ে দিয়েছে বলে ?"

"এ কথা কেন বলছ ? তুমি তো জানো, যদি মূর্খ স্বামী বরণ করে থাকি তো স্বেচ্ছায় জেনে শুনেই তা করেছি।"

"তবে অদৃষ্টের উপর রাগ করছ কেন ?"

"অদৃষ্ট আমাকে নিরক্ষর করে তোমার ঘরে পাঠায় নি বলে।"

"কিন্তু তা তো আমি ঠিক চাই নে যূথিকা। তোমার চেয়ে বড় না হলে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু তোমার চেয়ে ছোট হওয়ার দুঃখ আমাকে যদি পীড়ন করে, তাতে আমার অপরাধ কোথায় বলো ?"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "এ কথা আগে জানা থাকলে দুবার না-হয় ম্যাট্রিক ফেল করেই আসতাম ; পাশ করার চেয়ে ফেল করা খুব বেশি কঠিন হতো না। কিন্তু তা যখন হয় নি তখন যেটা হয়ে গেছে সেটাকে স্বীকার করে নেওয়াই জীবনকে ঠিকভাবে গ্রহণ করা নয় কি ? পদে পদে আমাদের জীবনে পরস্পরকে ক্ষমা করে স্বীকার করে নিয়ে চলতে হয় ; নইলে চলাই হয় না।"

দিবাকর বলিল, "কিন্তু তোমাকে যদি ক্ষমা করবার কিছু থাকে, তা হ'লে অনেক আগেই তা করেছি। ক্ষমা করতে পারছি নে শুধু নিজেকে।"

যূথিকা বলিল, "সেটা হচ্ছে আমাকে ক্ষমা করতে না পারারই একটা রকম-ফের। শোন, অত খুঁতখুঁতে হলে কেউ কখনও মনের মধ্যে শান্তি পায় না। শুচিবাইদের দ্বারা কেউ কোনও দিন শুচি হতে পারে নি, শুধু মানসিক অশান্তিই ভোগ করেছে। আমাদের লাহোরে গিরিবালা নামে একজন স্ত্রীলোক

ছিল, দুশোবার কুলকুচো করেও তার মুখ পরিষ্কার হতো না। তখন সে দাঁতের গোড়া থেকে খাবারের কাল্পনিক কুচি বার করবার জন্যে খড়কে দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে রক্তপাত না করে ছাড়ত না। চলতি হিসেবে অনেক আগেই তার মুখ পরিষ্কার হতো; কিন্তু আমার বিশ্বাস রক্তপাতের পরও গিরিবালার মন পরিষ্কার হতো না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "আমার কথা আর গিরিবালার কথার মধ্যে প্রভেদ আছে যূথিকা। গিরিবালার রক্তপাত গিরিবালা নিজে করত; কিন্তু আমার রক্তপাত করবার জন্যে আমি একলাই নেই,—ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে আছে, তারিণী বরাট আছে, এমন কি শিবনাথ চৌধুরীও অজ্ঞাতসারে অল্পস্বল্প আছেন। আমাকে দিয়ে তোমার নিমন্ত্রণ পাকা করিয়ে নিয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে শিবনাথ প্রথমে ভুলে যান। পরে বলেন—বলা বাহুল্য, আপনিও মিসেস ব্যানার্জ্জির সঙ্গে যাবেন। তারিণী কবিরাজ আমার বিষয়ে শ্লোক আউড়ে বলে—দুর্বলে সবলা নারী সা নারী মানঘাতিকা। এর মানে কী জানো?"

কোনও উত্তর না দিয়া যূথিকা চুপ করিয়া রহিল।

দিবাকর বলিল, "এর মানে ম্যাট্রিক ফেল করা পুরুষের সঙ্গে এম. এ.-পাশ করা স্ত্রীলোকের বিয়ে হলে সে স্ত্রীলোক পুরুষের পক্ষে মানঘাতিকা হয়। কারণ বিদ্যার ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক-ফেল-করা পুরুষ দুর্বল, আর এম. এ.-পাশ করা মেয়ে সবল। আমাদের গ্রামের একজন মাতব্বর অধিবাসী ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে কী বলে জানো? সে বলে—সেদিন সভায় তুমি ইংরিজীতে বক্তৃতা করায় আর আমি মুখ বুজে নিঃশব্দে বসে থাকায়, ব্যাপারটা মনসাগাছার সকল অধিবাসীদের পক্ষে মানঘাতক হয়েছিল।"

যূথিকা বলিল, "এ সব কথা কে বললে তোমাকে?"

"পরের মুখে শোনা কথা নয়। ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে আর তারিণী বরাটের মুখ থেকে স্বকর্ণে শুনেছি।"

ঈষৎ বিস্মিত এবং কৌতূহলী হইয়া যূথিকা বলিল, "কবে বললে?"

"কাল সকালে।"

'কেন, বলবার কী কারণ হয়েছিল?"

পূর্বদিবসে পশুপতি ঘোষালের গৃহে যে আলোচনা হইয়াছিল, দিবাকর সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিল।

সকল কথা শুনিয়া যূথিকা বলিল, "এ সব কথার উত্তর দাও নি তুমি তাদের?"

"যথাসাধ্য দিয়েছিলাম. কিন্তু আমার বিশ্বাস সে উত্তর সম্পূর্ণ উত্তর হয় নি।"

"কেন?"

একটু চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, বোধ হয় সম্পূর্ণ উত্তর খুঁজে পাই নি।"

যূথিকা বলিল, "আমি কিন্তু খুঁজে পেয়েছিলাম, আর সে উত্তর যাকে দিয়েছিলাম প্রত্যুত্তরে একটি কথাও সে খুঁজে পায় নি।

পরম বিস্ময়ে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল "কে সে?"

"লাহোরের একটি বাঙালী মেয়ে আমার বন্ধু! সেও এম. এ. পাশ।"

"কী উত্তর তাকে দিয়েছিলে? কী জিজ্ঞাসা করেছিল সে তোমাকে?"

"সে কথা বললে আজ তুমি বিশ্বাস করবে না। যদি কখনও তোমার বিশ্বাস করবার মতো মন হয়, আর তখনও যদি তোমার কৌতূহল থাকে তা হ'লে বলব, আজ রাত হয়েছে শোবে এস।"—বলিয়া যূথিকা শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিল।

তেইশ

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর যূথিকা দেখিল অপর দিকে পাশ ফিরিয়া দিবাকর তখনও নিদ্রা যাইতেছে। যাহাতে সে জাগিয়া না উঠে সেইজন্য সন্তর্পণে লেপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া লেপটা তাহার অঙ্গে ভালো করিয়া ঢাকিয়া ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

সূর্য উঠিতে তখনও বিলম্ব ছিল, তাহার অগ্রদূত একটা স্তিমিত উদাস আলোক ঘনকুজ্ঝটিকামণ্ডিত ধরণীর অঙ্গে ধূসরবর্ণের প্রলেপ মাখাইয়া একটা যেন বৈরাগ্যমধুর মায়ালোক সৃষ্টি করিয়াছে। যূথিকা তাহার অন্তরের মধ্যেও এই রকমই একটা শান্ত উদাস অবকাশ অনুভব করিল, যেখানে বাহিরের এই আঁধার এবং আলোকের মতোই দুঃখ সুখের জড়িত হিল্লোল; দুঃখ যেখানে সুখের ঠিক প্রতিপক্ষ নহে, বেদনা যেখানে আনন্দেরই কতকটা প্রতিপোষক। বহু পূর্বে পঠিত কোন ইংরেজী কবিতার দুইটা পংক্তি মনে পড়িয়া গেল—

The purest gold most needs alloy,
And sorrow is the nurse of joy.

গত রাতে দিবাকরের সহিত বিতর্ককালে মনের কিন্তু ঠিক এইরূপ উদার উদাস অবস্থা ছিল না। তখন দুঃখকে একমাত্র দুঃখেরই আশ্রয় বলিয়া মনে হইতেছিল এবং বেদনার মধ্যে বেদনা ছাড়া অপর কোন বস্তুর সংস্রব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আজ হিমধবল বিষণ্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা দৃষ্টি যেন খুলিয়া গেল; মনে হইল দুঃখ না থাকিলে করুণা থাকিত কোথায়, আঘাত না থাকিলে চিত্তভূমি কর্ষিত হইত কিসের দ্বারা, বেদনা না থাকিলে সমবেদনাই বা আসিত কাহার হাত ধরিয়া। একটা সরস সুমধুর ক্ষমাশীলতা এবং সহনশীলতার আনন্দে অন্তরের সমস্ত রিক্ততা ভরিয়া উঠিল। দুঃখ হইল লঘু এবং চিত্ত হইল তরল। মনে পড়িল ইংরেজ কবির আশ্বাসময়ী বাণী—

The purest gold most needs alloy,
And sorrow is the nurse of joy.

জমিদার পুরী তখনও ভালো করিয়া জাগ্রত হয় নাই, সবেমাত্র আড়া মোড়া ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। সদর দেউড়িতে কিশোরী চৌবের ভজনগীতি এবং অন্দর মহলে আনন্দ পরিচারিকার কাশির শব্দ ভিন্ন জাগরণের আর বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আপন মনের গভীর প্রদেশে নিমজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যূথিকা নিচে নামিয়া আসিল।

স্নানাগারের প্রবেশ করিবার সময় দেখা হইল আনন্দের সহিত।

যূথিকার প্রত্যুষে স্নান করিবার অভ্যাস আনন্দ তাহা জানে। কিন্তু এত বেশি প্রত্যুষে তাহাকে স্নানঘরে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনই স্নান করবেন না-কি বউরাণী মা?"

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ।"

'এত সকালে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করিয়া যূথিকা বলিল, "কৈলাস জল ভরেছে আনন্দ?"

"হ্যাঁ বউরাণী মা, একটু আগে ভরে দিয়েছে।"

স্নানঘরে প্রবেশ করিয়া যূথিকা দ্বার লাগাইতে উদ্যত হইলে আনন্দ বলিল, "তেল মাখিয়ে দিই তা হ'লে বউরাণী-মা?"

যূথিকা বলিল, "থাক, আমি নিজেই মেখে নেব।"

কুণ্ঠিত স্বরে আনন্দ বলিল, "কষ্ট হবে আপনার।"

"না হবে না"—বলিয়া যূথিকা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

মনসাগাছা বাঁড়ুজ্জে-বংশের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত রাখার সঙ্কল্পে যে সকল রীতি সুচিরকাল হইতে প্রচলিত আছে তদনুযায়ী প্রধানা পরস্ত্রীগণের প্রত্যেকের একটি করিয়া খাস পরিচারিকা থাকে, যাহাদের বিবিধ কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হইতেছে স্নানের পূর্বে নিজ নিজ কর্ত্রীদের অঙ্গে তৈল মাখাইয়া দেওয়া। নিজের দেহে নিজে তৈল মাখিয়া লওয়া বাঁড়ুজ্জেদের বিবেচনায় নিতান্ত মামুলি চালের পরিচায়ক, সুতরাং তাহার দ্বারা অভিজাত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

জমিদার গৃহে প্রবেশের দিন হইতে এ পর্যন্ত যূথিকা হয়তো কতকটা অনিচ্ছারই সহিত উক্ত নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আজ কিন্তু সহসা ইহার ব্যতিক্রম কেন করিয়া বসিল, তাহার হিসাব তাহার নিজের কাছেও স্পষ্ট নহে। বর্তমানের লীলাবিহীন জীবন ছন্দ অলক্ষিতে অগোচরে একটা যে পরিবর্তিত ছন্দের মধ্যে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে, হয়তো ইহা তাহারই একটা অভিব্যক্তি, যে অবস্থার মধ্যে, যে পরিবেশের ভিতর তাহার আত্মা গ্লানিবোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, হয়তো তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই ইহা একটা ভঙ্গি।

দিবাকরের প্রপিতামহ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহে মন্দির নির্মাণপূর্বক গোবিন্দমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তদবধি নিত্য জমিদার ভবনে ষোড়শোপচারে বিগ্রহসেবা চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান কালে কুলপুরোহিত বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থ প্রতিদিন পূজা করিয়া যান।

মন্দিরের পিছন দিকে অন্দর মহলের অন্তর্গত একটা ঘরে পূজার উপচারাদি প্রস্তুত হয়। সেই ঘর হইতে মন্দিরে যাতায়াত করিবার দ্বার আছে। আধ ঘণ্টাটাক পরে স্নানান্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া যূথিকা দেখিল পরিচারকেরা যথারীতি কক্ষতল ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছে। যে আলমারিতে পূজার উপকরণাদি থাকে তাহাতে তখনও তালা লাগানো, প্রসন্নময়ী আসিয়া তালা খুলিবেন।

অনতিবিলম্বে দুইজন মালী চারিটা বড় বড় সাজি ভরিয়া প্রচুর ফুল লইয়া উপস্থিত হইল। যূথিকাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাজি রাখিয়া অবনত হইয়া উভয়ে অভিবাদন করিল।

যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "গোলাপ কত এনেছ বিপিন?"

জন আষ্টেক মালীর মধ্যে বিপিন সর্বপ্রধান মালী। নম্রকণ্ঠে সে বলিল, "আজ্ঞে বউরাণী-মা, গোটা চল্লিশ হবে।"

"চন্দ্রমল্লিকা?"

"চন্দ্রমল্লিকা গোটা দশেক হবে।"

"আমাদের জন্যে গোলাপ কী রকম রেখেছ?"

একটু চিন্তা করিয়া বিপিন বলিল, "হুজুরের টেবিলের জন্যে গোটা পঁচিশেক বড় হুজুরের টেবিলে গোটা কুড়িক, আর চাটুজ্জে মশায়ের টেবিলেও গোটা কুড়িক।"

"চন্দ্রমল্লিকা কী রকম দেবে।"

"হুজুরের টেবিলে গোটা পাঁচেক আর ওনাদের দুজনের টেবিলে গোটা চারেক করে।"

"আচ্ছা, ওঁদের টেবিলে ঐ রকমই দিয়ো,—আর আমার টেবিলে দিয়ো অন্য ফুল। আর যে গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকা আমার টেবিলে দিতে তা এখানে দিয়ে যাও।"

এক মুহূর্তে চিন্তা করিয়া বিপিন বলিল, "এখানে আরও গোটা পঁচিশ গোলাপ আর গোটা পাঁচেক চন্দ্রমল্লিকা দিতে পারি। ফুল অনেক আছে বউরাণী-মা।"

যূথিকা বলিল, "না, আমার টেবিলে গোলাপ কিংবা চন্দ্রমল্লিকা কিছুই দিয়ো না,—একটাও নয়।"

"কাল থেকে?"

"যতদিন না অন্যরকম বলি, এই নিয়মে চলবে।"

"যে আজ্ঞে, তাই হবে।" বলিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া বিপিন এবং অপর মালী প্রস্থান করিল।

গোলাপ এবং ক্রিসান্থিমাম উভয় পুষ্পই যে যূথিকার যৎপরোনাস্তি আদরের সামগ্রী, সে কথা বিপিন ভালো করিয়াই জানিত। সুতরাং যূথিকার আদেশ শুনিয়া বেশ খানিকটা বিস্মিত হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, বড়লোকের খেয়াল কখন কোন খাতে বয় তা কেউ বলতে পারে না।

মিনিট দশেকের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা সাজিতে গোলাপ এবং চন্দ্রমল্লিকা লইয়া বিপিন প্রবেশ করিল।

সাজিটা ভূমিতে স্থাপন করিয়া সে বলিল, "এই সাজিতেই এ ফুলগুলো আলাদা রইল বউরাণী মা!"

যূথিকা বলিল, "তাই থাক।"

পুনর্বার নত হইয়া প্রণাম করিয়া বিপিন চলিয়া গেল।

বিপিন প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিলেন প্রসন্নময়ী!

যূথিকাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি এখানে এত সকালে? আর এ বেশে?"

যূথিকার পরিধানে গরদের শাড়ি, পদদ্বয় নগ্ন, কেশ আলুলায়িত এবং দেহের কোন স্থানে পাউডার স্নো অথবা অপর কোন প্রসাধন দ্রব্যের চিহ্নমাত্রই নাই!

মৃদু হাসিয়া ঈষৎ কুণ্ঠা সহকারে যূথিকা বলিল, "আমাকে আপনার দেবসেবার কাজে ভর্তি করে নিন পিসিমা।"

যূথিকার কথা শুনিয়া নিরতিশয় বিস্ময়ে প্রসন্নময়ী বলিলেন, "বল কি বউমা? দেবসেবার কাজে?"

"হ্যাঁ, গোবিন্দজীর সেবায়।"

এ কথায় অবশ্য প্রসন্নময়ী আনন্দিত হইলেন যথেষ্ট; কিন্তু বিস্ময় সে আনন্দকেও ছাপাইয়া রহিল। সহাস্যমুখে বলিলেন, "এ খেয়াল হঠাৎ তোমার কেন হলো বউমা?"

কোনও উত্তর না দিয়ে যূথিকা চুপ করিয়া রহিল।

উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ভগবান তোমাকে ডাক দিয়েছেন, বাধা দিয়ে অপরাধী হতে চাই নে; কিন্তু সময় তো তোমার সমস্তই পড়ে রয়েছে মা, এর জন্যে এমন কিছু তাড়া ছিল না। এই তো সবেমাত্র সংসারে ঢুকেছ; এখন হাসবে খেলবে, সংসারধর্ম পালন করবে, স্বামীসেবা করবে, তা হলেই ভগবানের সেবা করা হবে। তারপর ক্রমশ যখন তোমার ছেলেপিলে বউ-ঝিরা সংসারের ভার বেঁটে নিতে থাকবে, তখন তো ভগবান নিজেই তোমার হাত দিয়ে সেবা নিতে আরম্ভ করবেন। দিবাকরের মত নিয়েছ?"

"না।"

"নেওয়া উচিত ছিল।"

"কিন্তু পিসিমা এ তো এমন কাজ নয়, যাতে তাঁর অমত হওয়া চলে।"

যূথিকার কথায় মৃদু হাসিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "না এ কাজে অমত হওয়া সহজে চলে না, কিন্তু অমত হলে আবার এ কাজ করাও চলে না। সেই জন্যই তো সাধু লোকেরা সংসার আশ্রমকে সকলের চেয়ে কঠিন আশ্রম বলেছেন। এ আশ্রমে দেবতার সেবা করলেই যে দেবতা প্রসন্ন হবেন, এমন কথা নেই। অনেক হিসেব করে তবে দেবতাকে প্রসন্ন করতে হয়।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "তিনি যদি একান্তই অমত করেন, তা হলে না হয় পরে আর করব না।"

"তা ছাড়া, উপস্থিত সুনীথ এখানে রয়েছে। তাকে দেখা-শোনা, চা খাওয়ানো—এ সব কাজ তোমার রয়েছে বউমা।"

যূথিকা বলিল, "এর জন্যে সে-সব কাজ আটকাবে না পিসিমা—এ কাজে আর কত সময় লাগবে? ভোলা সবই জানে; আনন্দকে দিয়ে ভোলাকে আমি বলে পাঠিয়েছি যে, চা খাওয়ার সময়ে আমি হাজির থাকতে পারব না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া প্রসন্নময়ী বুঝিলেন যে, তাহাকে নিরস্ত করা সহজ হইবে না, সুতরাং আর অধিক আপত্তি করিয়া ফল নাই। দৃষ্টি পড়িল পঞ্চম সাজিটার উপর। প্রত্যহ নিয়মিত চারখানা সাজিতে ফুল আসে; আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার জন্য যূথিকাই দায়ী। যূথিকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট সাজির ফুল তুমি আনিয়েছ বউমা?"

নিঃশব্দ মৃদু হাস্যের দ্বারা যূথিকা জানাইল, সে-ই আনাইয়াছে! এ ফুল যে তাহারই অংশের ফুল, যাহা হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিল না।

খুশি হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "তবে তো দেবসেবা তোমার আরম্ভই হয়ে গেছে বউমা। যে গাছের ফুলে দেবতাদের পুজো হয়, ভুলেও যদি কেউ সে গাছে এক ঘটি জল ঢালে, তাতেও তার দেবসেবার কিছু পুণ্য হয়।" এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে ভালোই হয়েছে, তুমি আজ গোবিন্দজীর গলার মালা গাঁথো।"

চকিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আমি।"

"হ্যাঁ, তুমিই। বুঝতে পারছ না, আজ গোবিন্দজী তোমার হাতের মালাই চেয়েছেন। যে ফুল আনিয়েছ, পারো তো তাইতেই মালা শেষ করো। একান্ত যদি আর কিছু দরকার হয় তা হ'লে অন্য সাজি থেকে নিয়ো। তুলসীপাতার একটি স্তবক তৈরী করে মালার ধুকধুকিতে জুড়ে দিয়ো। তুলসীপাতা বিষ্ণুর প্রিয় জিনিস।"

কুণ্ঠিতস্বরে যূথিকা বলিল, "কিন্তু পিসিমা, গোবিন্দজীর মালা কী করে গাঁথতে হয়, আমি তো তা জানি নে।"

সহাস্যমুখে প্রসন্নময়ী বলিলেন, "যে মালা তুমি গাঁথবে, সেই মালাই গোবিন্দজী প্রসন্ন হয়ে গলায় নেবেন। ভয় নেই তোমার।"

ইতিমধ্যে মানদা নামে একজন অল্পবয়স্কা বিধবা পল্লীরমণী উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "আজ বউমা মালা গাঁথবেন মানদা, তুমি বউমাকে মালার মাপজোপ দেখিয়ে দাও, আমি ততক্ষণ ভাঁড়ারটা দিয়ে আসি।" বলিয়া আলমারিটা খুলিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পূজার উপচারাদি প্রস্তুতকার্যে এবং ভোগরন্ধনে যে তিনজন ব্রাহ্মণ পল্লী-রমণী প্রসন্নময়ীকে নিয়মিত সাহায্য করে, মানদা তাহাদের অন্যতম। পারিশ্রমিক স্বরূপ ইহারা প্রত্যেকে প্রতিদিন একটি করিয়া সিধা এবং ভোগের অংশ পাইয়া থাকে।

যূথিকার বসিবার জন্য একটি গালিচা পাতিয়া দিয়া মানদা আলমারি হইতে ছুঁচ, রেশমী সুতোর গুলি এবং কাঁচি আনিয়া দিল। তাহার পর ফুলের সাজি এবং বড় একটা পিতলের ট্রে লইয়া আসিয়া যূথিকার নিকট স্থাপন করিয়া সুতার গুলি হইতে খানিকটা সুতা বাহির করিয়া বলিল, "এইটে ডু ফের করলেই ঠিক মাপ হবে বউরাণী-মা। আপনি কাঁচি দিয়ে কেটে নিন।"

যথানির্দেশে যূথিকা সুতা কাটিয়া লইল।

"আর কিছু চাই আপনার?"

"কিছু তুলসীপাতা।"

ইতস্তত চাহিয়া দেখিয়া মানদা বলিল, "ঐ যে চক্কোত্তি কখন্ রেখে গেছে।" তাহার পর তুলসীপত্রপূর্ণ তাম্রপাত্রটা লইয়া আসিয়া যূথিকার সম্মুখে ধরিল।

বোঁটাশুদ্ধ কয়েকটা তুলসীপাতার গুচ্ছ বাছিয়া যূথিকা বলিল, "আর আমার কিছু দরকার নেই মানদা। এখন তুমি কী করবে?"

"চন্দন বাটব।"

"আচ্ছা, বাটো গে।"

গোলাপগুলো পিতলের ট্রের উপর রঙ মিলাইয়া ভাগ করিয়া রাখিয়া যূথিকা পাঁচটা চন্দ্রমল্লিকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটা রাখিল ধুক্‌ধুকির জন্য। তাহার পর বাকি চন্দ্রমল্লিকা ও গোলাপগুলোর বর্ণানুযায়ী মনে মনে একটা পরিকল্পনা করিয়া লইয়া সে মালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইল।

চব্বিশ

ঘুম ভাঙিয়া দিবাকর দেখিল, যূথিকা পাশে নাই, অজ্ঞাতসারে কখন উঠিয়া গিয়াছে। একটু বিস্মিত হইল, কারণ এমন সে কোনও দিনই করে না। পূর্বে ঘুম ভাঙিলেও দিবাকরের ঘুম ভাঙা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিয়া থাকে কিংবা তাহাকে জাগাইয়া দেয়; তাহার পর কিছুক্ষণ তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া তবে কক্ষ পরিত্যাগ করে।

গত রজনীর কথা মনে পড়ায় মনে হইল হয়তো, সেই জন্যই যূথিকা রাগ করিয়াছে অথবা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। যে কথোপকথন উভয়ের মধ্যে হইয়াছিল তাহা মনে করিয়া সে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে লাগিল যে, তন্মধ্যে এমন কোনও কথা সে বলিয়াছিল কি-না যাহা যূথিকাকে আঘাত দিতে পারে। তেমন কোনও কথা মনে পড়িল না। মনে মনে যূথিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, গত রাত্রির আলোচনার জন্য তুমি যদি আমার প্রতি রাগ অথবা অভিমান করে থাক তা হলে ভুল করেছ যূথিকা। কাল তোমার বিরুদ্ধে আমি কোনও অনুযোগ করি নি। যে কথা তোমাকে কাল বলেছিলাম তা সম্পূর্ণ সত্য। তোমার লঘু অপরাধ বহু পূর্বে আমি ক্ষমা করেছি, কিন্তু আমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি নে। তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে তাই আমাকে না পাবার আশঙ্কায় আমার কাছে তোমার কথা প্রকাশ করতে সাহস কর নি—এ কথা আমি বুঝি। কিন্তু তোমার কথা সম্পূর্ণ করে জানবার আগে কেন ভালোবেসেছিলাম আর কেনই বা তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, আমার দিক থেকে তার কোনও কৈফিয়ৎ দেবার নেই। এ অপরাধের, এ ভুলের কোনও প্রতিকার খুঁজে পাই নে; অথচ সারা জীবন ধরে হীনতার একটা গ্লানিকর অস্তিত্ব টেনে চলার দুঃখই বা কেমন করে···

চিন্তাসূত্রে সহসা বাধা পড়িল। বারান্দায় কাহার কাশির মৃদু শব্দ শোনা গেল।

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল; "কে ?"

"আজ্ঞে হুজুর, আমি ভোলা।"

"কী বলছিস ? ভিতরে আয়।"

দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া করজোড়ে প্রণামপূর্বক ভোলা বলিল, "আজ্ঞে চাটুজ্জে মশায় মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে বসে আছেন।"

ভোলার কথা শুনিয়া লেপ ঠেলিয়া ফেলিয়া পালঙ্কের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া দিবাকর বলিল, "সর্বনাশ! কটা বাজল রে ?"

ঘরের ভিতর বৃহৎ ক্লক দীর্ঘবিলম্বিত পেণ্ডুলাম দোলাইয়া নিঃশব্দে চলিতেছিল। যেখানে ভোলা দাঁড়াইয়া ছিল, তথা হইতে একবার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিলেই

সময় দেখা যাইত ; কিন্তু 'টাইম' ধরিয়া তাহাকে কাজ করিতে হয় বলিয়া একমাত্র নিজের ঘড়ি ব্যতীত অন্য কোনও ঘড়ির উপর সে নির্ভর করে না। বাঁ হাতের কব্জি ঘুরাইয়া রিস্ট-ওয়াচ দেখিয়া বলিল, "আজ্ঞে আটটা বাজতে বাইশ মিনিট।"

পালঙ্ক ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকর বলিল, "এত বেলা হয়ে গেছে! তোর ঘড়ি ঠিক চলছে তো রে ভোলা?"

ঘড়ির নির্ভুলতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে দেখিয়া ভোলার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল, বিস্ময় চকিত কণ্ঠে বলিল, "হুজুরের দেওয়া ঘড়ি, বেঠিক চলবে কেমন করে!"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "তাও তো বটে! মনে ছিল না সে কথা।" মনে মনে বলিল, হুজুর নিজেই তো ভারি ঠিক চলছেন যে, হুজুরের দেওয়া ঘড়ি বেঠিক চলতে আপত্তি করবে।

"গোসলখানায় গরম জল দিয়েছিস?"

"সব ঠিক আছে।"

"আচ্ছা, চায়ের যোগাড় কর্‌গে, আমি আটটার মধ্যেই আসছি।"

শীতকালে দিবাকরের গৃহে বেলা আটটায় চা পানের সময়।"

ভোলা চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া দিবাকর বলিল, "বউরাণী-মা কোথায় আছেন?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভোলা বলিল, "আজ্ঞে যোগাড়-ঘরে।"

যে কক্ষে পূজোর উপাচারাদি প্রস্তুত হয় সেই ঘর বাঁড়ুজ্জে পরিবারে যোগাড়-ঘর বলিয়া খ্যাত।

বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "যোগাড় ঘরে কী করছেন?"

"মালা গাঁথছেন।"

ততোধিক বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "মালা গাঁথছেন! কিসের জন্যে মালা গাঁথছেন?"

"আজ্ঞে, গোবিন্দজীর জন্যে।"

"তবু ভালো। চা খাবার সময়ে আসবেন না?"

"আজ্ঞে বোধ হয় আসতে পারবেন না—আমাকে থাকতে বলেছেন।"

বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে দিবাকর বলিল, "তুই কোন্ দিন না থাকিস!" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, যা, আমি আসছি।"

দক্ষিণদিকের বারান্দার পূর্বপ্রান্তে চায়ের টেবিলে বসিয়া সুনীথ সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া দিবাকর তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "এরই মধ্যে কাগজ এসে গেল না-কি সুনীথদা?"

মৃদু হাসিয়া সুনীথ বলিল, "না এ কালকের কাগজ; চর্বিত চর্বণ করছি।"

দিবাকর বলিল, "তবু ভালো। আমি ভাবলাম দেরি করেছি বলে একেবারে দু'ঘণ্টাই দেরী করলাম না-কি!"

মনসাগাছায় বেলা দশটার সময়ে ডাক আসে।

প্রতিদিনই চায়ের সময়ে সকলের পূর্বে যূথিকা উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধান করে। দুই জনের চায়ের ব্যবস্থা দেখিয়া সুনীথের প্রথম খেয়াল হইল যে, যূথিকার আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সম্ভবত সে আজ আসিবে না। সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "দুজনের যোগাড় দেখছি, যূথিকা কোথায় ?"

দিবাকর বলিল, "তিনি আজ পবিত্রতার কার্যে ব্যস্ত আছেন।"

বিস্মিত হইয়া সুনীথ বলিল, "অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ মালা গাঁথছেন।"

"মালা গাঁথছেন ? কার জন্যে মালা গাঁথছেন ?"

"মর্ত্যলোকের কোনও ভাগ্যবানের জন্য নয়, স্বয়ং গোবিন্দজীর জন্যে।"

'হঠাৎ ?"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, 'ব্যাপারটা আমার পক্ষেও এতই হঠাৎ যে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমিও তাঁকে ঠিক এই প্রশ্নই করব। আপাতত এস চা পানে মন দেওয়া যাক। আজকের মেনুতে তোমার প্রিয় জিনিস নলেন গুড়ের পায়েস যোগে সরুচাকলির ব্যবস্থা আছে। কাল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছিলেন, আজ নিজে উপস্থিত থেকে খাওয়াবেন, তা আর হলো না, গোবিন্দজী বাধ সাধলেন।"

সুনীথ বলিল, "তা হ'লে এখনকার চ-পান থেকে এই প্রিয় জিনিস দুটি বাদ দিয়ে বৈকালিক চা-পানের অন্তর্গত করে আমরাও গোবিন্দজীকে আউটগোবিন্দ করি, আর শ্রীমতী যূথিকাকেও বুঝিয়ে দিই যে, প্রিয় জিনিস শুধু তৈরি করলেই প্রিয় হয় না।"

দিবাকর বলিল, "কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে সুনীথদা।"

"এই শীতে ? একটুও নষ্ট হবে না ; বরং আরও বেশি মজবে।"

চা-পানের প্রাথমিক পেয়ালা শেষ হইয়া আসিয়াছিল। আরও চায়ের জন্য স্টোভে জল চড়াইয়া দিয়া ভোলানাথ খাবার পরিবেশনে রত হইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে রেকাব পেয়ালা প্রভৃতি নামাইয়া লইয়া টেবিল ক্লথটা বদলাইয়া দিয়া চা-পানের সাজ সরঞ্জামাদি সহ ভোলা প্রস্থান করিল। প্রত্যহ চা-পানের পর দিবাকররা দক্ষিণ দিকের বারান্দায় সূর্যকরোজ্জ্ব পূর্বপ্রান্তে চা-টেবিলের ধারে বসিয়া গল্পগুজবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে। আজও সুনীথ ও দিবাকরের মধ্যে সেইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল।

কথায় কথায় যূথিকার মালা গাঁথিবার কথা পুনরায় আসিয়া পড়িল। প্রসঙ্গের মধ্যে সুনীথ এক সময়ে বলিল, "মানুষের মনে ধর্মভাব যখন বিনা-নোটিশে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়, তখন প্রায়ই দেখা যায় কোনও বাহনের উপর সাওয়ার হয়ে তা এসেছে। যূথিকার ক্ষেত্রে তেমন কোনও বাহনের ঠাওর করতে পারিস দিবা ?"

দিবাকর বলিল, "যে রকম সোঁ করে উড়ে এসে বসেছে, তাতে মনে হয়

বাহনটি পক্ষী কিংবা পক্ষিরাজ জাতেরই হবে।"

সুনীথ বলিল, "সে কথা নয়, বাহনটির কী নাম তাই জিজ্ঞাসা করছি। অবশ্য বলতে যদি কোনও আপত্তি থাকে তা হলে নিশ্চয় বলবি নে।"

দিবাকর বলিল, "তোমাকে বলতে আপত্তি হবে এমন কথা আমার মনে এখনও দেখা দিতে আরম্ভ করে নি,—নিশ্চয় বলব। বাহন বলতে তুমি ঠিক কী বলতে চাও আগে সেটা স্পষ্ট করে বল।"

সুনীথ বলিল, "এই ধর—দুঃখ কষ্ট বেদনা অভিমান এই ধরনের কোনও জিনিস ?"

সুনীথের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে নিঃশব্দে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দুঃখ কষ্ট বেদনা—এ তিনটের মধ্যে কোনটাই নয় বলে আমার বিশ্বাস। আর অভিমানটা এমন গোলমেলে জিনিস যে অভিমানও যে নয় সে বিষয়ে আমার ধ্রুব বিশ্বাস নেই।"

"তা হ'লে ?"

"তা হ'লে কী তা একটু পরে আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু তার আগে ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনে তোমাকে একটু ওয়াকিবহাল হতে হবে। তুমি আমার শুধু আত্মীয়ই নও সুনীথদা, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ; তোমার উপর আমার নির্ভর আছে। আশা করি সব শুনে তুমি আমাকে সদুপদেশ দেবে।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথ বলিল, "সর্বনাশ! হালকা জিনিসকে ক্রমশ ভারি করে তুলছিস যে দিবা! কাল রাত্রে ঝগড়া করেছিলি বুঝি ?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "ঝগড়া করলে তো সহজ হতো সুনীথদা, তা হ'লে তোমার সাহায্যের দরকার হতো না, নিজে নিজেই মিটিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু একান্তই যদি কিছু করে থাকি তা হ'লে ঝগড়ার চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর কিছু করেছি। কারণ, তা হ'লে বলতে হবে হয়তো তারই জের গোবিন্দজীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছেছে। সব কথা তোমাকে বলছি ; কিন্তু তার আগে শেষ কথাটা তোমাকে শুনিয়ে দিই—যূথিকাকে নিয়ে আমি সুখী নই।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া সুনীথ চমকিত হইল। ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে সে বলিল, "বাজে কথা বলিস নে দিবাকর। যূথিকাকে নিয়ে যে মানুষ সুখী নয়, সুখ কাকে বলে তা সে জানে না।"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে সুখ কাকে বলে তা আমিও জানি নে। কিন্তু স্বস্তি কাকে বলে তা বোধ হয় জানি। যূথিকাকে নিয়ে আমার স্বস্তি নেই। আর সকলের চেয়ে দুঃখের কথা কী জান ? এই অস্বস্তিকর অবস্থার জন্যে যূথিকা ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী আমি।"

"কিসের অস্বস্তি ?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "মিসফিটের (misfit)

অস্বস্তি। যূথিকা আমার জীবনে ঠিক খাপ খায় নি সুনীথদা, তাই তাকে নিয়ে আমার স্বস্তি নেই। আমারও স্বস্তি নেই। গলায় কলার মিসফিট করলে ঠিক স্বস্তি পাওয়া যায় না তা জান তো? যূথিকাকে নিয়ে আমার সেই অস্বস্তি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া চিন্তিত মুখে সুনীথ বলিল, "যূথিকাও এই রকম মিসফিটের কথা মনে করে না-কি?"

দিবাকর বলিল, "মনে করে কি-না বলতে পারি নে, মুখে কিন্তু যা বলে তা থেকে মনে হয়, আমি তার জীবনে সম্পূর্ণ ফিট করেছি। কিন্তু সুনীথদা, একজন হিন্দু মেয়ের পক্ষে স্বামী বস্তুটি এমনি এক অচ্ছেদ্য অত্যাজ্য ব্যাপার যে, প্রকৃতপক্ষে মিসফিট করলেও মুখে সে কথা বলা তো দূরের কথা, মনে মনেও বোধ হয় তা ভাবতে পারে না।"

সুনীথ বলিল, "আর একজন হিন্দু পুরুষের পক্ষে স্ত্রী বস্তুটি অচ্ছেদ্য অত্যাজ্য ব্যাপার নয় বলেই মনে মনে ভাবিস নাকি তুই?"

"না, ঠিক তা ভাবি বলে মনে করি নে। কিন্তু এ তর্ক তোমার সঙ্গে অন্য সময়ে না হয় করব, আপাতত তুমি আমার কাহিনী শোন। তুমি একজন বিজ্ঞ দার্শনিক মানুষ,—তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সহৃদয়,—তোমার উপদেশ আমি সহজে অমান্য করব না।"

তির্যকভাবে খানিকটা সূর্যকিরণ আসিয়া সুনীথের মুখের এক দিকে পড়িয়াছিল, একটু সরিয়া বসিয়া সে বলিল, "কী বলতে চাস বল্?"

তখন দীর্ঘকাল ধরিয়া দিবাকর ধীরে ধীরে মোটামুটি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। মাস ছয়েক পরে লাহোর যাইবার পথে কলিকাতায় সেই ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ সুন্দরী মেয়েটির কথা হইতে আরম্ভ করিয়া সুনীথের কলিকাতা যাওয়া নিবারণ সম্পর্কে গত রজনীতে যূথিকার সহিত তাহার যে সকল বাদানুবাদ হইয়াছিল, কিছুই বাদ দিল না।

নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশের সহিত সকল কথা শুনিয়া সুনীথ মনে মনে বিশেষভাবে দুঃখিত এবং চিন্তিত হইল। বিরক্তিমিশ্রিত ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে সে বলিল, "না না দিবাকর, তুই দেখছি নিতান্তই ছেলেমানুষ। জীবন নিয়ে এ রকম খেলা খেলতে নেই ভাই। বহু সৌভাগ্যে তুই যূথিকার মতো স্ত্রী পেয়েছিস —নিজের বুদ্ধির দোষে সে সৌভাগ্য যদি ভেস্তে দিস তা হ'লে এ কথা বলতে আমি বাধ্য হব যে, যূথিকা সত্যি সত্যিই বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা হয়েছে।"

এই তীব্রমধুর ভর্ৎসনার মধ্যে গভীর সহানুভূতির অসংশয়িত আবেগ উপলব্ধি করিয়া দিবাকরের দুই চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। ম্লান হাসি হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "প্রতিবাদ করছি নে তোমার সুনীথদা। আমারও মনে হয়, যূথিকা সত্যিই বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা হয়েছে। আমার মনে আজকাল কোন্ সুর কোন্ গান সর্বদা ধ্বনিত হয় জানো? রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান—

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে,
এরে পরতে গেলে লাগে,
এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।

আশ্চর্য হয়ে যাই যখন ভাবি, যে-গান রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে কোনও এক দিন নিজের চিন্তায় নিজের প্রয়োজনে রচিত করেছিলেন, নিয়তি যখন্ নিঃশব্দে অগোচরে ঠিক সেই গানটা আমার জীবনে সার্থক করবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া তীব্রকণ্ঠে সুনীথ বলিল, "নিয়তি ব্যবস্থা করে রাখে নি দিবাকর, তুই নিজেই নিজের দুর্ভাগ্য গড়ে তোলবার চেষ্টায় আছিস। কিন্তু শুধু এই অপরাধই নয়, এর চেয়েও গুরুতর অপরাধ তোর আছে।

"কী বলো ?

"বিনা অপরাধে যুথিকার জীবনটাও বিপন্ন করে তুলতে চাচ্ছিস।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করিয়া মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "একটা নৌকা যখন কোন কারণে প্রবল আবর্তের সৃষ্টি করে জলের মধ্যে তলিয়ে যায়, তখন পাশের নৌকাটাও সেই আবর্তের মধ্যে পড়ে অকারণে ডুবে মরে। পাশাপাশি থাকার বিপদই এই। কিন্তু আমি একেবারে পয়লা নম্বরেরই অপরাধী নই সুনীথদা—আমার পরেতে গেলেই শুধু লাগে না, ছিঁড়তে গেলেও বাজে।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া সুনীথের দুই চক্ষে ভ্রূকুটি জাগিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "ছিঁড়তে যাবার কথাও মনে মনে ভাবিস নাকি দিবাকর ?"

মৃদুকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "তুমি অত বড় দার্শনিক, তোমার কাছে মনের কার্যকলাপের কথা বলতে যাওয়া নিশ্চয় ধৃষ্টতা। কিন্তু আমাদের মতো মূর্খ লোকেরাও তাদের প্রতিদিনকার জীবনের ভাবনা চিন্তা থেকে এ কথা লক্ষ্য করতে ভোলে না যে, অদ্ভুত বস্তু মানুষের এই মন। যে কল্পনা যে কথা মানুষের পক্ষে ভয়াবহ দুশ্চিন্তা, সে কথাও মনে মনে ভাবতে ছাড়ে না। কিন্তু তুমি যে চিন্তার কথা জিজ্ঞাসা করছ সে দিকটা এতই ছাপসা আর অস্পষ্ট যে, সেদিকের কোনও সঠিক খবর তোমাকে উপস্থিত দিতে পারলাম না। এটা বললাম অবশ্য চেতন মনের কথা। তুমি সেদিন যে নিশ্চেতন মনের কথা বলছিলে সেই নিশ্চেতন মনের অঞ্চলে,তেমন কোনও চিন্তা যদি তলিয়ে থাকে তো বলতে পারি নে।"

"সাবধান দিবাকর।"

পিছনে পদশব্দে দিবাকর চাহিয়া দেখিল, নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে যুথিকা আসিতেছে। সুতরাং এ কথা সুনীথ ভর্ৎসনার ছলে অথবা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

পঁচিশ

একদিন করিয়া পিছাইয়া পিছাইয়া দিবাকর পাঁচ দিন সুনীথকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। আরও কয়েকদিন সুনীথ থাকিয়া যায় সেই চেষ্টা তাহার ছিল, কিন্তু আজ আর সুনীথ কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা দিবাকরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরদিন প্রত্যূষে সুনীথের কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

মহাদেবপুর যাইবার কাঁচা সড়ক দিয়া পদব্রজে খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর দিবাকর এবং সুনীথ অন্দরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দুইখানা গদি-আঁটা আরাম-চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। পার্শ্বে বিস্তৃত ফরাসের উপর একটা বক্স-হারমোনিয়াম এবং সেতারও এসরাজ রহিয়াছে। কথা আছে, আজিকার শেষ সান্ধ্য বৈঠকে সুনীথকে ভালো করিয়া গান বাজনা শুনাইতে হইবে।

কিছুক্ষণ পরে দুই পেয়ালা কফি লইয়া ভোলানাথ প্রবেশ করিল। ট্রে হইতে উভয়ের সম্মুখে ছোট ছোট টিপয়ের উপর পেয়ালা দুইটি স্থাপিত করিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, দিবাকর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'বউরাণী-মাকে বল, আমরা এসেছি।"

ভোলা বলিল, "আজ্ঞে হুজুর বউরাণী-মা সে কথা জানেন। আপনাদের কফি দিতে বলে তিনি আরতি দেখতে গেছেন। আরতি শেষ হলেই এখানে আসবেন।

ভোলা প্রস্থান করিলে সুনীথ বলিল, "সাবধান দিবাকর, যূথিকাকে গোবিন্দজী যে-রকম টানতে আরম্ভ করেছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত তোকে বেদখল না হতে হয়।

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "দখল রাখবার মতো যথেষ্ট শক্তি যার নেই সে বেদখল হবে তাতে আর কথা কী আছে বলো?"

সুনীথ বলিল. "দখল করবার অত শক্তি লাহোরে যে দেখিয়েছিল, দখল রাখবার উপযুক্ত শক্তি তার নেই, এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। এ খেয়াল তোর মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়—একটা মানসিক ব্যাধি বললেই বোধ হয় ঠিক হয়।"

সুনীথের কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল; বলিল, "এ কথা তো তুমি নতুন বলছ না, পরশুও এই ধরনের কথাই বলেছিলে। কিন্তু ব্যাধি তো নিতান্ত সামান্য জিনিসও নয় সুনীথদা, অনেক সময়ে ব্যাধি মারাত্মকও হয়।"

সুনীথ বলিল, "অঙ্কুরে বিনাশ না করলে এ ধরনের ব্যাধি সব সময়ে মারাত্মক হয়। তুই একটা আকাট মূর্খ, তাই বিদ্যার ওপর তোর অযথা বিদ্বেষ।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে দিবাকর বলিল "না না সুনীথদা, তুমি ভুল করছ। বিদ্যার ওপর আমার একটুও বিদ্বেষ নেই বরং যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

এই যে তুমি এত বড় বিদ্বান, তার জন্যে কি তোমার উপর আমার এক বিন্দুও বিদ্বেষ আছে বলতে পারো? নিশ্চয়ই পারো না। এ কথা আমি তোমাদের দুজনকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছি নে যে, একমাত্র মূর্খ স্বামী ছাড়া আর কারও উপর আমার বিদ্বেষ নেই। শুধু আমার কথাই বা কেন বলি, মূর্খ স্বামীর উপর ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে কোম্পানির যা মনোভাব তা তুমি আমার কাছে সবিস্তারে শুনেছ। তা ছাড়া এ কদিনে একে একে পাঁচ-ছখানা দৈনিক আর সাপ্তাহিক কাগজে যোগমায়া বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের রিপোর্ট পড়তেও তোমার বাকি নেই। আচ্ছা, তা হ'লে অপরাধ কি শুধু আমারই তুমি বলতে চাও?"

ঈষৎ ঔৎসুক্যের সহিত সুনীথ বলিল, "কেন উদ্বোধন রিপোর্টের অপরাধ কী?"

দিবাকর বলিল, "আমি তো অপরাধ বলি নে। কিন্তু একান্তই যদি অপরাধ বলতে হয়, তা হলে সত্যি কথা বলবার অপরাধই বলতে হবে।"

"কী সত্যি কথা?"

সুনীথনাথের প্রশ্ন শুনিয়া দিবাকরের মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, আমি মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জি এম এ-র স্বামী—এই সত্যি কথা।"

"কেন, এ কথা তুই অস্বীকার করিস নাকি?"

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "না, অস্বীকার করি নে, কিন্তু ভারি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করি। আচ্ছা সুনীথদা, অতগুলো খবরের কাগজ তো পড়লে, কিন্তু তার মধ্যে একটাতেও একমাত্র মিসেস যূথিকা ব্যানার্জি এম এ-র স্বামী ছাড়া আমার আর অন্য কোনও পরিচয় পেয়েছ কি? মিসেস যূথিকা ব্যানার্জির স্বামী এই পরিচয় ধারণ করে জীবন বহন করার মধ্যে আমি স্বস্তিও পাই নে, গৌরবও বোধ করি নে। একে তুমি পাগলামি বলতে পারো, কিন্তু তাই যদি বলো, তা হ'লে এর প্রতিকার কী তাও তোমাকে বলে দিতে হয়। তুমি হয়তো বলবে, পাগলামির প্রতিকার পাগলা গারদ ছাড়া আর কিছু নেই। আমিও ঠিক তাই মনে করি। বাইরের সংসারের সঙ্গে সব কিছু কাজ-কারবার বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরে বন্দী হয়ে আমাকে বসতে হবে, যেখানে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে তারিণী বরাটের দল পাত্তা পাবে না, খবরের কাগজের রিপোর্টারদেরও উপস্থিত হবার কোনও কারণ ঘটবে না, এমনকি নিশাকর-সুনীথনাথদেরও প্রবেশ পাওয়া শক্ত হবে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথ বলিল, "যা-তা বকে চলেছিস, সত্যি সত্যিই পাগল হলি নাকি তুই দিবাকর?"

সুনীথের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া দিবাকর বলিল, "এখনও ঠিক হই নি। ভয় পেয়ো না সুনীথদা, শুনতে ভালো লাগবে বলে একটু উপন্যাসের

চঙে রঙ চড়িয়ে কথাগুলো বলছি। জানো, কয়েকদিন আগে যূথিকাও গিরিবালা নামে এক পাগলের কথা আমাকে বলছিল ;"

"কে সে গিরিবালা ?"

'লাহোরের কোন্ এক শুচিবেয়ে স্ত্রীলোক,—দুশো বার কুলকুচো করেও যার মুখ পরিষ্কার হয় না, অবশেষে খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে রক্তপাত করে তবে ছাড়ে। আমার খুঁতখুঁতেমি যূথিকা বরদাস্ত করতে পারে না। সে মনে করে শুধু গিরিবালাই দাঁত খুঁটতে জানে, কিন্তু দিবাকরও যে মন খুঁটতে পারে এ কথা সে মানতে চায় না।"

কিছুক্ষণ হইতে গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘন্টার শব্দ শুনা যাইতেছিল। শব্দ বন্ধ হইলে সুনীথ বুঝিতে পারিল, আরতি শেষ হইয়াছে সুতরাং অনতিবিলম্বে যূথিকা উপস্থিত হইবে। তখন দিবাকরের সহিত এই প্রসঙ্গে আর কোন কথা কহিবার সুযোগ না হইতে পারে মনে করিয়া সে বলিল, "না, না দিবাকর, তোর জন্যে ক্রমশ আমি বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ছি। তুই দেখছি অতিশয় সেন্টিমেন্টাল। এ বিষয়ে আমার যা-কিছু বলবার ছিল সমস্তই পরশু তোকে বলেছি , আজ শুধু তোকে এই কথাটা সর্বদা মনে রাখতে অনুরোধ করি যে লাঠালাঠির বিরোধই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় বিরোধ নয়, মনের বিরোধ তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। মাথা ভাঙলে যত সহজে মাথা জোড়া লাগে, মন ভাঙলে মন তত সহজে লাগে না।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "সে কথা বুদ্ধি দিয়ে বুঝি, কিন্তু মন দিয়ে বুঝি নে। সেইজন্যেই তো সেদিন তোমাকে বলছিলাম, অদ্ভুত জিনিস মানুষের এই মন। তুমি কিন্তু আরও কয়েকদিন থেকে গেলে ভালো হতো সুনীথদা।"

মাথা নাড়িয়া সুনীথ বলিল, "না তা তো হতোই না বরং আরও কিছু আগে চলে গেলেই হয়তো ভালো হতো। তোদের দুজনের সর্বদা এখন একসঙ্গে থাকা দরকার। তাতে দুজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক ঝগড়া ঝাঁটি হয় সেও ভালো কিন্তু একজন সহৃদয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধু উভয়ের মধ্যে সর্বদা বর্তমান থেকে মিলন ব্যাপারে উভয়কে উৎসাহিত করলেই যে ভালো হবে, তা বলা যায় না। তুই যে বলছিলি, অদ্ভুত জিনিস মানুষের মন, সে কথা সত্যি। অনেক সময়ে দুজন মানুষ নির্বিবাদে পরস্পরের কাছ থেকে যতটা পৃথক হয়ে থাকতে পারে, বিবাদ-বিসংবাদ করে ততটা পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নির্বিবাদ বিরোধের মতো কঠিন অবস্থা দ্বিতীয় আর কিছু নেই।'

সুনীথের কথার কোনও উত্তর না দিয়া ক্ষণকাল দিবাকর নিজের চিন্তাজালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

"দিবাকর !"

সুনীথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "বল।"

"আমি নাস্তিক নই, কিন্তু ধর্মের আতিশয্যকে আমি ভয় করি। পরলোকের

মঙ্গল চিন্তায় মানুষ যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে তখন ইহলোকের কল্যাণ পদে পদে উপেক্ষিত হতে থাকে। বিশ্বপতির পিছনে ধাওয়া করার ফলে ইহলোকের পতিকে পিছনে ফেলে গেছে, এমন স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সংসারের মধ্যে আন্দামান দ্বীপ কোন জায়গাকে বলে জানিস ?”

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, “না, তা তো জানি নে।”

“ঠাকুর-ঘরকে—যেখানে অনেক সময়ে অনেক লোক নিজে নিজেই দ্বীপান্তরিত হয়।”

সুনীথের কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

সুনীথ বলিয়া চলিল, “ঝগড়া করে, বিবাদ করে যূথিকাকে নিজের কাছে আটকে রাখিস, তবুও নির্বিবাদে তাকে গোবিন্দজীর মন্দিরে দ্বীপান্তরিত হতে দিস নে। গোবিন্দজী অবুঝ লোক নন, এতে রাগ করবেন না। যূথিকার এই আকস্মিক ধর্মানুরাগ সময়ের জিনিসও নয়, খাঁটি জিনিসও নয়। খুব সম্ভবত এ হচ্ছে তোর সঙ্গে অহিংস অসহযোগ। আর অহিংস হলেও অসহযোগ যে একটা বেযাড়া জিনিস—এ কথা কিছুতেই ভুলিস নে।”

খুট করিয়া দ্বার খুলিয়া যূথিকা কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাড়াতাড়ি খুব গম্ভীর করিয়া সুনীথ বলিল, “এদিকে অতিথি নারায়ণ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।”

হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া যূথিকা বলিল, “কেন দাদা ?”

“দৈব নারায়ণের প্রতি এ রকম পক্ষপাত দেখে।”

সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, “ত্রুটি বিচ্যুতি হলে দৈব-নারায়ণ কতটা ক্ষমা করেন তা ঠিক বুঝতে পারি নে, অতিথি নারায়ণ কিন্তু ষোল আনাই করেন। তাই অতিথি নারায়ণের বিষয়ে মনে মনে একটু সাহস আছে।”

“কিন্তু শুধু অতিথি নারায়ণই তো নয়,—এদিকে পতি পরম গুরুও রয়েছেন যে।” বলিয়া সুনীথ দিবাকরের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইল।

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, “এ ক্ষেত্রে পরম গুরু নয়, তিনবার ম্যাট্রিক ফেল পরম গরু।”

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথ বলিল, “যে পতি নিজেকে পরম গরু বলে তাকে আমি গাধা বলি। শাস্ত্রের অনুশাসন হচ্ছে, নাত্মানমবমন্যেত—নিজেকে অপমান করো না। খবরদার দিবা, কখনও যেন এমন করে নিজেকে মিছামিছি খাটো করিস নে। কিন্তু সময় আমাদের অল্প, এখন আর কোনও কথা নয়, শুধু গান বাজনা হোক।” যূথিকার দিকে চাহিয়া বলিল, “প্রথমে তুমি একটি গান দিয়ে আরম্ভ কর যূথিকা।”

ফরাসের উপর যূথিকা উপবেশন করিলে দিবাকর যূথিকার সম্মুখে হারমোনিয়ামটা সরাইয়া দিল।

ছাব্বিশ

বেলা দুইটার সময়ে স্কুল গৃহে ডিরেক্টরের কক্ষে শাসন-সংসদের এক অধিবেশন বসিয়া ছিল। দিবাকর এবং যূথিকা ভিন্ন তাহাতে যোগ দিয়াছিল প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ করুণা মিত্র। স্কুল খোলার অব্যবহিত পরেই প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে শাসন-সংসদের একজন সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছে।

মীটিং হইতে ফিরিবার পথে যূথিকা এবং দিবাকরের মধ্যে মীটিং সংক্রান্ত আলোচনাই চলিতেছিল। তাহার মধ্যে একসময়ে দিবাকর বলিল, "তিন-চার দিন আগে এ মীটিং করতে পারলে খুব ভাল্ হতো যূথিকা।"

ঔৎসুক্যভরে যূথিকা বলিল, "কেন?"

"তা হ'লে পরামর্শদাতারূপে সুনীথদাদাকে আমরা সভায় পেতে পারতাম। তিনি থাকলে খুব সুবিধে হতো।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া যূথিকা বলিল, "তা হতো কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু তিনি না থাকাতেও কোনও অসুবিধে হয় নি। তুমি যা সিদ্ধান্ত করলে তার চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত আর কী হতে পারত বলো?"

বক্র দৃষ্টিতে যূথিকার দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "উৎসাহিত করছ আমাকে?"

মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না না, উৎসাহিত করবার কোনও দরকার নেই; আমার যা মনের ধারণা তাই তোমাকে বলছি।"

কথায় কথায় উভয়ে দেউড়ির পথ পরিহার করিয়া খিড়কির দিক দিয়া অন্দর-মহলে প্রবেশ করিয়াছিল। সংসার তখনও আপ্রত্যুষ কর্মসংগ্রামের পর বিশ্রাম-নিদ্রায় কতকটা নিমগ্ন। দ্বিতলে উপনীত হইয়া দক্ষিণ দিকের বারান্দায় গোল টেবিলের ধারে দুইটি চেয়ার অধিকার করিয়া উভয়ে উপবেশন করিল।

যূথিকার হস্তে একটা বই দেখিয়া দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কী বই যূথিকা?"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "ব্যাকরণ-কৌমুদী।"

"পড়বে না-কি?"

"মনে করছি পড়ব। আচ্ছা তুমি তো সংস্কৃত জানো,—একটু একটু শেখাবে আমাকে?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দিবাকর বলিল, "ব্যাকরণ-কৌমুদী? তা হ'লেই হয়েছে! অকপটে স্বীকার করছি সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞান অন্ধকারের ওপর ব্যাকরণ-কৌমুদী বিশেষ কিছু কৌমুদী বর্ষণ করতে পারে নি। নারীশব্দের রূপের চেয়ে নারীদেহের রূপ আমার কাছে অনেক সহজ জিনিস। নারীশব্দের রূপ কী রকম হ'বে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো তা হ'লে হয়তো

বলতে পারব না, কিন্তু নারীদেহের রূপ কী রকম হওয়া উচিত জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয় বলব, তোমার মতো হওয়া উচিত।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

নিঃশব্দ মৃদু হাস্যের দ্বারা এ পরিহাসের অল্প একটু নির্বাক প্রতিবাদ করিয়া করিয়া যূথিকা বলিল, "শেক্সপীয়রের 'কি, লীয়ার' পড়েছি, অথচ কালিদাসের 'শকুন্তলা' পড়ি নি—এ একটা গুরুতর অপরাধ বলে আমার মনে হয়। তা ছাড়া, বেশি কিছু বুঝি নে, তবুও সংস্কৃত আমার ভারি ভালো লাগে। তর্কতীর্থ মশায় মন্ত্র পড়েন, স্তব পাঠ করেন,—বাংলা ভাষার জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে তার সামান্য যেটুকু বুঝি তাতেই মন ভরে উঠে।"

দিবাকর বলিল, "সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি মধুর কিনা। অভিনব বিষবল্লীপাদ-পত্মস্য বিক্ষোর্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা। চমৎকার নয় ?"

দিবাকরের গভীর মিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত অনুপ্রাসহিল্লোলিত এই সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি শুনিয়া যূথিকা মুগ্ধ হইল। হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিল, "ভারি চমৎকার! এত সুন্দর তোমার সংস্কৃত উচ্চারণ, অথচ বলছ, তুমি সংস্কৃত জানো না!"

দিবাকর বলিল, "ইংরিজী জানি নে বলে তুমি হয়তো মনে কর সংস্কৃত আমি জানি; কারণ মানুষের না-জানারও তো একটা সীমা আছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, যূথিকা সংস্কৃতও আমি জানি নে। ভুল ইংরিজি দিয়ে পাঞ্জাব মেলের গার্ডের সঙ্গে তবু দু-চারটে কথা কয়েছিলাম, কিন্তু ইংরেজ না হয়ে সে যদি একজন দ্রাবিড়ী পণ্ডিত হতো তা হ'লে অহং আর শৃঙ্খলম্ ছাড়া বোধ হয় তৃতীয় কোনও কথা তাকে বলতে পারতাম না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এ কথা কিন্তু ষোল আনাই সত্য নহে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি দিবাকরের অনুরাগ ছিল যথেষ্ট এবং সেই অনুরাগের বশবর্তী হইয়া তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞানও যে সামান্য একটু ছিল, তাহা দিবাকরের সহিত সময়ে সময়ে আলাপ আলোচনার ফলে যূথিকার অবিদিত ছিল না। দিবাকরের পরিহাস-বাণীর বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য না করিয়া সে বলিল, তর্কতীর্থ মশায়ের কাছে তুমি কিছুদিন সংস্কৃত শিখেছিলে, তুমি একটুও সংস্কৃত জান না এ আমার মনে হয় না। কিন্তু একান্তই তুমি যদি আমাকে না শেখাতে চাও তা হলে তর্কতীর্থ মশায় যাতে আমাকে অল্প স্বল্প শেখান সে ব্যবস্থা করে দাও। দেবে ?"

দিবাকর বলিল, "তর্কতীর্থ মশায়ের সঙ্গে তোমার তো এখন সকাল সন্ধ্যে দু বেলা সাক্ষাৎ কারবার। তুমি নিজেই তাঁর সঙ্গে সে ব্যবস্থা করে নিতে পার।"

"তোমার আপত্তি নেই তো ?"

"আপত্তি যদি থাকে তো একমাত্র তোমার এই প্রশ্নে আছে। তুমি বিদ্যা অর্জন করবে, আর আমি তাতে আপত্তি করব, বিদ্যের সঙ্গে এত বড় বৈরিতা আমার নেই যূথিকা। কিন্তু সে কথা যাক গোবিন্দজীর মন্দিরে দু বেলা নিয়মিত হাজিরা দিয়ে চলেছ, তর্কতীর্থ মশায়ের কাছে সংস্কৃত শেখবার সঙ্কল্প করছ, ব্যাপার কী তোমার বল দেখি ?"

বহু দিনের বহু যত্নের আশ্রয় ভাঙিবার আশঙ্কা উপলব্ধি করিয়া একটা নূতন আশ্রয় গড়িয়া লইবার জন্ম মানুষের মনের যে ব্যগ্রতা, ব্যাপারটা হয়তো কতকটা সেই ধরনেরই; কিন্তু যূথিকা সে কথা বলিতে পারিল না; কারণ সে পর্যন্ত তাহারও মনের মধ্যে তেমন কোনও কথা স্পষ্ট হয় নাই। তাই দিবাকরের প্রশ্নটাকে কতকটা এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে মৃদু হাসিয়া সে বলিল, পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়তো বলবেন সবই গোবিন্দজীর ইচ্ছা।"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে গোবিন্দজীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—তর্কতীর্থ মশায়কে তোমার অধ্যাপক নিযুক্ত করো।"

"তাঁর পারিশ্রমিক?"

"সে ব্যবস্থা আমি করব, তুমি আর সব ব্যাপার ঠিক করে নাও।"

গোবিন্দজীর আরতি করিবার জন্ম পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই বাণীকণ্ঠ আগমন করিয়াছিলেন। মুখ হাত-পা ধুইয়া পাশের কক্ষ হইতে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছেন, এমন সময় কর্ণে প্রবেশ করিল তরুণ সুমিষ্ট ডাক, "তর্কতীর্থ মশায়!"

চমকিত হইয়া বাণীকণ্ঠ ফিরিয়া দেখিলেন, অদূরে সলজ্জস্মিতমুখে দাঁড়াইয়া যূথিকা। ইহার পূর্বে কখনও এরূপ সোজাসুজিভাবে যূথিকা তাঁহাকে সম্বোধন করে নাই। বিস্মিত ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "বউরাণী-মা! কী আদেশ বলুন?"

যূথিকা তাহার প্রস্তাব প্রকাশ করিয়া বলিল।

শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "এ তো দয়ার কথা নয় বউরাণী-মা, এ আনন্দের কথা। এ ভার আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম।"

যূথিকা বলিল, "আপনার কাছে আমার আর একটা অনুরোধ আছে।"

'কী বলুন?"

"আপনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করবেন; আর 'বউরাণী-মা' বলে ডাকবেন না।"

সহাস্যমুখে বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "বউরাণী-মা সম্বোধনে কোনও অযুক্তি নেই তো মা। এ আপনাদের ঘরাণার ন্যায্য সম্মান, যা পুরুষানুক্রমে সকলে আপনাদের দিয়ে আসছে।"

যূথিকা বলিল, "সে সম্মান সত্যি-সত্যিই যদি কিছু থাকে তো আজ থেকে আপনার আমার মধ্যে তার শেষ। এখন থেকে আমি করব আপনাকে সম্মান, আর আপনি করবেন আমাকে স্নেহ। আপনি আমাকে 'যূথিকা' বলে ডাকলেই আমি খুশি হব। একান্তই যদি তা না ডাকেন, তা হলে 'বউমা' বলে ডাকবেন, 'বউরাণী-মা' বলে কিছুতেই নয়।"

যূথিকার কথা শুনিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "এ তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ মা। তোমার মতো উচ্চশিক্ষিতা ছাত্রীর গুরু হওয়ার গৌরব আজ যখন লাভ করলাম, তখন তো আর সামান্য নই, সুতরাং তোমাকে তুমি

বলে ডাকলে এখন আর অসঙ্গত হবে না।”—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

যূথিকা এবং বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থের মধ্যে যখন উক্ত প্রকার কথোপকথন চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একটা অপ্রশস্ত কাঁচা পথ ধরিয়া শ্রান্তপদে দিবাকর মনসাগাছা গ্রামের পশ্চিম উপকণ্ঠে প্রবেশ করিতেছিল। দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপিত একটা দীর্ঘ মূল্যবান পাখী মারা বন্দুক, শিকারীর উচ্চ বুটের প্রায় সমস্তটাই কর্দমাক্ত, খাকি রঙের হাত কাটা জামা ও শার্ট ধূলায় ধূসর।

সকালে চা পান করিয়া লোকজন এবং সাজসরঞ্জামসহ সে পালংঘাটার বিলে পাখী শিকার করিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্বে অপরাহ্ণেই প্রত্যাগমনের ইচ্ছা ছিল বলিয়া তেমন কিছু ভারী শীত বস্ত্রাদি সঙ্গে লয় নাই। ফিরিবার কালে কোনও কারণে সামান্য একটু বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় মাইল দুই পূর্বে গাড়ি এবং লোকজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী পায়ে হাঁটা পথে ফিরিয়া আসিতেছিল।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুই তিনখানা বাড়ির পরে বহুদিনের পরিত্যক্ত একটা পড়ো গৃহে মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া দিবাকর তথায় দাঁড়াইল। তাহার পর কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া দ্বারের নিকট আসিয়া ধীরে ধীরে কড়া নাড়িতে লাগিল।

সাতাশ

কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া গৃহমধ্যে তরুণকণ্ঠে কেহ বলিল, “ঠাকুমা, দরজায় কে কড়া নাড়ছে।”

উত্তরে ঠাকুরমা সম্বোধিতা স্ত্রীলোক বলিল, “বিভূতি এসে থাকবে, দরজা খুলে দে।”

তরুণ কণ্ঠ উত্তর দিল, “না ঠাকুমা, বিভূতিকাকার কড়া নাড়া নয়, এ নিশ্চয় অন্য কোন লোক। আমি খুলতে পারব না বাপু।”

প্রত্যুত্তর হইল, “আচ্ছা তুই থাক—আমি খুলছি।”

মিনিট খানেক পরে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দরজা খুলিল এবং বলিয়া উঠিল “ও মা! এ কে গো!”

ক্ষণপূর্বে গৃহমধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার একটি বর্ণও দিবাকরের শুনিতে বাকি ছিল না। কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে টুপিটা মুখের উপর অল্প একটু নামাইয়া দিয়া গভীর কণ্ঠে সে বলিল, “আমি দস্যু, লুঠ করতে এসেছি। তোর ধনরত্ন যা আছে আমাকে সমর্পণ কর।”

পরিণত সন্ধ্যার অবলুপ্তপ্রায় আলোকে টুপির সাহায্যে মুখ ঢাকা যতটা সহজ

ছিল, কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মধ্যে কণ্ঠস্বর প্রচ্ছন্ন করা হয়তো ঠিক ততটা সহজ হইল না। দিবাকরের তিমিরাবরিত আকৃতির উপর একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়া প্রৌঢ়ার মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য দেখা দিল, স্তিমিত আলোকে যাহা দিবাকরের দৃষ্টিগোচর হইল না। কপট উৎকণ্ঠার চকিত কণ্ঠস্বরে প্রৌঢ়া বলিল, "তুমি লুঠ করতে এসেছ? কিন্তু বিলম্বে এসেছ দস্যু। আমার কাছে রত্ন অবশ্য আছে, কিন্তু তোমাকে তা দেবার উপায় নেই।"

"কেন নেই, শুনি?"

"তোমার জাত গেছে। জাত গেলে সে রত্নে অধিকার থাকে না।"

"আমার জাত গেছে? কবে গেল? কোথায়?"

"লাহোরে, গত শ্রাবণ মাসে।"

এবার দিবাকর তাহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিল; বলিল, "শেষ পর্যন্ত তা হ'লে চিনতে পেরেছ দেখছি, প্রথমটা যদিও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে।"

প্রৌঢ়া বলিল, "এমন রণবেশ দেখলে কে না ভয় পায়।"

দিবাকর বলিল, "রণবেশ নয়, কিরাতবেশ; পাখী শিকার করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে যাক্, কবে এলে তুমি ক্ষীরোদ-ঠাকুমা?"

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির নাম ক্ষীরোদবাসিনী। দূর সম্পর্কের হিসাবে, গ্রাম সুবাসে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, দিবাকর তাহাকে ঠাকুমা বলিয়া সম্বোধন করে।

দিবাকরের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আজ চার দিন হলো আমরা এসেছি।"

"জলপাইগুড়ি থেকে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ, জলপাইগুড়ি ভিন্ন আর কোথা থেকে আসব দিবাকর! কিন্তু এমন করে হিমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কত কী শুনবি, ঘরের ভিতরে বসবি চল্, সব কথা বলছি।" বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনী কপাট দুইটা পুরাপুরি উন্মোচিত করিয়া দিবাকরের প্রবেশ-পথ প্রশস্ত করিয়া দিল।

দিবাকর বলিল, "না ক্ষীরোদ-ঠাকুমা, ভারি শ্রান্ত হয়ে রয়েছি, আজ আর বসব না। শিগ্‌গির আর একদিন আসব অখন, আজ যাই।"

ক্ষীরোদবাসিনী কিন্তু কিছুতে দিবাকরের কথা শুনিল না, তাহার জামার হাতা ধরিয়া টান দিয়া বলিল, "না না দিবাকর, ভিতরে আয়। শ্রান্ত হয়ে যখন আছিস, তখন তো একটু বসে জিরিয়ে যাওয়াই উচিত।"

অগত্যা দিবাকর ভিতরে প্রবেশ করিল, কিন্তু ঘরের ভিতরে যাইতে সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। বারান্দার এক কোণে তাহার বন্দুকটা দাঁড় করাইয়া রাখিয়া একটা দেবদারু কাঠের প্যাকিং বাক্সের উপর বসিয়া পড়িল।

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এখানেও ঠাণ্ডা লাগবে দিবাকর, আমার কথা শোন্, ঘরে চল্। তোর ও-জুতো খোলা যদি সত্যিই অত অসুবিধা হয়, কোনও সঙ্কোচ

করিস নে, জুতো খোলবার একটুও দরকার নেই।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "কিছুতেই নয়। পালংঘাটা বিলের কাদা আর পথের ধুলো মাথা এই অসামাজিক জুতো পরে বারান্দায় ওঠাই যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে, ঘরের ভিতর তা বলে কিছুতেই নয়।" অদূরে আর একটা কাঠের বাক্স ছিল, অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া তাহা দেখাইয়া বলিল, "ঐ বাক্সটায় তুমি বস তো ক্ষীরোদ-ঠাকুমা। একটুও ঠাণ্ডা লাগছে না এখানে।"

আর অধিক পীড়াপীড়ি না করিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী ডাক দিল, "দিবাকর এসেছে শিবানী। প্রণাম কর এসে।"

ক্ষীরোদবাসিনীর একমাত্র পৌত্রী শিবানী রান্নাঘরে কাজকর্মে নিযুক্ত ছিল, পিতামহীর আহ্বানে তাড়াতাড়ি আসিয়া নত হইয়া দিবাকরকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সতের বৎসর বয়সের শ্যামাঙ্গী মেয়ে শিবানী, লোকে তাকে নিঃসন্দেহে কালো মেয়ের শ্রেণীতেই ফেলিবে। কিন্তু সে সেই শ্রেণীর কালো মেয়ে যে-শ্রেণীর মেয়েরা গঠনের সৌষ্ঠবে এবং মুখশ্রীর গৌরবে অনেক সুন্দরী মেয়ের বর্ণের শুভ্রতাকে ম্লান করিয়া দেয়।

দিবাকরের পুরুষের চক্ষু শিবানীর এই শ্যামল মিষ্ট রূপ দেখিয়া স্নিগ্ধ হইল। আনন্দোদ্ভাসিত মুখে সে কহিল, "এই শিবানী? এত বড় হয়েছে. সেই ছ-সাত বছরের ফ্রক-পরা মেয়ে?" মনে মনে বলিল, আর এত সুন্দর!

সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সে তো আজ দশ বছরের কথা হলো দিবাকর, তা হ'লে আর এত বড় হাওয়ার আটক কোথায় বল্? এই হচ্ছে আমার রত্ন, যার কথা একটু আগে তোকে বলছিলাম—এই আমার সেই কালোমানিক।"

দিবাকর চাহিয়া দেখিল, পিতামহীর সোহাগবাক্য শুনিয়া শিবানীর মুখ সলজ্জ হাস্যে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। নিজ হস্তের অঙ্গুরীয় দেখাইয়া দিবাকর বলিল, "এই দেখ, শিবানী, আমার হাতে কালোমানিক—নীলার আংটি। হীরের আংটিও আমার আছে, কিন্তু নীলার আংটিই আমি বেশি পছন্দ করি।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ক্ষীরোবাসিনী বলিল, "খবরদার দিবাকর, খবরদার! বাড়িতে এমন কথা কখনও বলিস নে ভাই, নাতবউ শুনলে ভারি রাগ করবে।"

উৎসুক কণ্ঠে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলো তো?"

"শুনেছি নাতবউ আমাদের হীরের মতো সাদা;—নীলার সুখ্যাতি শুনলে হীরে রাগ করবে না?"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া দিবাকর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ও, এই কথা। কিন্তু হীরের চেয়ে নীলা আমি বেশি পছন্দ করি—এ কথা শুনলে তোমাদের নাতবউ রাগ না করতেও পারে; কারণ জহুরী হিসেবে আমার মতের যে বিশেষ কোনো মূল্য নেই, এ ধারণা হয়তো তার হয়েছে।"

দিবাকরের এই পরিহাসবাণীকে আশ্রয় করিয়া তাহার অন্তরের বেদনাসঞ্জাত যে সুরটি, হয়তো বা তাহার নিজেরও অগোচরে, সূক্ষ্মরূপে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহার সহিত ক্ষীরোদবাসিনীর পরিচয় না থাকায় সে তাড়াতাড়ি কোনও জুতসই উত্তর দিবার সুযোগ পাইল না। শিবানী চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া সে বলিল, "দিবাকরের জন্যে ভালো করে চা তৈরি করে নিয়ে আয় শিবু।"

এ প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "না না, চা-টার হাঙ্গামা কোরো না,—একটুখানি বসে গল্প করে চলে যাব।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "গরিব ঠাকুমা এই পাড়াগাঁয়ে 'টী' আর কোথায় পাবে ভাই? তবে জলপাইগুড়ি থেকে আসছি, চা দিয়েই তোর খাতির করি।"

"তা হলে নিতান্তই এক পেয়ালা চা—আর কিছু নয়। তোমাদের নিজেব বাগানের চা তো?"

দিবাকরের এই প্রশ্ন শুনিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "পাঁচশোখানা শেয়ারের মধ্যে মাত্র গোটা পঞ্চাশেক শেয়ার পড়ে আছে, নিজেদের বাগানের চা আর কোন্ মুখে বলি দিবাকর?"

বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "কেন, বাকি শেয়ার গেল কোথায়?"

"অভাবের তাড়নায় বিষয়-সম্পত্তি চিরকাল যে পথে গিয়ে থাকে সেই পথেই গেছে। শুধু কি শেয়ারই গেছে দিবাকর, জলপাইগুড়ির বাড়িখানাও জলের দরে বিক্রি করে তবে এই পাড়াগাঁয়ের ভাঙা ঘরে বাস করতে এসেছি।" বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জিত করিল।

ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় একটা মাঝারিগোছ টি-এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিল। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত উক্ত এস্টেটে কাজ করিয়া পাঁচশতখানি টি-শেয়ার, জলপাইগুড়িতে একটি অতিক্ষুদ্র গৃহ এবং যৎসামান্য ঋণ রাখিয়া বৎসর পাঁচেক পূর্বে সে ইহলোক ত্যাগ করে। সেই বহনসাধ্য অপুষ্ট ঋণের বর্তমানতা সত্ত্বেও মোটের উপর ক্ষীরোদবাসিনীর সংসার সুখের সংসারই ছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের ভাঙন ধরিল; একটির পর একটি করিয়া একাদিক্রমে বিপদ এবং দুর্ঘটনা দেখা দিতে লাগিল; এবং সেই সর্বনাশা দুর্ভাগ্যের রথচক্রতলে একে একে পিষ্ট হইল একমাত্র পুত্র ভবানীপ্রসাদ, পুত্রবধূ মায়ালতা, দুইটি বালক পৌত্র, একটি শিশু পৌত্রী। করাল কৃতান্তদেবের নির্মম গ্রাস হইতে কোনও প্রকারে রক্ষা পাইয়া গেল অর্ধমৃতা শিবানী, অভাগিনী ক্ষীরোদবাসিনীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন তাহার কালোমানিক। একদা যে ঋণ ছিল কৃশ, ক্রমশ তাহা হইল স্ফীতোদর। অবশেষে ঋণের অবুঝ ক্ষুধার্ত উদরে বসতবাড়ি এবং সাড়ে চারশত টি-শেয়ার সঁপিয়া দিয়া শিবানীকে লইয়া ক্ষীরোদবাসিনী তাহার পল্লী-আশ্রয়ে পলাইয়া আসিয়াছে।

মধ্যে বৎসর চারেক পূর্বে পুত্রবধূ মায়ালতার উপর শিবানীর ভার দিয়া কয়েকদিনের জন্য ক্ষীরোদবাসিনী মনসাগাছায় আসিয়াছিল। সেই সময়ে দিবাকর এই সকল দুঃখকাহিনীর অধিকাংশই ক্ষীরোদবাসিনীর মুখে অবগত হইয়াছিল। বাকি যতটুকু অবিদিত ছিল, তাহা আজ শুনিল।

আঠাশ

ক্ষীরোদবাসিনীর দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনিতে শুনিতে দিবাকর মনে মনে এই কথাই কেবল ভাবিতেছিল যে মানুষের যেমন দুঃখ কষ্ট পাইবার পরিমাণের কোন সীমা নেই, সেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার শক্তির পরিমাণও তেমনি তাহার অসীম। পুত্রের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর মাথার উপর দিয়া বিপদের যে প্রচণ্ড ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে জীবন ধারণ করিয়া এতদিন সে বাঁচিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য। কিন্তু শুধু বাঁচিয়া থাকিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই—সে হাসে, গল্প করে, এমন কি সুযোগ উপস্থিত হইলে রসিকতা করিতেও ছাড়ে না।

সমবেদনার স্নিগ্ধকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" জীবন যুদ্ধে দুঃখের পতাকা বইবার যে পরিমাণ ভার তুমি পেয়েছ, সেই পরিমাণ শক্তিও তুমি পাও—এই প্রার্থনা করি ক্ষীরোদ-ঠাকমা।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এ তো তুই মহৎ লোকের কথা বললি ভাই। সহজ কথায় লোকে বলে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর—আমার হয়েছে তাই। তবু আমার কালোমানিক আছে বলে একেবারে জড় হয়ে যাই নি—একটু নড়ি-চড়ি উঠি-বসি। সতের বছর বয়স হয়ে গেল বিয়ে দিতে পাচ্ছি নে—এ দুশ্চিন্তার অন্ত নেই দিবাকর। আবার বিয়ে হয়ে গেলে কী নিয়ে জীবনধারণ করব, সে দুশ্চিন্তারও শেষ নেই।"

উৎসুক কণ্ঠে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এ পর্যন্ত বিয়ের চেষ্টা-চরিত্র কিছু করেছ কি?"

দিবাকরের প্রশ্ন শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সে দুঃখের কথা আর বলব কী দিবাকর, সেই চেষ্টাতেই জলপাইগুড়িতে তিন চার বৎসর পড়ে ছিলাম। যোগ্য অযোগ্য কত পাত্রের দোরে দোরে ধরণা দিলাম, কিন্তু কেউ দয়া করলে না, কেউ স্পর্শ করলে না আমার কালোমানিককে।"

"কেন?"

"কালো মেয়ে, ইংরিজী লেখাপড়া জানে না—এই অপরাধ। তার ওপর অপরাধের উপযুক্ত জরিমানা দেবার ক্ষমতাও নেই।"

শিবানী ইংরেজী লেখাপড়া জানে না—এই কথাটাই দিবাকরের কানে বিশেষ করিয়া বাজিল, কিন্তু সে বিষয়ে প্রথমে কিছু উল্লেখ না করিয়া সে বলিল, "শিবানীকে তারা শুধু কালো মেয়েই বলে ?"

"বলে বই কি দিবাকর, কালোকে তাদের কালো বলতে একটুও বাধে না। কিন্তু কালোর ভালো যা কিছু সে বিষয়ে তারা একেবারে চুপ করে থাকে, পাছে সে স্বীকার করলে জরিমানার টাকা কিছু কম করতে হয়।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "সত্যি। বাংলা দেশের বিয়ের বাজারটা একেবারে কসাইখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরিজী না জানার আপত্তিও করে না-কি তারা ?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "অন্তত গোটা দুই জায়গায় ঐ ছুতো করেই অপছন্দ করেছে।"

"কতটা ইংরিজি জানে শিবানী ?

"সে অবিশ্যি তেমন কিছু নয়। ঐ যে তোরা ফার্স্ট বই, না কী বলিস, তাও বোধ হয় সবটা শেষ করতে পারে নি। রোগ-শোক অভাব কষ্টের মধ্যে ইংরিজী তেমন কিছু পড়াশুনো তো হয় নি, দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল, ছোট মেয়েদের সঙ্গে আর পড়তে চাইলে না। তবে বাংলা জানে দিবাকর। রামায়ণ মহাভারত কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মেঘনাদবধ—এই সব বই শিবানী পড়েছে।"

ঈষৎ গভীর স্বরে দিবাকর বলিল, "ভুল করেছ ক্ষীরোদ ঠাকুমা, ইংরিজী ভালো করে না শিখিয়ে ভালো কর নি। আমাদের এই বাংলা ভাষার দেশে বাংলা না-জানা বাঙালী মেয়ের পক্ষে তত বড় অপরাধ নয়, যত বড় অপরাধ ইংরিজী না-জানা, শিবানীকে ইংরিজী না শিখিয়ে সত্যি-সত্যিই তুমি ভালো কর নি।"

সহাস্য মুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "তুই এম. এ.-পাশ করা মেয়ে বিয়ে করেছিস—এ কথা তুই বললে আমি কি উত্তর দিই বল্ ?"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া দিবাকর বলিল, "আমরা মনসাগাছায় মেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছি, সে কথা শুনেছ ?"

"শুধু সে কথাই নয়, এই তিন চারদিনে কোনও কথা শুনতে বাকি নেই। কিন্তু সব কথার মধ্যে কোন্ কথা শুনে সব চেয়ে খুশি হয়েছি জানিস ?"

"কোন কথা শুনে ?"

"আমাদের নাতবউয়ের সুখ্যাতি শুনে। সকলের মুখেই এক কথা—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—অমন বউ হয় না।"

এ কথারও কোনও উত্তর না দিয়া পূর্বকথার অনুবৃত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "আমাদের সেই স্কুলে শিবানীকে ভর্তি করে দোব।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সে হবে না দিবাকর। ও কথা গ্রামে পা দিয়েই শিবানীকে আমি বলেছি। কিন্তু কিছুতেই রাজী নয় সে। সেই এক আপত্তি—ছোট মেয়েদের সঙ্গে কিছুতেই পড়বে না।"

এক হাতে চায়ের পেয়ালা এবং অপর হাতে খাবারের রেকাব লইয়া শিবানী উপস্থিত হইল।

বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে দিবাকর বলিল, "পেয়ালায় চা এনেছ তা তো বুঝছি শিবানী, কিন্তু রেকাবে কী পদার্থ আনলে?"

স্মিতমুখে শিবানী বলিল, "সামান্য একটু খাবার।"

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "না, না, তা হবে না; ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। খাবারের বিষয়ে নিষেধ ছিল, সে কথা তোমার জানা আছে।"

ইত্যবসরে ক্ষীরোদবাসিনী দিবাকরের সম্মুখে একটা ছোট কাঠের বাক্স স্থাপন করিয়াছিল। নিঃশব্দ মৃদু হাস্যের দ্বারা দিবাকরের কথা অতিক্রম করিয়া শিবানী সেই বাক্সের উপর চা এবং খাবার স্থাপিত করিল।

খাবারের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "পয়লা নম্বর তো দেখছি কড়াইশুঁটি-যোগে তেলমাখা মুড়ি—কিন্তু দোসরা নম্বরে বড় বড় গোলাগুলি কী বস্তু, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "খইচুর—শিবুর নিজের হাতের তৈরি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "লোভে পড়লাম দেখছি। দুটি খাবারই আমার অতিশয় প্রিয় খাদ্য। আচ্ছা আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম শিবানী, কিন্তু আর কোনও দিন এমন করে নিষেধ অমান্য কোরো না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া প্রসন্নমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "ক্ষমা আদায় করবার কৌশল যে জানে, তার পক্ষে অন্য দিন নিষেধ অমান্য করা শক্ত হবে না দিবাকর।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, কেমন কৌশল জানে তা পরে দেখা যাবে।"

বারান্দার ধারে ঘটি এবং জল ছিল; ক্ষীরোদবাসিনীর নির্দেশে দিবাকর উঠিয়া গিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিল। ক্ষুধার্ত জঠর মুখরোচক খাদ্যের সান্নিধ্যে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল; আগ্রহ সহকারে দিবাকর আহারে প্রবৃত্ত হইল।

খাবার দিয়া শিবানী চলিয়া গিয়াছিল একটা টি-পটে দিবাকরের জন্য আরও পেয়ালা দুই চা লইয়া সে ফিরিয়া আসিল।

দিবাকর বলিল, "চা তো আনলে শিবানী, কিন্তু পেয়ালা ডিশ কই?"

মৃদুকণ্ঠে শিবানী বলিল, "আপনার ও-পেয়ালায় ঢেলে দিলে হবে না?"

"আমার জন্য বলছি নে, তোমার জন্যে বলছি।"

ব্যস্ত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "না না, আমরা চা খাব না দিবাকর, বিকেলে আমরা চা খেয়েছি। ও চা তোর জন্যে।"

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া দিবাকর বলিল, "চা-টা যে রকম উপাদেয় হয়েছে, তাতে আরও খানিকটা পেলে নিশ্চয় আপত্তি করব না।"

কথায় কথায় এক সময়ে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আমার কালোমানিকের গায়ের রঙ কেউ যদি কোকিলের মতো কালো বলে দিবাকর, তা হ'লে তার গলার স্বরকেও কোকিলের মতো মিষ্টি বলতে হবে। ভারি চমৎকার গান গায় শিবু।"

পিতামহীর কথায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া শিবানী সে স্থান পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছিল। বাধা দিয়া তাহাকে দিবাকর বলিল, "অমন করে সরে পড়বার মতলব করলে চলবে না শিবানী। তোমার গায়ের রঙ কোকিলের মতো কালো বললে আমি প্রবলভাবে আপত্তি করব; কিন্তু তোমার গলার স্বর কোকিলের মতো মিষ্টি প্রমাণ হলে আমি অতিশয় খুশি হব। সুতরাং একটা গান শোনাও আমাকে।"

প্রথমে শিবানী নানাপ্রকার ওজর আপত্তি করিল, কিন্তু দিবাকর এবং ক্ষীরোদবাসিনীর অনিবার উপরোধে অগত্যা তাহাকে হার মানিতে হইল।

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সেই গানটা গা শিবানী, 'প্রভু তোমার পথের'।"

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "হারমোনিয়াম নেই ক্ষীরোদ ঠাকুমা?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আছে একটা ভাঙা মতো—কিন্তু শুধু গলাতেও শিবু ভালো গাইবে।"

ক্ষণকাল ধীরে ধীরে গুন গুন করিয়া অল্প একটু সুর ভাঁজিয়া লইয়া সহসা মুক্ত সুমিষ্টকণ্ঠে শিবানী গান ধরিল,—

প্রভু তোমার পথের পথিক
    করিবে কবে?
কবে সুগভীর রাত হইবে প্রভাত
    তব ভৈরব রবে?
যবে ক্ষান্ত হইবে আশা
আর, শেষ হবে ভালোবাসা,
আর এক হয়ে যাবে আলো আর ছায়া,
    সুখ দুখ কাঁদা হাসা;
তখন গভীর উদাস সুরে
    বাজিবে না-কি হে দূরে
কল-কল্লোলময় সংগীত
    মহাসাগরের কলরবে।
যবে অন্ধ হইবে আঁখি,
আর বধির হইবে কান,
আর প্রাণের মাঝারে থাকিয়া থাকিয়া

কাঁপিয়া উঠিবে প্রাণ,
তখন বন্ধ হইবে চলা,
শেষ হবে কথা বলা
তখন বাজিবে পথের শেষ-হওয়া গান
অন্তিম উৎসবে।

শিবানীর তরল সুরেলা কণ্ঠের সুমধুর গান শুনিয়া দিবাকর মুগ্ধ হইল। উচ্ছ্বসিত বাক্যে প্রশংসা করিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমার কথায় অবশ্য অনেকখানি প্রত্যাশা হয়েছিল ক্ষীরোদ-ঠাকুমা, কিন্তু তাই বলে সত্যি-সত্যিই এত ভাল গান গায় শিবানী, তা মনে করি নি।"

দিবাকরের প্রশংসায় মনে মনে অতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সব গানই শিবু ভালো গায়, কিন্তু এই গানটা আমার বিশেষ ভালো লাগে দিবাকর —এই অন্তিম উৎসবের গান। এ গান আমার প্রাণের সুরের সঙ্গে বাঁধা।"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "এ গান শুধু তোমার প্রাণের সঙ্গেই বাঁধা নয় ক্ষীরোদ ঠাকুমা, যারা জানে তাদের জীবনে অন্তিম দিন একদিন নিশ্চয়ই আসবে তাদের সকলের প্রাণের সঙ্গেই এ গান বাঁধা।"

দিবাকরের রিক্ত চায়ের পেয়ালা লক্ষ্য করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "দিবাকরের পেয়ালায় চা ঢেলে দে শিবু। আমি চট করে জপটা সেরে আসি, তুই ততক্ষণ দিবাকরের কাছে বস।"

ক্ষীরোদবাসিনী প্রস্থান করিলে দিবাকরের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে শিবানী বলিল, "এ চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দাদা। একটু নতুন চা করে আনি।"

এক চুমুক চা পান করিয়া দিবাকর বলিল, "না না, আর নতুন চা আনতে হবে না, এ চা বেশ গরম আছে। তার চেয়ে তোমার ইংরিজী বইটা নিয়ে এসো দেখি।"

ইংরেজী বই আনিবার প্রস্তাবে শিবানি একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল। কুণ্ঠাজড়িত স্বরে সে বলিল, "না না দাদা, সে আপনি কী দেখবেন ইংরিজী লেখাপড়া আমি জানি নে।"

দিবাকর বলিল, "তুমি, ইংরিজী ফার্স্ট বুক পড়, সে কথা ক্ষীরোদ ঠাকুমার কাছে আমি শুনেছি। কিন্তু সে জন্য তোমার লজ্জার কোনও কারণ নেই শিবানী। ইংরিজী না জানা একজন বাঙালী মেয়ের পক্ষে অপরাধ, এ আমি একেবারেই মনে করি নে। নিয়ে এস তোমার বই, দেখি কোন্ বই তুমি পড়ো।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া অবশেষে অতিশয় সঙ্কোচের সহিত শিবানী তাহার ইংরেজী পড়িবার বই লইয়া আসিয়া দিবাকরের হস্তে দিল।

বই দেখিয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, "প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক অব রীডিং'।

খুব ভালো বই,—এই বই আমরাও পড়েছিলাম।" বইয়ের পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে পেন্সিলের দাগ লক্ষ্য করিয়া দিবাকর বলিল, "এই পর্যন্ত পড়েছ বুঝি ?"

মৃদুকণ্ঠে শিবানী বলিল, "হ্যাঁ।"

জলপাইগুড়িতে কার কাছে ইংরিজী শিখতে ?"

"কারও কাছে নয়,—মানের বই দেখে নিজে নিজেই শিখতাম।"

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় থামিয়া দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, 'রাম হয় পীড়িত'র ইংরিজী কী হবে বলো তো শিবানী।"

একটু চিন্তা করিয়া শিবানী বলিল, "রাম ইজ্ ইল্।"

"বেশ। তা হ'লে, 'রাম এবং যদু হয় পীড়িত'র ইংরিজী কী হবে ?"

'এবং'-এর ইংরেজী শিবানীর মনে পড়িল, বলিল, "রাম অ্যাণ্ড যদু ইজ্ ইল্।'

দিবাকরের মুখে অবিরক্তির প্রসন্ন হাস্য দেখা দিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "একটু ভুল হয়েছে। ইংরিজীতে ক্রিয়াপদেরও বচন আছে। এখানে রাম এবং যদু দুজন লোক বলে 'ইজ' না হয়ে বহুবচন 'আর' হবে।"

শিবানীর জ্ঞান ভাণ্ডারের চতুঃসীমার বহির্ভূত এ কথা; সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল।

বইয়ের অপর এক স্থান হইতে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, বলতে পারো শিবানী, পি এস্, এ এল্ এম্—এই পাঁচটা অক্ষরের ইংরিজী কথার উচ্চারণ কী হবে ? যদিও এটা তোমার পড়া অংশের বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করছি।"

ইংরেজী কথা উচ্চারণ করিবার যেটুকু কৌশল শিবানী এ পর্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার সাহায্যে কিছুতেই সে এ কথা উচ্চারণ করিবার বাগ পাইল না। বার দুই তিন 'পস' 'পস' করিয়া চেষ্টা করিয়া অবশেষে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বুঝতে পারছিনে কা হবে।"

প্রচুর আনন্দ এবং কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "পি এস্ এ এল এম 'সাম' হবে, 'সাম' মানে ধর্ম সংগীত।"

সকৌতূহলে শিবানী বলিল, "সাম' ? পি-এর উচ্চারণ হবে না ?"

"শুধু পি কেন, এল-এর উচ্চারণও হবে না। দুই অক্ষরই এ-কথায় সাইলেণ্ট, অর্থাৎ মূক।"

"এ রকমও হয় ?" বলিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শিবানী দিবাকরের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রগাঢ় সন্তোষের সহিত দিবাকর বলিল, "হয়।"

একজন সতের বৎসরের পরিণত বয়সের সুশ্রী মেয়ে তাহার ইংরেজী জ্ঞানের স্বল্পতা লইয়া বিস্মিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, এবং সে তাহার উন্নততর জ্ঞানের সুযোগের দ্বারা সেই মেয়েটির উপর প্রভাব বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছে—এই অবস্থা এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব মিষ্ট রস উৎপাদিত করিল,

যাহা পরিস্রুত হইয়া দিবাকরের শুষ্ক ক্ষুব্ধ হৃদয়ের স্তর পর্যন্ত সিক্ত করিয়া দিল।

ইহার মিনিট দশেক পরে জপ সারিয়া ক্ষীরোদবাসিনী উপস্থিত হইলে হাসিমুখে বলিল, "তোমার কালোমানিকের ইংরিজী বিদ্যে পরীক্ষা করছিলাম ক্ষীরোদ-ঠাকমা।"

স্মিতমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "তাই না কি! কেমন দেখলি? হলো ষোল আনা ফেল তো?"

দিবাকর বলিল, "না না, বারো আনা পাশ। একটু করে সাহায্য পেলে ষোল আনা পাস করতে খুব বেশী দেরী হবে না।"

"কে আর সে সাহয্য করবে দিবাকর?"

দিবাকর বলিল, আচ্ছা, কেউ করে কি-না পরে তার সন্ধান দেখা যাবে।'

মিনিট পাঁচ-সাত গল্প করিয়া দিবাকর উঠিয়া পড়িল। বারান্দার কোণ হইতে বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "রাত হয়েছে, আজ চললাম ক্ষীরোদ-ঠাকুমা, আবার একদিন আসব।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "একদিন কেন দিবাকর—যেদিন সুবিধে হবে, যখনই ইচ্ছা যাবে, আসবি। তোর জন্যে দোর খোলা রইল—দিন-রাত অষ্টপ্রহর।"

শিবানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "শুনলে তো শিবানী? এবার এসে কড়া নাড়লে বিভূতিকাকার কড়া নাড়া নয় বলে দোর খুলতে যেন আপত্তি কোরো না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া শিবানী নীরবে হাসিতে লাগিল।

পথে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে সহসা এক সময়ে দিবাকরের মনে পড়িল ক্ষীরোদবাসিনীর কথা, "বিলম্বে এসেছ দস্যু।" পর-মুহূর্তেই দিবাকরের অন্তরের কোনও গুপ্ত প্রদেশ হইতে কে যেন উত্তর দিয়া বলিল, "তুমিই বিলম্বে এসেছ ক্ষীরোদ-ঠাকুমা।"

সজোরে একবার মাথা ঝাড়া দিয়া মনকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতে করিতে হন্ হন্ করিয়া দিবাকর পথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

গৃহে পৌঁছিয়া বাহিরখণ্ডে পদার্পণ করিতেই সদর নায়েব মধুসূদন ঘোষাল আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া দিবাকরের হাতে একটা বড় খাম দিয়া বলিল, "এই চিঠি নিয়ে রাজসাহী থেকে একটি ভদ্রলোক এসেছেন বড়বাবু।

মধুসূদন ঘোষালের হস্তে একটা লণ্ঠন ছিল। খামখানা ছিঁড়তে ছিঁড়তে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আছেন তিনি?"

"আজ্ঞে, বিরাম মন্দিরে বিশ্রাম করছেন।"

দিবাকরদের অতিথিশালার নাম বিরাম-মন্দির।

খাম ছিঁড়িয়া বাহির হইল সবসুদ্ধ পাঁচখানা কাগজ—দিবাকর এবং

যূথিকার স্বতন্ত্র নামে সারদাশঙ্কর-গার্লস-হাইস্কুলের পুরস্কার বিতরণের দুইখানা নিমন্ত্রণ-কার্ড, যূথিকার নামে উক্ত স্কুলের প্রেসিডেন্ট শিবনাথ চৌধুরীর দীর্ঘ আমন্ত্রণ-পত্র, দিবাকরের নামে শিবনাথ চৌধুরীর একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি এবং দিবাকরের নামে ভবতোষ মিত্রের একটা চিঠি।

নিমন্ত্রণ-কার্ডে প্রকাশ, উক্ত পুরস্কার-বিতরণ সভায় সভাপতি হইবে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সি. ফরেস্টার এবং পুরস্কার বিতরণ করিবে মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জি এম. এ। ভবতোষ মিত্র তাহার চিঠিতে রাজসাহীতে তাহার কাছে অবস্থান করিবার জন্য দিবাকর এবং যূথিকাকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছে এবং শিবনাথ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত পত্রের প্রধান বক্তব্য রাজসাহীতে যূথিকাকে উপস্থাপিত করিবার একান্ত ভার দিবাকরের উপর।

ক্ষীরোদবাসিনী গৃহ হইতে দিবাকর যে আনন্দময় তরল মন লইয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহা ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

ঊনত্রিশ

বহির্বাটির একটা ঘরে শিকারের সাজসরঞ্জাম এবং পোশাক-পরিচ্ছদ থাকে। সেই ঘরে বন্দুক ও অপর দ্রব্যাদি রাখিয়া এবং বহির্বাটিরই একটা গোসলখানায় স্নানাদি সমাপন করিয়া দিবাকর যখন অন্দরে প্রবেশ করিল, তখন রাত আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ইহাই দিবাকরের চিরন্তন রীতি। শিকার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাইরের ধূলি-কর্দম হইতে মুক্ত না হইয়া এবং শিকারীর অশোভন বেশ পরিবর্তিত না করিয়া সে কখনও অন্দরে প্রবেশ করে না।

ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহে দিবাকরের বিলম্বের জন্য তাহার বেশ-কিছু পূর্বেই তাহার দলের লোকলস্কর এবং গাড়ি প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছানোতে যূথিকা একটু চিন্তিত হইয়াছিল। দিবাকরের সহিত সাক্ষাৎ হইতে সে জিজ্ঞাসা করিল "এত দেরী হলো যে তোমার ?"

দিবাকর বলিল, "পথে আসতে দেখলাম, জলপাইগুড়ি থেকে ক্ষীরোদ-ঠাক্‌মারা এসেছেন। তাই খবর নিতে গিয়ে তাঁদের বাড়িতে একটু দেরী হয়ে গেল।"

"ক্ষীরোদ-ঠাক্‌মারা কারা ? আমাদের আত্মীয় কেউ হন ?"

"আত্মীয় বটে, কিন্তু সে আত্মীয়তার মূল খুঁজে বার করতে হলে বেশ একটু বেগ পেতে হবে। অন্য কোনো সময়ে সে চেষ্টা না হয় দেখা যাবে, আপাতত এই চিঠিপত্রগুলো পড়,—রাজসাহী থেকে এসেছে।"

"রাজসাহীর সেই মেয়ে স্কুলের-প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের নিমন্ত্রণ বুঝি ?" বলিয়া

যূথিকা দিবাকরের হস্ত হইতে কাগজগুলো গ্রহণ করিল।

কার্ড এবং চিঠি তিনখানা পড়িয়া দেখিয়া যূথিকা বলিল, "কী উত্তর দেবে?"

"তথাস্তু ছাড়া আর কী উত্তর দিতে পারি বলো?—মনে আছে তো, কথা দেওয়া?"

মনে মনে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কোনও কথা না বলিয়া যূথিকা কার্ড ও চিঠিগুলো দিবাকরকে ফিরাইয়া দিল।

যূথিকার চিঠিখানা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া দিবাকর বলিল, "শিবনাথবাবুর এ চিঠিখানা তোমার চিঠি, এর একটা উত্তর লিখে রেখো।"

রূপার একটা ছোট ট্রে-তে দুই পেয়ালা চা লইয়া ভোলা প্রবেশ করিল এবং একটা ছোট টিপয়ের উপর রাখিয়া দিবাকর ও যূথিকার পার্শ্বে তাহা স্থাপিত করিল।

সবিস্ময়ে যূথিকা বলিল, "এখানে চা আনলি যে ভোলা? আর, খাবার কই?"

"হুজুর খাবার দিতে নিষেধ করেছেন বউরাণী-মা।" বলিয়া এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ভোলা প্রস্থান করিল।

যূথিকা বলিল, "কেন, খাবার দিতে নিষেধ করেছ কেন?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "ও-কার্যটা ক্ষীরোদঠাকুমার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে সেরে এসেছি। চা-ও অবশ্য বড় বড় তিন পেয়ালা খেয়েছি সেখানে, তবে ভোলা একান্ত চায়ের কথা বললে বলে নির্বাসনের ভয়ে আপত্তি করি নি।"

সকৌতূহলে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "নির্বাসনের ভয়ে কী রকম?"

দিবাকর বলিল, "তা বুঝি জানো না?

চা খাইতে বলি যে
চা খাইতে চায় না।
নির্বাসনে দাও তারে
জাপান কি চায়না॥

চা খেতে আপত্তি করা অপরাধের এই দণ্ডবিধি।" ট্রে-র উপর হইতে এক পেয়ালা চা তুলিয়া যূথিকার দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও, চা খাও। আপত্তি যদি করো তা হ'লে ঐ সূত্র অনুসারে তোমাকে জাপান কি চায়নায় নির্বাসন দেওয়া হবে।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "অপরের ভাগের চা না খেলে নির্বাসন হয় না। ও তোমার ভাগের চা।"

দিবাকর বলিল, "তিন পেয়ালার ওপর দু পেয়ালা সুখের চা নয়। এর ভাগ নিতে তুমি যদি রাজী না হও, তা হ'লে তোমাকে অদুঃখভাগিনী স্ত্রী বলব।"

"এক পেয়ালা চায়ের জন্ত এত বড় অপরাধ সইতে আমি রাজী নই," বলিয়া দিবাকরের হাত হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া যূথিকা বলিল, "শুনছ, তর্কতীর্থ মশায়কে আজ বলেছিলাম। তিনি আমাকে সংস্কৃত পড়াতে রাজী হয়েছেন। কাল থেকে পড়াবেন বলেছেন।"

দিবাকর বলিল, "শুভ সংবাদ। প্রথমে কী ভাবে পড়া আরম্ভ করবে তার কিছু স্থির হয়েছে ?"

যূথিকা বলিল, "তর্কতীর্থ মশায়ের ইচ্ছে, প্রথমে মাস ছয়েক শুধু ব্যাকরণ পড়াবেন; তারপর ক্রমশ কাব্য আর স্তায় আরম্ভ করবেন।"

বিস্ফারিত নেত্রে দিবাকর বলিল, "সর্বনাশ ! তা হ'লে তো তোমার কাছে যা কিছু অন্তায় দাবি-দাওয়া করবার আছে, এই ছ মাসের মধ্যেই সমস্ত সেরে রাখতে হবে।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কেন ?"

"তার পরে করলে তোমার স্তায়শাস্ত্র আপত্তি করবে।"

যূথিকা বলিল, "ও !" তাহার পর এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ভালোবাসা যদি থাকে, তা হ'লে কোন কারণেই স্তায়শাস্ত্র স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পা বাড়ায় না—অন্তায় দাবি-দাওয়া করলেও না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাবে কেমন না পা বাড়ায়। তখন কথায় কথায় বলবে, স্তায়শাস্ত্রের মতে এটা তোমার নিতান্ত অন্তায় আবদার হচ্ছে। কিন্তু সে কথা যাক, তোমার পড়বার সময় কখন করলে যূথিকা ?"

যূথিকা বলিল, "আরতির পর ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক ছাড়া অন্ত কোন সময় তর্কতীর্থ মশায়ের সুবিধে হলো না। আমার কিন্তু ও-সময়টা খুব ইচ্ছে ছিল না।"

"কেন ?"

"ও সময়টা তোমার কাছে থাকি,—ও সময় আমার মূল্যবান সময়।"

"ব্যাকরণের চেয়েও মূল্যবান ?"

অল্প একটু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "কাব্যের চেয়েও।"

কথাটা অবশ্য মিথ্যা নহে। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দিবাকর এবং যূথিকা সাহিত্য, সংগীত অথবা অন্ত কোন প্রসঙ্গের আলোচনায় ঐ সময়টা একত্রে অতিবাহিত করে। সুতরাং বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থ ঐ সময়ে ভাগ বসানোয় হিসাব মতো যূথিকার স্তায় দিবাকরেরও দুঃখিত হইবার কথা, কিন্তু সহসা কোথা হইতে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া মনে পড়িয়া গেল শিবানীর অশুদ্ধ ইংরেজী—'রাম অ্যাণ্ড যদু ইজ ইল'—সহজ মনে সে বলিল, "কিন্তু উপায় কী বলো ? ও-সময় তোমার যত মূল্যবান সময়ই হোক-না কেন, তর্কতীর্থ মশায়ের সুবিধেই আগে দেখতে হবে।"

কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর দিবাকর বলিল, "রাজসাহী থেকে যে লোক

এসেছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করি গে। নায়েব মশায় বলছিলেন, কাল সকালেই তাঁর রাজসাহী ফিরে যাবার ইচ্ছে। আজ রাত্রেই তুমি শিবনাথ চৌধুরীর চিঠির উত্তরটা লিখে রাখো।"

"কবে আমরা রাজসাহী পৌঁছব লিখব? শনিবারে, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনেই তো?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনেই নিশ্চয়। তবে 'আমরা' না লিখে 'আমি' লিখো।"

সবিস্ময়ে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমি রাজসাহী যাব না স্থির করেছি। অবশ্য সে জন্যে তোমার যাওয়ার কোনও অসুবিধে হবে না; তোমার সঙ্গে নায়েব মশায় যাবেন, আনন্দ যাবে, ভোলা যাবে।"

যূথিকা বলিল, "তা হ'লে আমিও যাব না স্থির করলাম। শুধু ভোলা, আনন্দ আর নায়েব মশায় যাবেন।"

"কিন্তু রাজসাহীতে পুরস্কার বিতরণ কে করবে যূথিকা?"

কথা শুনিয়া যূথিকার রাগ হইল; একবার মনে করিল বলে—আনন্দ; কিন্তু সে কথা না বলিয়া বলিল, "যাদের কাজ, সে মীমাংসা তারা করবে।"

"কিন্তু শিবনাথ চৌধুরীকে আমি তোমার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি।"

"তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না। আমার যাওয়া হলো না সে কথা আমি নিজে তাঁকে লিখে দিচ্ছি।"

"কী কারণ দেখাবে?"

"যাওয়ার সুবিধে হলো না, এ ছাড়া আর অন্য কোন কারণই দেখাব না।"

"কিন্তু তা হ'লে শেষ চোট তো পড়ল আমারই ওপর। আমি যে কথা দিয়েছি তোমাকে হাজির করিয়ে দোবই, সে কথা তো আর রইল্ না।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "যে-কোনো অবস্থাতেই তোমার স্ত্রীকে সেখানে হাজির করাতে না পারলে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে—এই যদি তুমি মনে করো, তা হ'লে না-হয় আমাকে নায়েব মশায়ের সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়ো।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল। আর্তকণ্ঠে সে বলিল, "এ কথার পর তোমার সঙ্গে আমাকে যেতেই হয় যূথিকা। কিন্তু একেই বলে সত্যাগ্রহ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যাগ্রহনীতি খুব ভালো জিনিস নয়।"

যূথিকা বলিল, "সত্যাগ্রহের মতো কোনও কিছুর দ্বারা তোমাকে বাধ্য করতে চেষ্টা করছি, এ যদি তোমার মনে হয়ে থাকে, তা হ'লে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। কিন্তু বিশ্বাস করো, সে রকম কোনও অভিসন্ধি আমার নেই। তুমি নিজের পছন্দ আর ইচ্ছা অনুযায়ী যে ব্যবস্থা করবে তাতেই আমি

রাজি আছি। কিন্তু কিছু যদি মনে না করো, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।"

"কী কথা ?"

"রাজসাহী যেতে তোমায় আপত্তি কিসের জন্যে ?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "আপত্তি আমার চেয়ে তোমারই তো বেশি হওয়া উচিত যূথিকা। অযোগ্য স্বামীকে নিজের পাশে বেঁধে নিয়ে সভাসমিতিতে গেলে তোমার তাতে কোনও গৌরব নেই।"

যূথিকা বলিল, "আমার গৌরবের কথা ছেড়ে দাও, তোমার তাতে অগৌরব আছে বলে মনে কর কি ?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "শিবনাথবাবুর চিঠি দুটোর কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিয়ে যদি বলি, তাহলে তোমার কী বলার আছে বলো ?"

শান্ত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "তা হলে শুধু এই কথা বলব যে, সভাই বলো আর সমিতিই বলো, এই রাজসাহীর সভাই আমার শেষ সভা। জীবনে আর কোনও সভায় আমি হাজির হব না। কিন্তু এ সভায় আমাকে হাজির করাবে বলে তুমি যখন প্রতিশ্রুত আছ, তখন এ সভায় আমি হাজির হব।"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কিন্তু আমার জন্যে তুমি নিজেকে এমন করে বঞ্চিত করবে কেন যূথিকা ? যে যোগ্যতা তুমি অর্জন করেছ তার হিসেবে তুমি নিজের জীবনকে চালিত করবে, আশা করি এ বিষয়ে আমার কোনও দিন আপত্তি হবে না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মুখে একটা ক্ষীণ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "শোন, আমি শুধু এম এ পাশই করি নি, তোমার ভগ্নীপতি হেমেনদাদার মতো মানুষের হাতে মানুষ হয়েছি। জীবনকে চালিত করবার জন্যে কত জিনিস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেও হয়, এ শিক্ষাও আমি তাঁর কাছে কিছু কিছু পেয়েছি। যে মাটিতে আমার ভাগ্য আমাকে এনে বসিয়েছে, তার রসে, তার আলোয়, তার হাওয়ায় জীবনকে যদি গড়ে তুলতে না পারি, তা হলেই আমার জীবন ব্যর্থ হবে। কিন্তু এসব কথা এখন যাক, তুমি ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করে যেমন তোমার ভালো মনে হয় সেই রকম ব্যবস্থা করো।"

উপস্থিত কথাটা সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন না হলেও রাত্রে শয়নের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে এবারকার মতো একটা মিটমাট হইয়া গেল, এবং তদনুযায়ী দিবাকর এবং যূথিকার নিকট হইতে পত্র লইয়া রাজসাহীর ভদ্রলোক পরদিন রাজসাহী প্রত্যাবর্তন করিল।

বৃষ্টির অবসান হইলেও অনেক সময় যেমন মেঘে মেঘে আকাশ উদাস হইয়া থাকে, তেমনই দিবাকর এবং যূথিকার মধ্যে একটা ম্লান অপ্রদীপ্ত ভঙ্গিমা সমস্ত দিন ধরিয়া বর্তমান রহিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিবাকরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নত হইয়া তাহার পদধূলি

গ্রহণ করিয়া যূথিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

যূথিকার বাম স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া সবিস্ময়ে দিবাকর বলিল, "হঠাৎ ?"

যূথিকা বলিল, "আজ থেকে নতুন বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করব, তুমি আশীর্বাদ করো, এ বিদ্যা যেন আমার পক্ষে শুভ হয়।"

একটা উত্তর দিবাকরের মুখ পর্যন্ত আসিয়া আটকাইয়া গেল ; বলিল, "আমার আশীর্বাদের যদি কোন মহিমা থাকে তা হ'লে শুভ হবে।"

সেই দিন আরতির পর বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থের সম্মুখে বস্ত্র অর্থ এবং অপরাপর সামগ্রীর দ্বারা পূর্ণ অর্ঘ্যের ডালি স্থাপন করিয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া প্রণাম করিয়া যূথিকা যখন তাহার ব্যাকরণের প্রথম পাঠ লইতে বসিল তখন ক্ষীরোদ-বাসিনীর গৃহে শিবানী তাহার ফার্স্ট বুক অব রীডিং খুলিয়া পড়িতেছিল—"ক্লে ইজ সফ্‌ট অ্যাণ্ড কোল্ড—কাদা হয় নরম এবং শীতল।"

পড়িতে পড়িতে সহসা এক সময়ে দিবাকরের দিকে চাহিয়া শিবানী জিজ্ঞাসা করিল, "কাদা হয় বলে কেন দাদা ? আমরা তো বাংলাতে কাদা হয় শীতল বলি নে ?"

দিবাকর বলিল, "প্রত্যেক ভাষারই নিজের নিজের বিশেষ ভঙ্গি আছে। ওটা ইংরিজী ভাষার একটা ভঙ্গি।"

তিরিশ

তিক্ত বিক্ষত অন্তঃকরণ লইয়া দিবাকর দিন পাঁচেক পরে রাজসাহী হইতে যূথিকার সহিত মনসাগাছায় ফিরিয়া আসিল। মৌমাছি দংশনে মানুষের মুখ যেমন বেদনায় লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, লজ্জা এবং অবমাননার দংশনে ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে তাহার মনের।

যাইবার পথে কতকটা সহজ এবং স্বাভাবিক মন লইয়াই সে গিয়াছিল। কিন্তু সেই সহজ এবং স্বাভাবিক মনেরই নিভৃত প্রদেশে অসন্তোষের যে বীজ-কণিকা স্তিমিত হইয়া বর্তমান ছিল, রাজসাহীতে উত্তেজক কারণের প্রভাব পাইয়া তাহা একেবারে শতধা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজসাহীতে পদার্পণ করিবার পর-মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসাহী ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত নিরন্তর সকলের নিকট হইতেই যূথিকার তুলনায় নিজের অকিঞ্চিৎকরত্বের নির্দেশ পাইয়া মনে মনে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সভাস্থলে, সভার পূর্বে, সভার পরে—সর্বত্র সব সময়ে কায়ার পিছনে ছায়ার ন্যায় সে যূথিকার অনুগামী হইয়া ফিরিয়াছে ; কোথাও ইহার ব্যতিক্রম

দেখা যায় নাই। যেটুকু সম্মান, যে সামান্য মনযোগ রাজসাহীতে লাভ করিতে সে সমর্থ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সে লাভ করিয়াছে মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জির ভাগ্যবান স্বামীর পরিচয়ের প্রভাবে। কিন্তু যূথিকাকে নিজ পরিচয়ের জন্য স্বামীর মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। সে চতুর্দিকে তাহার পরিচয় বিকীর্ণ করিয়াছে আপন ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার মহিমায়, এবং সেই পরিচয়ের সামর্থ্যে সকলের নিকট হইতে প্রচুর শ্রদ্ধা এবং সমাদর আদায় করিয়াছে।

উৎসব-সভায় দিবাকরও একটা মালা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানেও সেই একই কথা। তাহার কণ্ঠে পড়িয়াছিল কয়েকজন সাধারণ মান্য অতিথির সহিত গাঁদা ফুলের একটা এক-হালি মামুলি মালা; অপর পক্ষে যূথিকার কণ্ঠ লাভ করিয়াছিল উৎকৃষ্ট গোলাপফুল দিয়া রচিত সুপুষ্ট কমনীয় মাল্য।

শুধু মালাতেই নহে। অটোগ্রাফ সংগ্রহ ব্যাপারে, ভিজিটার্স বুকে অভিমত প্রদান করিবার সম্পর্কে, উৎসব-সভায় বক্তৃতা দিবার অনুরোধ প্রসঙ্গে, সভার বাহিরে মিস্টার ফরেস্টার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনার কালে হীনতার এমন একটা দুর্বহ গ্লানি সে ভোগ করিয়াছে, যাহার উৎপীড়নে তাহার সংক্ষুব্ধ পৌরুষ মুহূর্তের জন্য শান্ত হববার সুযোগ খুঁজিয়া পায় নাই। অন্তত জন কুড়িক ছেলেমেয়ে পীড়াপীড়ি করিয়া যূথিকার নিকট হইতে নিজ নিজ খাতায় অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছে—যাহাদের মধ্যে তিন-চারজন বাহুর আঘাতে তাহাকে পাশে ঠেলিয়া দিয়া যূথিকার সমীপে উপস্থিত হইয়াছে, এবং জন দুই তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই সুপারিশের সাহায্যে যূথিকার নিকট হইতে অটোগ্রাফ আদায় করিয়া লইয়াছে। ইচ্ছা অথবা খেয়াল অনুযায়ী কখনও ইংরাজীতে, কখনও বা বাংলা ভাষায় যূথিকা কাহারও খাতায় শুধু নিজের সই লিখিয়া দিয়াছে, কাহারও খাতায় দুই-চার লাইন স্বরচিত বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছে, কাহারও বা খাতায় ইংরেজী অথবা বাংলা ভাষার কোনও প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছে। যৎপরোনাস্তি আগ্রহ এবং যত্নের সহিত যাহারা এইরূপে যূথিকার অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনেরও—এমন কি, অভীষ্ট লাভের জন্য যে দুইজনকে দিবাকরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও কাহারও—দিবাকরের নিকট হইতে একটা সই লিখাইয়া লইবার কথা মনে হয় নাই। নিজ নিজ পুষ্পোদ্যানে ফুলের গাছ রোপণ করিতে যাহারা ব্যস্ত, আগাছার প্রতি তাহাদের কী আকর্ষণ থাকিতে পারে!

পুরস্কার বিতরণের কার্য শেষ হইলে সমাগত ভদ্রলোকদের বক্তৃতা দিবার সময়ে সভাপতি মিস্টার ফরেস্টার দিবাকরকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। মনসাগাছার কথা মনে থাকিলেও, একেবারেই আহ্বান না

করিলে পাছে দিবাকরকে উপেক্ষা করার মতো দেখায় সম্ভবত সেই বিবেচনার ফলেই ফরেস্টার দিবাকরকে অনুরোধ করে। কিন্তু অনুরোধ করিবার মূলে অপর পক্ষের যতখানি সদুদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, সেজন্য দিবাকরের সঙ্কটের পরিমাণ কিছুমাত্র লঘু হয় নাই। মনসাগাছায় সেবার তাহাকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিল সুনীথনাথ; এবার করিয়াছিল ভবতোষ মিত্র। ইহারই ঠিক অব্যবহিত পূর্বে প্রচুর প্রশস্তি এবং করতালির মধ্যে শেষ হইয়াছিল যূথিকার সুচিন্তিত এবং সুকথিত ইংরেজী বক্তৃতা।

অক্ষমতা প্রকাশের লজ্জা এবং গ্লানি তবু কতকটা সহনীয় ছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে সভাভঙ্গ হইলে সহসা অতর্কিতে যে ঘটনা ঘটিল, তাহার পর আর মুখ দেখাইবার পথ রহিল না। লাহোর হইতে কলিকাতা আসিবার পথে পাঞ্জাব মেলে গার্ডের সহিত যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এ ব্যাপারও ঘটিল যেন তাহারই একটা রূপান্তরের মতো। প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, সে ক্ষেত্রে দর্শক ছিল একজন ইংরেজ গার্ড এবং একজন পশ্চিমা ভদ্রলোক; পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে ছিল একজন ইংরেজ কালেক্টার এবং পনেরো ষোল জন ইংরেজ ও বাঙালী স্ত্রী পুরুষ।

সভাভঙ্গের পর স্কুল-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অভ্যাগতদের মধ্যে প্রধান কয়েক ব্যক্তি হেড মিস্ট্রেসের কক্ষে একটা গোল টেবিলের ধারে সমবেত হইয়া বসিয়াছিল। চা এবং খাবার তখনও পরিবেশিত হয় নাই, পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন চলিতেছিল, এমন সময়ে হেড্ মিস্ট্রেস মিসেস পাল স্কুলের ভিজিটার্স বুক আনিয়া মিস্টার ফরেস্টারের সম্মুখে স্থাপিত করিল। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কয়েকটি অভিমতের উপর অল্পস্বল্প দৃষ্টি বুলাইয়া মিস্টার ফরেস্টার কয়েক ছত্রে নিজ মন্তব্য লিখিয়া খাতাখানা মিসেস পালের হস্তে ফিরাইয়া দিল। ইত্যবসরে সহসা ভিজিটার্স বুকের আবির্ভাবে মিস্টার ফরেস্টারের বাম পার্শ্বে বসিয়া দিবাকর প্রমাদ গনিতেছিল। বিপদ যখন আসে, তখন দুর্ভাগ্য তাহার পথ সুগম করিয়াই দেয়। ফরেস্টারের পর মিসেস্ পাল যদি খাতাখানা যূথিকার নিকট দিত, তাহা হইলে দিবাকরের দিক দিয়া ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া খাতাখানা দিবাকরেরই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "দয়া করে আপনি কিছু লিখে দিন মিস্টার ব্যানার্জি।"

সহসা অনতিবর্তনীয় বিপদের সম্মুখে পড়িলে মানুষের যে অবস্থা হয়, দিবাকরের হইল সেই অবস্থা। একজন ইংরেজ আই. সি. এস্. অফিসারের মার্জিত ইংরেজী লেখার নিম্নে তাহার ইংরেজী লিখিবার প্রস্তাব শুনিয়া মাঘ মাসের শীতেও সে ঘামিয়া উঠিল। আরক্ত মুখে নতনেত্রে খাতাখানা ঈষৎ নাড়াচাড়া করিতে করিতে মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "আমাকে কেন মিসেস্ পাল, —আর সকলে রয়েছেন তাঁদের দিন—আমাকে কেন?"

মিসেস্ পাল কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে; মাথা নাড়িয়া বলিল,

"না না, সে কি কথা। আপনি অত বড় গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, আপনার অভিমত আমরা অতিশয় মূল্যবান মনে করি।"

ভিজিটার্স বুক দেখিয়া ঠিক এই অবস্থা আশঙ্কা করিয়া যূথিকা বোধ করি দিবাকরেরও পূর্বে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাব মেলের ন্যায় এবারও সে নিজেই দিবাকরের উদ্ধারকল্পে প্রবৃত্ত হইল। দিবাকরের হস্ত হইতে কতকটা যেন কৌতূহলের ছলে ধীরে ধীরে খাতাখানা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "আমাকেও কিছু লিখতে হবে না-কি মিসেস পাল ?"

আগ্রহভরে মিসেস পাল বলিল, "সে কি কথা মিসেস ব্যানার্জি ? আপনার মতামত আমরা বিশেষভাবে কামনা করি—নিশ্চয় লিখতে হবে আপনাকে।"

"তা হলে আমিই না হয় প্রথমে কিছু লিখি। তারপর যদি দরকার মনে করেন তো উনি লিখবেন।" বলিয়া অভিমতটা লিখিয়া শেষ করিয়া খাতাখানা দিবাকরের সম্মুখে রাখিয়া মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "উই (we) দিয়ে দুজনের হয়ে সবটা লিখেছি, বোধ হয় আর কিছু লেখবার দরকার নেই। আমার সইয়ের ওপর তুমি সই করে দাও তা হলেই হবে।"

পাঞ্জাব মেলের পুনরাভিনয় আর কাহাকে বলে ? কিন্তু উপায়ই বা কী আছে ? উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অপর কোনও শোভনতর পথ না দেখিয়া অগত্যা দিবাকর যূথিকার উপদেশই পালন করিল। কিন্তু এক হাত পরিমাণ বস্ত্রের দ্বারা সাত হাত পরিমাণ গলদ ঢাকিতে যাইবার মর্মন্তুদ লজ্জায় তাহার সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় নিপীড়িত হইতে লাগিল। গলদ তো ঢাকা পড়িলই না, অধিকন্তু গলদ ঢাকিবার আগ্রহের ফলে গলদের স্বরূপ অধিকতর কুৎসিত হইয়া উঠিল। বর্শাবিদ্ধ সর্পের ন্যায় আপনাকে আপনি দংশন করিতে করিতে তাহার বিদ্রোহী অন্তর বারংবার বলিতে লাগিল—না না, এ অবস্থা যেমন করে হোক বদলাতেই হবে। এই লজ্জা, এই অপমান, এই পরাজয় সারাজীবন সহ্য করে চলার হীনতার মধ্যে কিছুতেই নিজের আত্মাকে দলিত করা হবে না। —কিছুতেই না, কিছুতেই না।

মনসাগাছায় ফিরিয়া আসার দিন সন্ধ্যাকালে এক সময়ে দিবাকর যূথিকাকে বলিল, "আর কতবার এই রকম গাঁটছাড়া বেঁধে সভাসমিতিতে আমাকে নিয়ে গিয়ে অপমানিত করাবে যূথিকা ?"

শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আর একবারও নয়, কারণ এ জীবনে আর কোনদিনই আমি সভাসমিতির ছায়া মাড়াব না।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "তোমাকে তো এ রকম করে শাস্তি নিতে বলছি নে। আমাকে রেহাই দাও—সেই কথাই বলছি।"

"নিজেকে রেহাই না দিলে তোমাকে রেহাই দেওয়ার সুবিধে হবে না।"

"নিজেকে রেহাই দেওয়ার মানে ?"

"নিজেকে রেহাই দেওয়ার মানে, তোমাদের বাড়ির আবহাওয়ার, তোমাদের বাড়ির সংস্কারের, তোমাদের বাড়ির ইতিহাসের প্রতিকূল যে সব জিনিস,—তা থেকে নিজেকে রেহাই দেওয়া। আমি তোমাদের বনেদী জমিদার-বংশের উপযুক্ত হতে চেষ্টা করব। রামায়ণ-মহাভারত পড়ব, পূজো-পাঠ করব, ব্রত-পার্বণে মন দোব; আমার শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীরা যে পথ ধরে চলেছিলেন, নিজেকে চালিত করার জন্যে সেই পথ খুঁজে পেতে বার করব।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যূথিকা বলিল, "সন্ধ্যা হলো, এখন আমি চললাম।"

দিবাকরও উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "কোন্ পথে?"

যূথিকার মুখে একটা ক্ষীণ হাসি মুহূর্তের জন্য ঝিলিক মারিয়া মিলাইয়া গেল; মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কুপথে নয়। তর্কতীর্থ মহাশয়ের আসবার সময় হলো, তাই যাচ্ছি।" যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সংস্কৃত পড়া আপাতত না ছাড়লেও বোধ হয় চলবে; কারণ সংস্কৃত না-জানাও অপরাধ তো নয়ই, জানাও সম্ভবত অপরাধ নয়।"

যূথিকা চলিয়া গেলে দিবাকর ক্ষণকাল নিজের চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তিত করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। কোথাকার উদ্দেশ্যে, তাহা অবশ্য সহজেই অনুমেয়।

একত্রিশ

এক সুরে বাঁধা দুইটা তারের যন্ত্রের মধ্যে একটা অপরটা হইতে অল্প একটু চড়িয়া অথবা নামিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, যূথিকা এবং দিবাকরের মধ্যে দুই-তিন দিন ধরিয়া সেই অবস্থা চলিয়াছে। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাহারা পরস্পরের সহিত কথা না কহিয়া চুপচাপ থাকে, কিন্তু কথা কহিলেই একটা বেসুরা কর্কশ সুর বাজিয়া উঠে।

রাজসাহী যাইবার পূর্বে এ অবস্থার ঠিক এতটা আতিশয্য ছিল না। তখনও মাঝে মাঝে বেদনার আঘাতে মনের বায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইত, কিন্তু সে স্পন্দন তখনও দুঃখ অথবা অভিমানের এলাকা অতিক্রম করিয়া অপর কোনও বিষয়তর এলাকায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে নাই। তখন বেদনা যেমন ছিল, সমবেদনাও ছিল। নিজের অজ্ঞাতসারে, এবং কয়েকজনের চক্রান্তের ফলে, বিবাহের দ্বারা দিবাকর যে নিরুপায় এবং অনভিলষিত অবস্থা-সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য যূথিকার মনে সমবেদনার অভাব ছিল না। এমন কি, সেই চক্রান্তের মধ্যে তাহার নিজের দিক হইতে অনুমোদন এবং লিপ্ততা ছিল

বলিয়া সমবেদনার সহিত একটা আত্মগ্লানিও সে মাঝে মাঝে ভোগ করিত। এখনও যে সে সমবেদনা নাই তাহা নহে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত অচেতন রোগীর সকল প্রকার অত্যাচার এবং উপদ্রব সর্বতোভাবে মার্জনীয় জানিয়াও শুশ্রূষাকারী যেমন মাঝে মাঝে ধৈর্য হারাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠে, সেই অবস্থা হইয়াছে যূথিকার।

বেলা তখন তিনটা বাজিয়াছে। দ্বিতলের শয়ন কক্ষের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া দিবাকর এবং যূথিকার মধ্যে কর্কশ সুরেরই একটা পালা চলিয়াছিল। তাহারই মধ্যে এক সময়ে যূথিকা বলিল, "সাধারণ সভা-সমিতির কথা তো সেদিন শেষ হয়ে গিয়েছে, সে কথা বলছি নে। আমি বলছি ঘরোয়া বিয়ে-পৈতের উৎসবের কথা। ধর, শেফালীর বিয়ের সময়ে তোমাকে যদি লাহোরে টেনে নিয়ে যাই, তা হলে কি তোমাকে অপমানিত করবার জন্যেই নিয়ে যাওয়া হবে বলে মনে করবে? আমাদের জামাইবাবু তো এম. এ পাস, মেজ জামাইবাবু শিবপুরের বি. ই.; ধর শেফালীর স্বামীও যদি একজন পি-এইচ. ডি. কিংবা ঐ রকম কিছু হয়,—তা হ'লে?"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে এই কথাই মনে করব যে, আমার মতো লোকের পক্ষে, ঘরই বলো আর বাইরেই বলো, কোনও জায়গাই নিরাপদ নয়।"

"আচ্ছা, আমি যদি ম্যাট্রিক পাসও না হতাম, তা হলে কি আমাদের এম. এ. পাস জামাইবাবু আর বি. এ. পাস মেজ জামাইবাবুদের মধ্যে তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে?"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "হয়তো করতাম।"

"কেন, তা কেন করতে?"

"কারণ, তা হ'লে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার অবিবেচনার অপরাধে কেউ আমাকে অপরাধী করতে পারত না।"

"কিন্তু আমি ম্যাট্রিক পাসও নই মনে করে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ—এ কথা, জানলে কেউ তো তোমাকে সে অপরাধে অপরাধী করতে পারবে না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে কৌতুক এবং বিদ্রূপ মিশ্রিত একটা তীব্র হাসি জাগিয়া উঠিল। ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "তা হ'লে তো সে কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়ার ভার আমাকেই নিতে হয়। শেফালীর বিয়ের রাত্রে বাসর ঘরে তার স্বামীর কানে কানে সাফাই গেয়ে রাখতে হয় আমাকেই। কিন্তু এ রকম করে নিজের মান নিজেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব বলে মনে কর কি তুমি?"

যূথিকা দেখিল, তর্কের এই ধারা অনুসরণ করিয়া কোনো সুসিদ্ধান্তে উপনীত হবার আশা নাই। তখন সে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি ম্যাট্রিক পাসও না হলে তুমি খুশি হতে?"

দিবাকর বলিল, "দুঃখিত হতাম না।"

"খুশি হতে?"

"হতাম।"

"এর চেয়েও ?"

"বোধ হয় এর চেয়েও।"

"বোধ হয়" কথাটা যে কেবল সামান্য একটু ভদ্রতা অথবা সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্যবহৃত তাহা বুঝিতে যূথিকার বিলম্ব হইল না। কী বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

দিবাকর বলিল, "দুঃখ কী জানো যূথিকা? দুঃখ এই যে, এ শুধু আমারই স্বখাত সলিল নয়। তা হ'লে 'দোষ কারো নয় গো মা আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা' বলে সান্ত্বনা পেতে পারতাম। এ সলিল সৃষ্টি করবার জন্যে অনেকেই কোদাল পেড়েছে। দিদি পেড়েছেন, জামাইবাবু পেড়েছেন, তোমার বাবা-মা পেড়েছেন, এমন কি তুমিও দু-চার কোপ পাড়তে কসুর করোনি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মনে সমবেদনা পুনরায় উদ্যত হইয়া উঠিল। ব্যথিত কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "আচ্ছা, এ ব্যাপারটা তোমাকে কি একটু বেশী মাত্রায় বিচলিত করে না ? আমার তো মনে হয় এত বিচলিত হবার তেমন কোনও কারণ নেই।"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "একাধিক বার এ কথার উত্তর দিয়েছি। তারপরও যদি জিজ্ঞাসা কর তা হ'লে এবার বলব, 'কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।' তুমি বলছ—তেমন কোনও কারণ নেই, সুনীথদাদাও বলেন—তেমন কোনও কারণ নেই ; নিশাকে জিজ্ঞাসা করলে সেও হয়তো বলবে—তেমন কোনও কারণ নেই। কিন্তু তোমাদের তো আশীবিষে দংশন করে নি, বিষের জ্বালা যে কী জ্বালা তা বুঝবে কিসে ?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "একটা কথা বলব, শুনবে ?"

"কী কথা, বল।"

"আমার কাছে তুমি ইংরিজী শিখতে আরম্ভ কর। আমি আমার সমস্ত শরীর আর মন নিযুক্ত করব তোমাকে শেখানোর কাজে। পূজোপাঠ ছেড়ে দেব, সংস্কৃত পড়া ত্যাগ করব, স্কুলের কাজকর্মে ইস্তফা দেব—সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি—শুধু তোমাকে পড়াব। ইংরিজীতে তোমার সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে তোমাকে ইংরিজীতে কথা কওয়ার অভ্যাস করিয়ে দেব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বছর চারেকের মধ্যে এমন তৈরী করে দেব তোমাকে, যাতে তুমি চার বছর পরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখলে, দেখবে ফার্স্ট ক্লাসের মার্ক পাবার উপযুক্ত হয়েছ। বিশ্বাস কর, এ আমি পারি।"

দিবাকর বলিল, "বিশ্বাস করছি, কিন্তু এতে আমি রাজী নই।"

"কেন ?"

"সে কৈফিয়ৎ দিতেও রাজী নই।"

যে কোমল ভাব কিছু পূর্বে যূথিকার মুখমণ্ডলে নামিয়া আসিয়াছিল তপ্তক্ষেত্রে

বারিকণার ন্যায় সহসা তাহা লুপ্ত হইল। ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "এ কিন্তু তোমার অন্যায় কথা, এ তোমার অবিচার। পাস করার কথা লুকিয়ে রেখে তোমাকে বিয়ে করেছি বলে মনে মনে আমাকে অপরাধী করে রাখবে, অথচ সে অপরাধ ক্ষালনের সুযোগ দেবে না আমাকে?"

দিবাকর বলিল, "এ সুযোগ দিলেও তোমার অপরাধ ক্ষালন হবে না। চার বৎসর পরের এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখে ফুল মার্ক পেলেও ম্যাট্রিক ফেলের সুনাম আমার কাঁধে সওয়ার হয়ে থাকবে। জাতও যাবে অথচ পেটও ভরবে না।"

তক্ষীতর কণ্ঠে যুথিকা বলিল, "পেট ভরবে না, সে কথা না-হয় বুঝলাম। কিন্তু জাত যাবে কিসে?"

দিবাকর বলিল, "সে কথা শুনলে কোনও লাভ হবে না তোমার। যে কথা শুনলে কিছু হতে পারে সেই কথা বলি শোন। তুমি চার বছরের কোর্সের কথা বলছ, কিন্তু যে উপায় আমি স্থির করেছি তাতে বছর দুয়েকের কোর্সেই কেল্লা ফতে করতে পারব। ভারতবর্ষে থেকে তা অবশ্য হবে না; বিলেত যেতে হবে তার জন্যে?"

সকৌতূহলে যুথিকা বলল, "বিলেতে যাবে তুমি?"

"যাব।"

"বেশ তো আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

যুথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা হ'লেই হয়েছে! তা হ'লে কানা আদমির লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করে দু বছর পরে খোঁড়া হয়েই দেশে ফিরতে হবে। যে দিবাকরবাবু সেই দিবাকরবাবুই থেকে যাব আমি, লাভের মধ্যে তুমি আর একটু চড়া পর্দায় মেমসাহেব হয়ে আসবে।"

যুথিকা বলিল, "সে ভয় যদি থাকে তা হ'লে নিয়ে যেয়ো না আমাকে। কিন্তু বিলেতে গিয়ে দু বছরের কোর্স কী নেবে তা বুঝতে পারছি নে।"

দিবাকর বলিল, "সে কোর্স আরম্ভ হবে বোম্বায়ে জাহাজে পা দেওয়া থেকেই। আমার শিক্ষার অধ্যাপক অধ্যাপিকা হবে জাহাজের ইংরেজ ক্যাপ্টেন, ষ্টিউয়ার্ড, ইংরেজ যাত্রী-যাত্রিনী; ইংলণ্ডের রেলস্টেশনের ইংরেজ পোর্টার; ইংরেজ ল্যাণ্ডলেডীর ছেলেমেয়ের দল; ইংরেজ দাসদাসী, বন্ধুবান্ধব। ব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষা নিয়ে যেমন দ্বিজত্ব লাভ করতে হয়, তেমনি ইংরেজের কাছে দীক্ষা নিয়ে সাহেবিয়ানা লাভ করব আমি। তার মধ্যে দেশী রক্তের সংস্পর্শ রেখে জিনিসটাকে ভেজাল করব না। তারপর বছর দুই পরে লণ্ডনের সব চেয়ে অ্যারিস্টক্র্যাটিক দোকানের বিলিতী স্যুট পরে মুখে মূল্যবান মোটা চুরুটের সঙ্গে বিলিতী বুলি আওড়াতে আওড়াতে যখন ভারতবর্ষে এসে পদার্পণ করব, তখন তোমার এখানকার পাঞ্জাব আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম. এ. ডিগ্রী সেই বিলেত থেকে আনা বিলিতী সভ্যতার এক গণ্ডুষ জলের মধ্যে লজ্জায় ডুব মারবে।"

যূথিকার মনের অবস্থা প্রসন্ন ছিল না, তথাপি দিবাকরের কথার শেষাংশ শুনিয়া একটা ক্ষীণ অবাধ্য হাস্য মুহূর্তের জন্য অধর-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া মিলাইয়া গেল। মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "বিলেত থেকে আর একটা জিনিস যদি সঙ্গে আনতে, তা হ'লে ডুব মেরে আর উঠতে না।"

"কী জিনিস?"

"একটা ইংরেজ বউ।"

ক্ষণেকের জন্য দিবাকরের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই পরিহাসটা পরিপাক করিয়া লইয়া সহজ সুরে বলিল, "নিতান্ত মন্দ বল নি। তা হ'লে, এমন কি মিস্টার ফরেস্টারের পিঠ চাপড়ে একটা মধুর সম্পর্কের মিষ্ট সম্ভাষণ করা যেতেও পারত। কিন্তু ঠিক অতটা সৎসাহসের যোগান পাব বলে ভরসা হয় না।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া যূথিকা নীরবে বসিয়া রহিল।

দিবাকর বলিয়া চলিল, "তুমি হয়তো পরিহাস করছ, কিন্তু আমি করছি নে। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তা হ'লে আমি একটি ভদ্রলোককে সাক্ষী মানব, যাঁর কথা হঠাৎ মনে পড়ায় বিলেত যাবার সঙ্কল্প আমার মনে উদয় হয়। আমার বড়মামার ভায়রাভাই মিস্টার ডি. ভাটাচারিয়ার কথা বলছি। তিনি, অর্থাৎ শ্রীমান দেবদাস ভট্টাচার্য, থার্ড ক্লাস ফেলের বিদ্যে পেটে পুরে বিলেত গিয়ে কয়েক বৎসর সেখানে বাস করার পর টেমস্ নদীর জলে স্নান করে সাহেবত্ব পেয়ে দেশে ফিরে এলেন একেবারে ডি: ভাটাচারিয়া হয়ে। সাহেবী উচ্চারণের ইংরিজী কথার দাপটে বি. এ. পাস এম. এ. পাসরা ম্লান হয়ে গেল। তারপর ডি ভাটাচারিয়া একে একে হয়েছেন গোটা দুই ব্যাঙ্ক আর ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর, দেশের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, কয়েকটা অ্যাডভিসরি কমিটির মেম্বার, আরও অনেক কিছু যা আমি ঠিক জানি নে। উপস্থিত কলিকাতা শহরের তিনি একজন গণ্য এবং মান্য ব্যক্তি যার সঙ্গে আলাপ করে শহরের বড় বিলিতী ফার্মের হোমরা-চোমরা বড় সাহেব মেজ সাহেবরা আপ্যায়িত হয়। ডি ভাটাচারিয়ার নজরের সামনে তুমি আমাকে বিলেতে যেতে মানা করবে যূথিকা?"

শান্ত মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "না, করব না। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলবে?"

"কী কথা?"

"আমি যদি তোমার মূর্খ স্ত্রী হতাম, যদি কোন পাস-টাস না করতাম, তা হ'লে তুমি বিলেত যেতে?"

"উপস্থিত এখন? না, কখনই যেতাম না। কখনও যদি দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে শখ করে যেতাম তো সে কথা আলাদা।"

"তা হ'লে এ কথা তোমাকে বলা যেতে পারে যে, উপস্থিত আমার জন্যে তুমি বিলেত যাচ্ছ?"

"নিশ্চয় বলা যেতে পারে, কারণ পাঞ্জাব মেলের গার্ডের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল কিংবা রাজসাহীতে ভিজিটার্স বুক উপলক্ষে সেদিন যে ঘটনা ঘটল, তার মত আরও দু-চারটে ঘটনা আমার জীবনে ঘটে তা আমি একেবারেই চাই নে। সেই জন্যে তোমার উপযুক্ত হওয়ার চেষ্টায় আমাকে বিলেত যেতে হবে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেই উপস্থিত আমার সব কথা জিজ্ঞাসা করা হয়।"

"কী বল?"

কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হইল না। বারান্দার অপর প্রান্তে বাঁকের অন্তরাল হইতে এক মুখ হাসি লইয়া সহসা আবির্ভূত হইল ক্ষীরোদবাসিনী।

ক্ষীরোদবাসিনীকে দেখিয়া দিবাকর ও যূথিকা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "এস এস ক্ষীরোদ-ঠাকুমা। স্বাগতম, সুস্বাগতম! কিন্তু শিবানী কই?"

আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এসেছে বই কি, পেসন্নর কাছে বসে গল্প করছে। আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যুগল মিলন দেখতে এলাম।"

যূথিকা তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া নত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

বত্রিশ

দক্ষিণ হস্তের স্পর্শের দ্বারা যূথিকার চিবুক চুম্বন করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী আশীর্বাদ করিলে যূথিকা ক্ষীরোদবাসিনীকে হাত ধরিয়া সযত্নে লইয়া গিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করাইল। তাহার পর সে এবং দিবাকর অপর দুইখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

প্রসন্নমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, চুরি করে যা দেখতে এসেছিলাম সেই যুগল-মিলন দেখে সত্যিই চোখ জুড়োল। কিন্তু এমন চমৎকার রাধিকা কী করে পেলি দিবাকর?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "পাঞ্জাবে লাহোর নামে এক বৃন্দাবন আছে, সেখানে বেড়াতে গিয়ে।—হঠাৎ।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "হঠাৎ এ জিনিস পাওয়া যায় না। অনেক দিনের তপস্যার ফলে পেয়েছিস।"

দিবাকর বলিল, "সে কথা যদি বল, তা হ'লে মাত্র দিন-চারেক তপস্যার ফলেই পেয়েছি।"

মৃদু হাসিয়া' ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "ভুল করছিস দিবাকর। দিন-চারেক তপস্যা করেছিলি লাহোরে গিয়ে, তার আগে মনে মনে অনেক দিন করেছিলি।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া বিস্ময়চকিত কৌতুকে দিবাকরের এবং বৃথিকার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইল। পরমুহূর্তে ক্ষীরোদবাসিনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "মনে মনে তপস্যা কার জন্যে করেছিলাম সে কথা জানতে যদি কৌতূহল হয়, তা হ'লে তোমার নাতবউকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার। ডেলিভারি দেবার সময় নিয়তি তপস্যার বর অদলবদল করে ফেলেছে। তার ফলে আর কারও তপস্যার ধন গোলেমালে আমার ভাগ্যে এসে উঠেছে। ছিলাম নীলকান্তমণির প্রত্যাশী, পেয়ে গেছি কমল হীরে।" বলিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

কমল-হীরে না-হয় কতকটা বোঝা গেল, কিন্তু নীলকান্তমণির দ্বারা দিবাকর ঠিক কী বুঝাইতে চাহে তাহা ভাবিতে গিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল। বিশেষত, প্রথম দিনের সাক্ষাৎ কালে হীরার আংটি এবং নীলার আংটি প্রসঙ্গে দিবাকর যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার সহিত জড়িত হইয়া এই খট্‌কাটা আরও বেশী জটিল হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, জটিলতার মেঘাবরিত আকাশে কালোমানিকের কথাটাও কোনো দিক দিয়া কেমন করিয়া অকস্মাৎ একবার ঝিলিক মারিয়া মিলাইয়া গেল। কিন্তু কোনও দিক দিয়া কোন প্রকার যোগসূত্র ধরিতে না পারিয়া ক্ষীরোদবাসিনী সাধারণ ভাবে দিবাকরের কথার উত্তর দিয়া বলিল, "এ অদলবদলের কথা নয় দিবাকর, এ ভাগ্যের কথা। ভাগ্য যখন প্রবল হয়, তখন ধুল-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হয় সে কথা শুনেছিস তো? এ সেই প্রবল ভাগ্যের কথা। তোর কপালে যখন কমল হীরে রয়েছে, নীলকান্তমণি চাইলে কী হবে?"

এ কথার কোনও বাচনিক উত্তর না দিয়া দিবাকর শুধু একটু হাসিল। মনে মনে বলিল, ভাগ্য প্রবলই শুধু নয় ক্ষীরোদ ঠাকুমা, প্রবলতর। মনেপ্রাণে যে জিনিস পরিহার করতে চেয়েছিলাম, কপালে সেই জিনিসই এসে জুটেছে।

বৃথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কিন্তু তপস্যা শুধু দিবাকরকেই করতে হয়নি ভাই নাতবউ, তোমাকেও করতে হয়েছিল। তুমি যা পেয়েছ, তাও তপস্যা করেই পেতে হয়। স্বীকার কর কি না?"

স্মিতমুখে মৃদুস্বরে বৃথিকা বলিল, "নিশ্চয় করি ঠাকুমা।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দিবাকর বলিল, "তা হলেই হয়েছে। আমার মতো বর্বর বর যদি তপস্যা করে পেতে হয়, তা হ'লে সে তপস্যার ষোল আনাই ফাঁকি।"

চক্ষে তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি হানিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কিসে তুই বর্বর শুনি?"

সে কথার উত্তর না দিয়া মাথা নাড়িয়া বারান্দার প্রান্তভাগে ইঙ্গিত করিয়া দিবাকর বলিল, "ঐ দেখ কে আসছে।" বারান্দা পর্যন্ত শিবানীকে পৌঁছাইয়া

দিয়া আনন্দ তখন ফিরিয়া যাইতেছিল। পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এই যে আমার কালোমানিক এসে পড়েছেন। মিনিট পনেরো দেরি ক'রে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু সে সবুর সয় নি।"

স্মিতমুখে সকুণ্ঠপদে শিবানী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। পরিধানে তাহার বেগুনফুল রঙের হাল্কা ঢাকাই শাড়ি। সেই সমগোত্রী আবেষ্টনের মধ্যে তাহার দেহের শ্যামল শ্রী নীলকান্ত মণির মতোই দেখাইতেছিল।

যূথিকার নিকট উপস্থিত হইয়া শিবানী মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম বউদিদি।" তাহার পর নত হইয়া যূথিকার পদধূলি গ্রহণ করিল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া শিবানীকে জড়াইয়া ধরিয়া যূথিকা তাহাকে পার্শ্ববর্তী চেয়ারে বসাইয়া স্মিতমুখে বলিল, "কতদিন এসেছ, আর এত দেরি করে বউদিদির সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয় ভাই।"

এ কথার উত্তর দিল ক্ষীরোদবাসিনী—"তাই কি আজই সহজে আসতে চায়! কত ওজর আপত্তি করে কত ভয়ে ভয়ে তবে এসেছে।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কেন ভয় কিসের ঠাক্‌মা?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এম. এ. পাস বউদিদিকে লেখাপড়া না জানা ননদের যা ভয়! একেবারে লেখাপড়া জানে না, সে কথা বললে অবিশ্যি অন্যায় বলা হয়। বাংলা লেখাপড়া নিতান্ত মন্দ জানে না। কিন্তু রোগে-শোকে, অভাবে কষ্টে ইংরিজী স্কুলে তো তেমন পড়তে পারলে না, সেইজন্যে ইংরিজী তেমন কিছু শেখে নি।"

কৌতূহলের বশবর্তিনী হইয়া যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তবু কতটা শিখেছে?"

শিবানীর দুই চক্ষে ভ্রূকুটির ভৎর্সনা লক্ষ্য করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী সহাস্য মুখে বলিল, "ঐ দেখ, চোখ রাঙিয়ে শিবু আমাকে বলতে মানা করছে। তোর বউদিদি তো দিবাকরের চেয়েও কত বেশি লেখাপড়া জানে, তবে তোরই বা এত লজ্জা কিসের? তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "অবিশ্যি বলতে যে ও মানা করছে তা অন্যায় নয়; বলবার মতো এমন কিছুই নেই। ইংরিজীর ফার্স্ট বই পড়ছে শিবু; তাও সবটা এখনও শেষ করতে পারে নি।"

শিবানীর দিকে চাহিয়া সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "এতে লজ্জা করবার তো কিছু নেই শিবানী। তুমি তো ইংরেজের মেয়ে নও যে, ইংরিজী না-জানা তোমার পক্ষে লজ্জার কথা। কী হবে মিছিমিছি কতকগুলো ইংরিজী পড়াশুনো করে?"

বিস্মিত কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "মিছিমিছি ইংরিজী পড়াশুনো করে! কিন্তু এতটা লেখাপড়া করে এ কথা তোমার মুখে তো সাজে না ভাই নাতবউ।"

কিন্তু এ কথা যে যূথিকার অন্তরের কথা নহে, মুখেরই কথা, সুতরাং মুখেই সাজে সে কথা কেমন করিয়া সে বলে। সাজাইয়া একটা কোনও

কথা বলিতে গেলে পাছে তাহার সূত্র ধরিয়া অপর কোনও কঠিনতর কথা আসিয়া পড়ে সেই আশঙ্কায় মৃদু হাস্যের দ্বারা সে এ প্রসঙ্গের শেষ করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু যূথিকার এই নিরুত্তরতার ছেদই ক্ষীরোদবাসিনীর মনে কৌতূহল জাগাইয়া তুলিল। মনে হইল, এই ছেদ যথার্থ ছেদ নহে; ইহার পরও এমন কিছু আছে যাহা সহজে বলা যায় না বলিয়াই হাসি দিয়া ঢাকিবার যোগ্য। দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "কী ব্যাপার বল দেখি দিবাকর।"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "কিসের কী ব্যাপার!"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "নাতবউয়ের মুখে ইংরিজী লেখাপড়ার বিষয়ে এই সব কথা, নাতবউয়ের এই ভাব এই মূর্তি! আমি তো একটা উগ্রচণ্ডা মেমসাহেবী ভাব দেখব বলে কতকটা ভয়ে ভয়েই এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখি একেবারে উল্টো মূর্তি! মুখে খৈ ফোটা কথা নেই, কথায় ইংরিজী বুলির বুকনি নেই, হাল ফ্যাশানের যখন তখন হাসি নেই। দেখতে আমার কিছু বাকি নেই তো দিবাকর। উনি বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে দার্জিলিঙে মামার বাড়ি গিয়ে কাটিয়ে আসতাম। আর, তুই জানিস দার্জিলিং হচ্ছে ফ্যাশনওয়ালা বাঙালী মেয়েদের টেক্কা দেবার জায়গা। আমি মনে করে এসেছিলাম, নাত-বউকে সেই গোত্রেরই একটি নাকে-মুখে-চোখে কথা কওয়া মেয়ে দেখব। কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত দেখছি!"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "গ্রহণ দেখেছ ক্ষীরোদ ঠাক্‌মা?"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এতখানি বয়স হলো 'গ্রহণ দেখেছ' কী রকম?"

"তোমাদের নাতবউয়ে সেই গ্রহণ লেগেছে। রাহুগ্রস্ত হয়েছেন তোমাদের নাতবউ।"

"রাহু কে? তুই?"

"আমি তো খানিকটা নিশ্চয়ই; তা ছাড়া আমাদের বাড়ির আবহাওয়া, আমাদের বাড়ির সংস্কার, ইতিহাস।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সব কথা তোর বুঝতে পারি নে, কিন্তু এমন চকচকে-চাঁদে গ্রহণ লাগিয়ে জ্যোৎস্না থেকে নিজেকে বঞ্চিত করিস্ নে দিবাকর।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার মুখ্ দিয়ে যে রীতিমত কাব্য বের হতে আরম্ভ করল ক্ষীরোদ ঠাক্‌মা।"

এ কথার উত্তর দিবাকরকে না দিয়া যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীরোদ-বাসিনী বলিল, "আচ্ছা, তুমিই বিচার কর ভাই যূথিকা, যে কথা আমি বলছি তা কাব্য, না খাঁটি সত্যি কথা?"

ক্ষীরোদবাসিনী এবং দিবাকরের মধ্যে যে প্রবাহে কথোপকথন চলিয়াছিল,

শুরু হইতেই যূথিকা মনে মনে তাহা অপছন্দ করিতেছিল। নিজেকে কোনও প্রকারে তাহার মধ্যে লিপ্ত না করিবার আগ্রহে সে বলিল; "আপনারা নাতি ঠাকুমার কাব্য করছেন, আমি তার মধ্যে কী বলব বলুন? আপনারা দুজনে কথাবার্তা বলুন, শিবানীকে আমি একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শিবানীও এ প্রস্তাবে অতিশয় খুশি হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

বিস্মিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কোথায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবে?"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল "বেশী দূরে কোথাও নয়, এ ঘর ও ঘর—বড় জোর, পিছন দিকে বাগানে একটু।"

প্রসন্নমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আমার কালোমানিককে তোমার ভালো লেগেছে ভাই?"

খুব ভালো লেগেছে। আপনার কালোমানিক অনেক সাদামানিকের চেয়েও ভালো" বলিয়া শিবানীকে লইয়া যূথিকা প্রস্থান করিল।

সেই দিন রাত্রে শয়নকক্ষে দিবাকরের সহিত যূথিকা মিলিত হইলে কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "শিবানীকে তোমার কেমন লাগে?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "ভালোই লাগে।"

"আচ্ছা, শিবানী তোমার নীলকান্তমণি দলের মেয়ে, না? যে দলের মেয়ের জন্য বিয়ের আগে তুমি প্রত্যাশী ছিলে?"

পুনরায় এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হয়তো বলতে পারো।"

"শিবানীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে বেশ হতো, না।"

অল্প একটু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "এর উত্তরে আমি যদি বলি, সুনীথদাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে বেশ হতো, না। তা হলে কী বলবে।"

"তা হ'লে বলব, আমার কথার উত্তর না দিয়ে কথাটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।"

"সে কথার উত্তরে আমি বলব, রাত হয়েছে শুয়ে পড়। তর্কটা ক্রমশ এমন জায়গায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে, যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা কোনও রকম বোঝাপড়া হওয়ার চেয়ে না হওয়াই বোধ হয় অনেক সময়ে সম্ভব।" বলিয়া দিবাকর শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লেপ টানিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে দশটা আন্দাজ যূথিকা তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, এমন সময়ে দিবাকর প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "একটি ছেলের পক্ষ থেকে তোমার কাছে দরবার করতে এলাম, যূথিকা।"

কলমটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যূথিকা বলিল, কী, বলো?"

"অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে তোমার অটোগ্রাফের জন্মে খাতা দিয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। এমন অবলীলার সঙ্গে সে

আমাকে এই কাজে লাগিয়েছে যাতে মনে হয় যে, মূর্খ স্বামীকে দিয়ে বিদুষী স্ত্রীর অটোগ্রাফ যোগাড় করিয়ে নিলে মূর্খ স্বামীকে আপ্যায়িত করাই হবে—এই তার ধারণা। আমি কিন্তু অরুণের খাতার সঙ্গে আরও একটা খাতা এনেছি।"

"সেটা কার খাতা ?"

"সেটা আমার। দেরাজের মধ্যে অনেক দিন থেকে একটা বাঁধানো পকেটবুক ছিল, সেইটেই আমার অটোগ্রাফের খাতা করেছি। তাতে প্রথম অটোগ্রাফ সংগ্রহ করব তোমার। তারপর সুনীথদাদা প্রভৃতির। জগতে অনেক জাত আছে—যেমন হিন্দু-অহিন্দু, ধনী দরিদ্র, সাদা-কালো। তেমনি আরও দুটো জাত আছে। প্রথম জাত, যারা অটোগ্রাফ নেয়; আর দ্বিতীয়, যারা অটোগ্রাফ দেয়। আমি প্রথম জাতের অন্তর্গত, তুমি দ্বিতীয় জাতের। আমার খাতায় তোমার অটোগ্রাফ দাও, যূথিকা।"

হাত বাড়াইয়া যূথিকা বলিল, "কই, খাতা দেখি।"

পকেট হইতে দুইখানা খাতা বাহির করিয়া দিবাকর যূথিকার সম্মুখে স্থাপন করিল।

দিবাকরের খাতাখানা বাছিয়া লইয়া খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় যূথিকা ধীরে ধীরে স্পষ্টাক্ষরে লিখিল, "সাধারণ অবস্থায় এবং সাধারণ ধারণায় কোন বস্তু যতই উপকারী এবং মঙ্গলপ্রদ হউক্ না কেন, কোন বিশেষ অবস্থায় তাহা যদি অশুভকর হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই আপাতমঙ্গলপ্রদ বস্তুকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।" তাহার পর নিজের নাম ও তারিখ লিখিয়া দিবাকরের হস্তে ফিরাইয়া দিল।

পড়িয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "এই আপাতমঙ্গলপ্রদ বস্তুটি কে, যূথিকা ? আমি না-কি ?"

যূথিকা বলিল, এখনও তো তেমন কথা মনে হয় না। কিন্তু তোমাকে উদ্দেশ করে যখন লিখেছি, তখন আমিও হতে পারি।"

"আচ্ছা, সে বিচার পরে করলেই হবে, আপাতত তোমাকে শত ধন্যবাদ। এবার এ খাতায় কিছু লিখে দাও।" বলিয়া দিবাকর অপর খাতাখানা যূথিকার দিকে একটু ঠেলিয়া দিল।

খাতাখানা তুলিয়া দিবাকরের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া যূথিকা বলিল, "এ খাতায় একটি অক্ষরও লিখব না। তোমার খাতাতেই আমি শেষ অটোগ্রাফ লিখলাম।"

"কিন্তু ওকে আমি কথা দিয়েছি।"

'এবার তা হ'লে কথার খেলাপ হলো। এর পর আর কাউকে কখনও কথা দিয়ো'না।"

দিবাকর পুনরায় কী বলিতে যাইতেছিল, করজোড়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে যূথিকা

বলিল, "আমাকে ক্ষমা করো, আমার বেশি সময় নেই, এই জরুরী চিঠিটা আমাকে শেষ করতে হবে।"

সেই দিনই অপরাহ্নকালে সেই জরুরী চিঠিটা দিবাকরের হস্তে আসিয়া পৌঁছিল।

তেত্রিশ

জমিদার সেরেস্তায় নিজের অফিস-ঘরে বসিয়া দিবাকর কাগজ পত্র দেখিতেছিল, এমন সময়ে যোগমায়া বালিকা-বিদ্যালয়ের এক পিওন আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া তাহাকে একটা খামে মোড়া চিঠি দিল। খামের উপরে যূথিকার হস্তাক্ষর। পিওন-বুকে সই করিয়া পিওনকে বিদায় দিয়া খাম খুলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত চিঠির স্বল্পসংখ্যক কথার কোনওটাই সংক্ষিপ্ত বলিয়া দিবাকরের মনে হইল না; প্রত্যেকটাই যেন দৃঢ়তা এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার প্রকাশে মুখর। ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে যোগমায়া-বালিকা বিদ্যালয় সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করিবার নোটিশ দিয়াছে যূথিকা। নোটিশ দিয়াছে বটে, কিন্তু সেই নোটিশের মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই, উত্তাপ নেই, হেতুপ্রদর্শন নেই—শুধু আছে বিদ্যালয়ের সংস্রব হইতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করিবার সংকল্পের এমন একটা সংক্ষিপ্ত প্রকাশ, যাহার সহজ কথার দ্বারা আবৃত হইলেও কার্যত যাহাকে বাতিল করা সহজ বলিয়া মনে হয় না।

চিঠিখানা আর একবার পাঠ করিয়া খামে পুরিয়া পকেটে রাখিয়া দিবাকর ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। বিস্ময়াহত মনে প্রথমটা উৎপন্ন হইয়াছিল বিরক্তি। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই বিরক্তি ক্রোধে রূপান্তরিত হইল। মনে হইল, যূথিকার এই পদত্যাগের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে তাহাকে একটা বিরোধের মধ্যে আহ্বান ছাড়া আর কিছুই নহে। স্কুলে গিয়া একটা অতি সংক্ষিপ্ত পত্রের দ্বারা যূথিকার আবেদন মঞ্জুর করিয়া পিওন-বুক দিয়া সেই পত্র যূথিকার নিকট পাঠাইয়া দিল।

মনটা এমনই খিঁচড়াইয়া গিয়াছিল যে, সন্ধ্যাকালে শিবানীদের গৃহে গিয়াও বিশেষ কিছু তাহার উপশম হইল না। পড়া দিতে দিতে সামান্য দুই একটা ভুলভ্রান্তির জন্য বেচারা শিবানী অনভ্যস্ত ভর্ৎসনায় ভর্ৎসিত হইল, এবং ক্ষীরোদবাসিনী তাহার অভ্যস্ত রহস্যালাপের উত্তরে দিবাকরের নিকট হইতে সহজ এবং অসরস উত্তর পাইয়া অগত্যা ক্ষান্তি মানিল।

গৃহ প্রত্যাগমনের পূর্বে দিবাকর শিবানীর অসাক্ষাতে ক্ষীরোদবাসিনীকে বলিল, 'কাল তোমরা আমাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলে, সে ভালোই

করেছিলে। কিন্তু আর বেশী গিয়ে টিয়ে কাজ নেই ক্ষীরোদ ঠাক্‌মা।'

দিবাকরের এই রহস্যজনক নিষেধবাক্য শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "বেশি এমনিই হয়তো যেতাম না, তার উপর তুই যখন মানা করছিস তখন তো নিশ্চয়ই যাব না। কিন্তু এ মানা করবার কারণ কী হয়েছে, তা তো বুঝতে পারছি নে দিবাকর।"

কথাটাকে এড়াইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে পরিহাসের লঘু ভঙ্গীর আশ্রয় লইয়া দিবাকর বলিল, "কী দরকার ঘন ঘন বড়লোকের বাড়ি গিয়ে?"

তেমনই বিস্মিত কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "বড়লোকের বাড়ি গিয়ে? কিন্তু বাড়ি তোর, বড়লোক তো তুই।"

"আমি বড়লোক হতে পারি, কিন্তু বড়লোকের বাড়ি তো আমি নই।" বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনীকে আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর প্রস্থান করিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ক্ষীরোদবাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ঠিক যে কথাটা তাহার জানিবার প্রয়োজন ছিল, কথার ফাঁকি রচনা করিয়া দিবাকর তাহা চাপা দিয়াই গেল। দিবাকরের রহস্যজনক কথাবার্তা হইতে কালই ক্ষীরোদবাসিনীর মনে যে সংশয় জাগিয়াছিল, আজ তাহা তাহার অসরস আচরণ এবং প্রস্থানকালীন সমস্যাপূর্ণ কথাবার্তার দ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। দিবাকরদের গৃহে যূথিকা এবং শিবানীর মধ্যে জনান্তিকে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা জানিয়া এবং তদ্বিষয়ে জেরা করিয়াও ক্ষীরোদবাসিনী কোনও সুবিধাজনক সূত্রের সন্ধান পাইল না।

শিবানী বলিল, "না ঠাক্‌মা, বউদিদি ভারি চমৎকার মানুষ। আমাদের যাওয়াতে একটুও তিনি বিরক্ত হন নি; বরং মধ্যে মধ্যে আমাদের যাবার জন্যে অনুরোধই করেছেন। নিজেও তিনি শিগগির একদিন আসবেন বলেছেন।"

"দিবাকর যে তোকে ইংরিজী পড়াচ্ছে, সে কথা যূথিকাকে বলিস নি তো শিবু?"

"তুমি যখন বলতে মানা করেছ, তখন কী ক'রে বলি? কিন্তু সে কথা বউদিদিকে বলতে মানা কেন, তা আমি একটুও বুঝতে পারি নে ঠাক্‌মা।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "শুধু বউদিদিকে বলতে মানা নয় শিবু, দিবাকর যে তোর মাস্টারি করছে—এ কথা কেউ জানে তা তার ইচ্ছে নয়।"

"এ কথা দিবাকরদাদা তোমাকে বলেছেন?"

স্মিতমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "না বললে আমি কী করে জানব রে?"

যে অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া দিবাকরসম্পর্কিত সমস্যাটা আবর্তিত হইতেছিল, তাহার সহিত শিবানী কোনও প্রকারে জড়িত ছিল কি না, তাহা জানিবার জন্য ক্ষীরোদবাসিনী মনে মনে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। শিবানীর সহিত কথাবার্তা কহিয়া, তাহার কোনও হদিস মিলিল না। অথচ সেই সন্দেহটাই তাহার মনের

মধ্যে ক্রমশ পীড়াদায়ক হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেই দিন রাত্রে যূথিকার সহিত দেখা হইলে দিবাকর বলিল, "এর মানে কী জানতে চাই।"

শান্তকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কিসের মানে ?"

"তোমার চিঠির।"

"উত্তর যখন ঠিক দিয়েছ, তখন আমার চিঠির মানে তো তুমি ঠিকই বুঝেছ।"

যূথিকার উত্তরের এই ভঙ্গি বিদ্রূপাত্মক মনে করিয়া দিবাকর মনে মনে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, তা তো বুঝেছি। কিন্তু এতগুলো টাকা খরচ করিয়ে স্কুলের ব্যাপারে আমাদের নাবিয়ে তারপর তোমার এই আচরণের কী মানে তাই বুঝতে পারছি নে।"

এ অভিযোগের বিরুদ্ধে যূথিকার যাহা কিছু বলিবার ছিল একটি বাক্যও তাহার না বলিয়া সে বলিল, "এই আচরণের দ্বারা আমি অপরাধ করেছি বলে তোমার যদি মনে হয়, তা হ'লে আমাকে দণ্ড দাও।"

ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "মাঝে মাঝে দণ্ড চাইবার চমৎকার অভ্যাস আছে তোমার দেখছি।"

"অভ্যাস নেই—যখন তুমি আমাকে অপরাধী কর তখনই দণ্ড চাই।"

'কী দণ্ড দোব শুনি ?"

"আমি গরীবের মেয়ে, অর্থদণ্ড দিয়ে তোমাদের ক্ষতিপূরণ করি সে সাধ্য আমার নেই। শারীরিক দণ্ড দাও। তোমাদের জাঁতাঘর আছে ঢেঁকিশাল আছে, গোয়ালঘর আছে,—সে সব জায়গায় আমার দণ্ডের ব্যবস্থা করতে পার। তাতে যদি তোমাদের সম্মানের হানি হয় তা হ'লে দশ রাত্রি বল, পনেরো রাত্রি বল, খালি গায়ে ভূমির ওপর বারান্দায় শুয়ে শীতের রাত কাটাতে পারি।"

যূথিকার দুই চক্ষু দিয়া বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। পাশের দিকে অল্প একটু ফিরিয়া চক্ষু মুছিয়া লইয়া সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দিবাকর দেখিল, কিছু পূর্বে যাহা জল ছিল, জমিয়া তাহা বরফ হইয়াছে; এখন তাহাকে চূর্ণ করা সহজ, কিন্তু ইচ্ছামত প্রবাহিত করানো কঠিন।

ক্রোধের উপর সহসা একটা দুর্মদ অভিমান আসিয়া ভর করিল, গভীর স্বরে সে বলিল, "কালই আমি স্কুল উঠিয়ে দেব।"

যূথিকা বলিল, "তোমার স্কুল তুমি যদি উঠিয়ে দেওয়া ভালো মনে কর তা হ'লে উঠিয়ে দেবে বই কি।"

"এখন থেকে তা হ'লে 'তোমার আর আমার' চলতে আরম্ভ করল ?"

দিবাকরের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, "আমার নিজের আর এমন কী আছে যাতে 'আমার' চলতে পারে ? যা কিছু সবই তো তোমার।"

"উপস্থিত তো দেখছি একটা জিনিস ছাড়া।"

যূথিকার অধরপ্রান্তে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। বলিল, "আমার কথা

বলছ ? কিন্তু উপস্থিত দেখছ না, গোড়া থেকেই দেখছ। আমি যখন নীলকান্তমণি দলের মেয়ে নই, তখন কী ক'রে আমাকে তোমার জিনিস বলে দেখতে পার ?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "একটা মানুষকে হাতের মধ্যে পাওয়াই তো ষোল আনা পাওয়া নয়, মনের মধ্যে পাওয়াই যথার্থ পাওয়া। মনের মধ্যে গ্রহণের অযোগ্য মনে করে আমাকে যখন মনের মধ্যে গ্রহণ কর নি, তখন 'একটা জিনিস ছাড়া'—সে কথা নিশ্চয় বলতে পার।"

দিবাকর বলিল, "তুমি কিন্তু আমাকে গ্রহণের অযোগ্য মনে করেও দয়া করে স্বামী বলে গ্রহণ করেছ ? মনের মধ্যে গ্রহণ করেছ কি না সে কথা অবশ্য বলতে পারি নে।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার দুই চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "তবে কেন তোমাকে গ্রহণ করেছি ? তোমার টাকার লোভে ?"

দিবাকর বলিল, "তা আমি জানি নে।"

সেইরূপ প্রজ্বলিত নেত্রে যূথিকা বলিল, "জানো। সেই কদর্য ইঙ্গিতই তুমি করছ। তুমি অর্থবান, অর্থের প্রতি তাই তোমার মোহ আর বিশ্বাসের অন্ত নেই। আমরা, গরিবেরা, অর্থকে ঘৃণার সঙ্গে অবহেলা করতে জানি। শোন,—এ কথার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া দরকার। আজ আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি—তুমি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর।" বলিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কী তোমার চ্যালেঞ্জ ?"

যূথিকা বলিল, "তোমার যা কিছু আছে তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত দান করে, বিলিয়ে দিয়ে তুমি আমার নিঃস্ব দরিদ্র স্বামী হও। আমি নিজে উপার্জন করে আমাদের দুজনের সংসার চালাব। সে সংসারে সুখ না থাকুক, শান্তি থাকবে। পারবে তুমি এমন করে আমার ভালবাসার পরীক্ষা নিতে ? কখনও পারবে না। শুধু পারবে আপনার জমিদারির তক্তে কায়েম হয়ে থেকে মাঝে মাঝে আমাকে অপমান করতে। রইল তোমার কাছে আমার এই চ্যালেঞ্জ।" বলিয়া আর কোনও কথার জন্যে অপেক্ষা না করিয়া একটা দমকা হাওয়ার মতো সে সবেগে প্রস্থান করিল।

দাম্পত্য কলহের প্রতি শাস্ত্রের একটা উপেক্ষাবাণী আছে। এ ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু ঠিক খাটিতে দেখা গেল না। ইহার পর কিছুদিনের জন্য যূথিকা এবং দিবাকরের মধ্যে চলিল একটা নিঃশব্দপ্রায় অসহযোগের পালা। অনন্য-চিত্তে একজন ডুব মারিল সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়নে অপরে প্রবৃত্ত হইল ইংরেজী ভাষার অধ্যাপনায়।

চৌত্রিশ

ফাল্গুন মাসের শেষের দিক। কয়েক দিন হইল শীত তাহার আধিপত্যের শেষ খোঁটা তুলিয়া লইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। বারান্দার নিকটবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটা নিমগাছ হইতে ক্ষণে ক্ষণে নিমফুলের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছিল।

বেলা তখন সাড়ে দশটা। সুনীথের উপহার দার্শনিক গ্রন্থাবলীর কয়েক খণ্ড লইয়া যূথিকা বারান্দায় টেবিলের সম্মুখে বসিয়া পাঠ করিতেছিল। পাঠ অবশ্য তাহাকে ঠিক বলা চলে না, কারণ সে পাঠের মধ্যে যূথিকার স্বভাবগত নিবিষ্টচিত্ততার পরিচয়ের পরিবর্তে একটা চঞ্চলতাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। কোনও একটা বই লইয়া এক আধ পৃষ্ঠার অধিক পাঠ না করিয়াই সে অপর একটা বই খুলিতেছিল, এবং অপর আর একটা বই খুলিবার জন্য সে বইটা বন্ধ করিতেও অধিক বিলম্ব হইতেছিল না। স্বল্পাবশিষ্ট সময়ের মধ্যে বহু বিষয়ের আস্বাদ লইতে হইলে যে অবস্থা মানুষের হয় তাহার যেন ঠিক সেই অবস্থা। কিছুদিন হইতে মনের মধ্যে যে ইচ্ছা আকার লইয়া ক্রমশ সঙ্কল্পে পরিণত হইতে চলিয়াছে, এ বোধ করি তাহারই নিদর্শন।

দিবাকর আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া যূথিকার সম্মুখে উপবেশন করিল।

যে বইটা পড়িতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যূথিকা বলিল, "কিছু বলবে?"

পকেট হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া দিবাকর বলিল, "দেবদাস মামার চিঠি এসেছে। দেবদাস মামা, অর্থাৎ ডি. ভাটাচারিয়া, যার কথা একদিন তোমাকে বলেছিলাম।"

"মনে আছে। কী লিখেছেন তিনি?"

"আমার বিলেতে যাওয়ার বিষয়ে সাহায্য করতে আমি তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে রাজি হয়েছেন। পাসপোর্ট যোগাড় করে দেওয়া থেকে পোষাক তৈরি করানো পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করে দেবেন লিখেছেন। আমাকে একবার কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

"সুনীথদাদাও বিলেতে গিয়েছিলেন—তাকে চিঠি লিখলে না কেন?"

দিবাকর বলিল, "দুটো কারণে। প্রথমত, তিনি হয়তো আমার বিলেত যাওয়ার প্ল্যানটা ভেস্তে দিতে চেষ্টা করতেন। এবং দ্বিতীয়ত, ভেস্তে না দিলেও হয়তো এমন একজন দুর্দান্ত পণ্ডিতের কাছে আমাকে পাঠাতেন যার কাছে গিয়ে আমিও বোকা বনে যেতাম। ডি. ভাটাচারিয়া আমাকে পাঠাবেন

মিসেস প্রীচার্ডের কাছে। ভাটাচারিয়া লিখেছেন, মিসেস প্রীচার্ড আর গুটি দুই-তিন মিস প্রীচার্ড মিলে দলন-মলন আর পালিশ-বুরুশ করে আমাকে এমন এক ঘোড়া বানিয়ে দেবে যে, বছর দুয়েকের মধ্যে আমার মুখ দিয়ে ইংরিজী ভাষার হ্রেষা ছুটতে থাকবে। যেমন রুগী তেমনি ডাক্তার তো চাই।"

"মিসেস প্রীচার্ড কে?"

"মিসেস প্রীচার্ড আমাদের মতো গর্দভচন্দ্রদের অধমতারণ ল্যাণ্ডলেডি, গাধা পিটে ঘোড়া করা তার ব্যবসা। ভাটাচারিয়ার চিঠি পড়ে দেখলে সব বুঝতে পারবে।" বলিয়া দিবাকর চিঠিখানা যূথিকার সম্মুখে স্থাপন করিল।

চিঠি পড়িবার কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া যূথিকা বলিল, "কবে তুমি বিলেত যাবে?"

"জুলাই মাসের শেষের দিকে, কিংবা আগস্ট মাসের গোড়ায়।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কী ভাবিয়া লইয়া যূথিকা বলিল, "কিছুকাল আগে তোমাকে আমি যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম, সে সমস্তই আজ প্রত্যাহার করছি। আমার সেদিনকার উদ্ধত আচরণ তুমি ক্ষমা কর।"

দিবাকর মনে করিল, তাহার বিলাত যাইবার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত দেখিয়া যূথিকা ভীত এবং অনুতপ্ত হইয়াছে। মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, "যা তোমার ইচ্ছে।"

কিন্তু তাহার এ ধারণা অপসৃত হইতে বিলম্ব হইল না। যূথিকা বলিল, "আমার আর একটা আচরণও তোমাকে ক্ষমা করতে হবে।"

"কী আচরণ?"

"তোমার বিলেত যাবার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাব। আমার সেই আচরণ।"

বিস্মিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এখান থেকে চলে যাবে? কোথায় যাবে? বাপের বাড়ি লাহোরে?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না, লাহোরে নয়, যেখানে আশ্রয় পাব সেখানে।"

তীক্ষ্ণস্বরে দিবাকর বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে, কোনও মেয়ে-স্কুলে মাস্টারি করে নিজের খরচ চালানোর ব্যবস্থা করা।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখমণ্ডলে একটা রুক্ষ কর্কশ ভাব নামিয়া আসিল। ভাটাচারিয়ার চিঠির গুণে যেটুকু প্রসন্নতা লইয়া সে আসিয়াছিল, তাহা নিঃশেষে অন্তর্হিত হইতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। কুঞ্চিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কেন? সে সময়ে স্বামীর টাকায় খরচ চললে আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে নাকি?"

যূথিকা বলিল, "দেখ, তুমি যদি তোমার আত্মসম্মান বজায় রাখবার

জন্যে বিলেত যেতে পার, তা হ'লে আমার আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে আমি উপার্জন করতে গেলে এমন কিছু অন্যায় হয় কি? কোন স্বামী যদি এই কথা মনে করে যে, তার স্ত্রী তাকে মনের মধ্যে গ্রহণ করেছে কি-না তা অনিশ্চিত, কিন্তু বাইরে গ্রহণ করেছে টাকার লোভে, তা হ'লে সে স্বামীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া আর অনাত্মীয় কোনও লোকের কাছে ভিক্ষা করা—এই দুইয়ের মধ্যে খুব বেশী প্রভেদ থাকে কি? নিজেকে হীন হতে না দেওয়ার অধিকার সকলেরই থাকা উচিত—এ কথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে।"

তীক্ষ্ণ তিক্ত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এসব কথা তুমি বলতে পারছ শুধু তোমার ইংরিজী বিদ্যের অহঙ্কারে। তুমি জানো, একটা দেড়শো দুশো টাকার চাকুরী জোগাড় করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না, তাই তোমার এত দুঃসাহস।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মুখে একটা আর্ত হাসি দেখা দিল। মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "সে কথা যদি মনে কর, তা হ'লে বল, তোমার কাছে শপথ করছি, অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় আমি আমার ইংরিজী বিদ্যে বিন্দুমাত্র কাজে লাগাব না। কোনদিনই যেন ইংরিজী ভাষার একটা বর্ণও পড়িনি ঠিক সেই হিসেব নিয়ে শুধু বাংলা ভাষার যৎসামান্য জ্ঞান আর গান-বাজনার অল্প একটু অধিকারের জোরে যতটুকু পারি তাই উপার্জন করব। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে একান্ত যা প্রয়োজন, তার বেশি তো আমার দরকার নেই। তুমি যেমন এম, এ, ডিগ্রি পাবার জন্যে বিলেত যাচ্ছ না, যাচ্ছ সেখানকার সভ্যতার এক গণ্ডুষ জল এনে এখানকার, এম, এ, ডিগ্রি ডোবাবার জন্যে। আমিও তেমনই তোমাদের মতো জমিদারি গড়ে তোলবার জন্যে যাচ্ছি নে,—যাচ্ছি প্রয়োজনের সামান্য এক মুঠো অর্থের মধ্যে তোমাদের ব্যয়বহুল জীবন-যাপনের শৌখিনতাকে ডুবিয়ে মারার জন্যে।"

"তারপর? তারপর একদিন যখন আমি বিলেত থেকে ফিরে আসব তখন তুমি কী করবে? তখনও কি এক মুঠো অর্থের মধ্যে আমাদের ব্যয়বহুল জীবন-যাপনের শৌখিনতাকে ডুবিয়ে মারতে থাকবে?"

"তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষার জন্যে তখনও যদি দেখি তার দরকার আছে, তা হ'লে তখনও সেই অবস্থাই চলবে।"

বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে দিবাকর বলিল, "আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা? চমৎকার তো দেখছি সে ভালোবাসা!"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া যূথিকা বলিল, "সত্যিই সে ভালোবাসা চমৎকার। এত চমৎকার যে, তার জন্যে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকা তো সহজ কথা, তোমার মঙ্গলের জন্যে তোমাকে মুক্তি দেওয়া দরকার বোধ করলে আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতেও পারি।"

বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার শব্দেই দিবাকর প্রথমে একটা রূঢ় আঘাতের তাড়নায় চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দমিত

ক্রোধের চাপা সুরে বলিল, "চমৎকার। মিসেস্ ব্যানার্জি থেকে আবার মিস্ মুখার্জিতে ফিরে যাওয়া সত্যিই চমৎকার। চমৎকার তোমার ভালোবাসা।"

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ সত্যিই চমৎকার। কারণ আবার কোনদিন মিসেস্ ব্যানার্জিতে ফিরে আসার আশায় আমরণ তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে থাকতে পারি—এমনই চমৎকার আমার ভালোবাসা।"

দিবাকর বলিল, "অতটাই যদি করলে, তা হ'লে মিসেস্ ব্যানার্জিতে ফিরে আসার আশায় অপেক্ষা করবারই বা কী দরকার? বেশ বিদ্বান, শিক্ষিত এম. এ., পি-এইচ. ডি.—এমনতরো কাউকে অবলম্বন করে মিসেস্ চ্যাটার্জি কিংবা মিসেস্ চৌধুরীর মতো কিছু হলেই তো পার।"

যূথিকা বলিল, "না, তা পারি নে—ওখানে আমার দুর্বলতা আছে। অপেক্ষা যদি করতে হয় তো ম্যাট্রিক-ফেলের জন্য করব। কিন্তু তুমি পারবে তো একজন দ্বিতীয়ভাগ-পড়া মেয়ের আশ্রয় নিতে? তাকে ঐক্য বাক্য মানিক্য শেখাতে?"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মনে পড়িয়া গেল পাইপ্ পেস্ট প্রীস্টের কথা, যাহা একটি ফার্স্ট-বুক-পড়া মেয়েকে কয়েকদিন পূর্বে সে শিখাইয়াছে। ঐক্য বাক্য মানিক্য হইতে রঙ গ্রহণ করিয়া পাইপ্ পেস্ট প্রীস্ট সহসা ঘোরালো হইয়া উঠিল।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "অনেক সময়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর না দিলেই সবচেয়ে ভালো উত্তর দেওয়া হয়!" তাহার পর ডি. ভাটাচারিয়ার চিঠিটি তুলিয়া প্রস্থান করিল।

পঁয়ত্রিশ

দিবাকর চলিয়া গেলে যূথিকা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বই খুলিতে আর ইচ্ছা হইল না। আলোড়িত বিচলিত মন চিন্তা-নভের মহাশূন্যতার মধ্যে অস্থির হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। মীমাংসার সুদৃঢ় তটে অবতরণ করিবার মতো কোনো কুল-কিনারার সন্ধান খুঁজিয়া পাইল না।

ভালোবাসিয়া দিবাকরকে সে বিবাহ করিয়াছে; এবং বিবাহের পর সে ভালোবাসা ক্রমশ বিস্তারিতই হইয়াছে। বিনিময়ে দিবাকরের নিকট যাহা পাইয়াছে তাহাও সামান্য নহে। কিন্তু তাহাদের বিবাহিত জীবনের সৌভাগ্য-গগনে কিছুদিন হইতে যে রাহু দেখা দিয়াছে, তাহার দুরপনেয় গ্রাস হইতে কিছু বাঁচিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ দুঃখ এই যে, যে ইংরেজী বিদ্যা তাহার অন্তরের একান্ত আদরের সামগ্রী, তাহার অস্তিত্বের দ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ, দীর্ঘকাল-ব্যাপী সুকঠোর সাধনার দ্বারা যাহা সে তিলে তিলে অধিকার করিতে

সক্ষম হইয়াছে, তাহাই তাহার সুখ শান্তি সম্ভ্রম সবকিছু গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে রাহুর রূপ ধরিয়া! বন্ধু হইয়াছে বৈরী; অমৃত হইয়াছে গরল। একটা অকল্পনীয় বৈরাগ্য-প্রবাহে জীবনের সকল মাধুরী ফিকা হইয়া আসিল; আসক্তি হইয়া আসিল শিথিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর ব্যাকরণ-পাঠ শেষ হইলে যূথিকা বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থকে বলিল, "তর্কতীর্থ মশায়, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

সকৌতূহলে বাণীকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী কথা মা?"

কীভাবে কথাটা আরম্ভ করিবে, এক মুহূর্ত মনে মনে ভাবিয়া লইয়া যূথিকা বলিল, "শুনেছি ভগবানকে ফল নিবেদন করার রীতি আছে। একবার কোন ফল নিবেদন করে দিলে জীবনে আর কখনও সে ফল আস্বাদ করা চলে না। এ কথা কি সত্যি?"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "হ্যাঁ মা সত্যি। বিশেষত, কোন কোন তীর্থক্ষেত্রে পারলৌকিক কার্য শেষ করার পর ফল নিবেদন করার রীতি আছে।"

"আচ্ছা, গাছের ফল ছাড়া অন্য সব-কিছু তো ভগবানকে নিবেদন করতে পারা যায়? এই যেমন, জীবনের ভালোমন্দ, শুভাশুভ, পাপ-পুণ্য—এই সব?"

"নিশ্চয় পারা যায়, মা একমাত্র ভগবান ছাড়া এসব জিনিস উৎসর্গ করার উপযুক্ত আধার আর কোথায় পাবে বল?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "এমনি ধারা একটা জিনিস আমি উৎসর্গ করতে চাই। দয়া করে আপনাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

প্রবল ঔৎসুক্যের সহিত বাণীকণ্ঠ বলিলেন. "তুমি উৎসর্গ করতে চাও? কী সে জিনিস, মা?"

"আমার ইংরিজী শিক্ষার শেষ ফল, আমার এম. এ. পাসের ডিগ্রি।"

কথাটা এমনই অদ্ভুত যে, সাধারণ ক্ষেত্র হইলে বাণীকণ্ঠ এ কথাকে পরিহাস বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু যূথিকার মুখে লঘু পরিহাসের স্থান নাই বলিয়া উদগ্র বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথার অর্থ কী মা?"

"এ কথার অর্থ, গোবিন্দজীর চরণে আমার এম. এ. ডিগ্রী উৎসর্গ করার পর জীবনে আর কোনও দিন ইংরিজী পড়ব না, লিখব না অথবা বলব না। যে সামান্য ইংরিজী বিদ্যে আয়ত্ত করেছি, জীবন থেকে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দোব।"

যূথিকার কথা শুনিয়া বাণীকণ্ঠের মনে বিস্ময়কে অতিক্রম করিয়া শঙ্কা দেখা দিল; উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "এ সঙ্কল্প কেন করছ বউমা? এ সঙ্কল্প তো শুভ সঙ্কল্প নয়। এত বড় একটা অর্জিত বিদ্যার প্রতি এমন আচরণের আমি তো কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি নে।"

করজোড় করিয়া যূথিকা বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন তর্কতীর্থ মশায়, আপনি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর না দেওয়া আমার পক্ষে

অপরাধ হবে। এই বিশ্বাসটুকু আপনি রাখুন যে, শুধু একটা খেয়ালের বশে আমি কোনও অন্যায় কাজ করতে উদ্যত হই নি।"

বাণীকণ্ঠ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী মানুষ। দিবাকরকে লইয়া ইহার ভিতর একটা কোনও জটিলতা আছে, এরূপ অনুমান করিতে তাঁহার ভুল হইল না। দুঃখিতস্বরে বলিলেন, "সে বিশ্বাস তোমার উপর নিশ্চয় আছে মা; আর সেই জন্তেই আশঙ্কা করছি, তোমাকে নিরস্ত্র করবার হয়তো কোনও সম্ভবনা নেই। কিন্তু এ যে কত বড় দুঃখের কথা তা আর কী বলব! ব্যাকরণে তুমি যে রকম আশ্চর্যভাবে দ্রুত উন্নতি করছ, তাতে মাসখানেকের মধ্যেই তোমাকে কাব্য আরম্ভ করাব, মনে ভেবে রেখেছি। তুমি যে অল্পকালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিনী হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নেই। তোমার মধ্যে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্য— দুটি বিভিন্ন ভাষার গঙ্গা যমুনার সঙ্গম দেখে ধন্য হব, মনে মনে সেই সাধ ছিল। সে সাধে তুমি কিন্তু বাদ সাধলে মা। মণিকাঞ্চনের যোগ হতে দিলে না।"

এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করিয়া যূথিকা ধীরে ধীরে বলিল, শাস্ত্রে এ রকম কাজের বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিধি আছে কি তর্কতীর্থ মশায়?"

পূর্ব কথার অনুবৃত্তিতে কিছু না বলিয়া যূথিকা অন্য প্রসঙ্গ অবতারণা করায় বাণীকণ্ঠ বুঝিলেন, নিজ সঙ্কল্পে সে শুধু অবিচলই নহে, তদ্বিষয়ে বেশি কিছু আলোচনা করিতেও অনিচ্ছুক। দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ক্রিয়াপদ্ধতির কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার সঙ্কল্প এমন অভিনব যে জগতে কখনও কেউ এমন কাজ করেছে বলে আমার মনে হয় না। বহু লোক সংসার ত্যাগ করেছে, ধর্ম ত্যাগ করেছে, এমন কি অগ্নিকুণ্ডে নিজেদের প্রাণ বিসর্জনও দিয়েছে; কিন্তু এমনতর শোচনীয় উৎসর্গ কেউ কখনও করে নি। সুতরাং এ বিষয়ের নির্দিষ্ট ক্রিয়াপদ্ধতি কী করে থাকবে মা?"

"তা যদি না থাকে, তা হ'লে আপনি দয়া করে এই অনুষ্ঠানের জন্যে একটা সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ্ধতি তৈরী করে নিন। আপনি ধার্মিক, মহাপণ্ডিত; আপনি যা তৈরী করবেন, আমি তাকে শাস্ত্রের অনুশাসনের মতো মানব।"

যূথিকাকে নিবৃত্ত করিতে বাণীকণ্ঠ আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত তাহার অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "উৎসর্গ বিষয়ে সাধারণ পদ্ধতি যা কিছু আছে, তাই অবলম্বন ক'রে একটা যা হয় কিছু খাড়া করব।"

খুশি হইয়া যূথিকা বলিল, "খুব শিগগির কিন্তু করবেন, তর্কতীর্থ মশায়। আর, এ কথা কেউ যেন জানতে না পারে।"

"দিবাকর?"

"না, তিনিও না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া বাণীকণ্ঠের মুখ শুকাইল। চিন্তিত স্বরে বলিলেন, "পরে জানতে পেরে সে যখন আমার উপর ক্ষাপ্‌পা হয়ে উঠবে, তখন কে সামলাবে বউমা ?"

যূথিকা বলিল, "আমি সামলাব—সব ঝুঁকি, সব দায়িত্ব আমার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন" বলিলেই যদি চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে মিনিট দশেক পরে পথে যাইতে যাইতে বাণীকণ্ঠ কোন ব্যক্তির উপর ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কোনও প্রকারে সামলাইয়া যাইতেন না।

বাণীকণ্ঠ বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সবিস্ময়ে সেই ব্যক্তি বলিল, "কী সর্বনাশ! তর্কতীর্থ মশায় নাকি ?"

মহা অপ্রতিভ হইয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। ভারি অন্যায় হয়ে গেছে চাটুজ্জে মশায়! বেশি লাগে নি তো আপনার!"

চাটুজ্জে মশায় অর্থাৎ পূর্বপরিচিত ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে মনে মনে বলিল, "খড়ম সুদ্ধ পা নিয়ে পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালে কেমন না বেশি লাগে, তা এখনই দেখিয়ে দিতে পারি।' প্রকাশ্যে বলিল, "না, তেমন বেশি লাগে নি। কিন্তু ব্যাপার কী, তর্কতীর্থ মশায় ? এত অন্যমনস্ক হয়ে পথে চলছিলেন কেন।"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "একটা কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "আসছেন তো জমিদার বাড়ি থেকে বউরাণী-মাকে সংস্কৃত পড়িয়ে,—তাতে এত চিন্তা কিসের! ন্যায়শাস্ত্রের কোনও দুরূহ সমস্যার চিন্তা নয় তো!"

মৃদু হাসিয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "না, ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তা নয়। দুশ্চিন্তা ভিন্ন অমন করে কেউ জড়িয়ে ধরে না। কিন্তু আশ্চর্য চাটুজ্জে মশায়, বউরাণী-মাকে আমি সংস্কৃত পড়াই—এ খবরও আপনার অজানা নেই দেখছি!"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "আপনাদের বউরাণী-মার এ খবর তো সামান্য খবর, তর্কতীর্থ মশায়—এ খবর জানি বলে আশ্চর্য হবার তেমন কিছু নেই। এর চেয়ে বহুগুণে জবর খবরও আমার অজানা নেই। এ কথা আপনি জানেন কি যে, শিক্ষকতা শুধু আপনিই করছেন না, আপনাদের জমিদার-বাড়ির বড় মহারাজও করছেন ? অবশ্য এক হিসাবে তাঁর শিক্ষকতাই বেশি মহৎ। কারণ আপনি শিক্ষকতা করছেন বড়লোকের বাড়িতে, আর তিনি করছেন দরিদ্রের কুটীরে। কিন্তু আপনার গুরুদক্ষিণা হবে অর্থ; আর তাঁর গুরুদক্ষিণা কোনও অনর্থ বাধবে কি না, তা অবশ্য বলতে পারি নে।" বলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা বাণীকণ্ঠের মনে একটা তীব্র কৌতূহল জাগাইয়াই

শেষ হইল না; কিন্তু পূর্বে যূথিকার সহিত ইংরেজী বর্জন বিষয়ে যে সকল আলোচনা হইয়াছিল, তাহার সহিত জড়িত হইয়া একটা অনির্ণীত আশঙ্কারও সৃষ্টি করিল। কিন্তু স্বভাবত পরচর্চাবিমুখ নিতান্ত নির্বিবাদী মানুষ বলিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথার কোনও উত্তর না দিয়া তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "গভর্ণমেন্টের সি. আই. ডি. বিভাগের কাজ করতাম, সারা ভারতবর্ষের গুপ্ত খবর পোষা কুকুরের মতো কাছে এসে হাজির হতো। এখন পেনসন নিয়ে গ্রামে এসে বসেছি, এখনও গ্রামের গুপ্ত কথাগুলো তেমনই সুড় সুড় করে হাজির হচ্ছে। দেখছি, এখনও একেবারে ভুলতে পারে নি।" বলিয়া পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

'পূর্বজন্মের সংস্কারের মতো কর্মজীবনেরও বোধ করি একটা সংস্কার আছে।" বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জেকে পাশ কাটাইয়া বাণীকণ্ঠ প্রস্থান করিলেন। চলিতে চলিতে কিন্তু চিন্তাজাল আরও জটিল হইয়া উঠিল।

বাণীকণ্ঠকে ছাড়িয়া অল্পদুর অগ্রসর হইলে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে দেখিল, সম্মুখে ঈষৎ দ্রুতপদে একটি স্ত্রীলোক আসিতেছে। নিকটে আসিলে চিনিতে পারিল, সে ক্ষীরোদবাসিনী। সহসা শিকারের সম্মুখীন হইলে শিকারী যেমন উৎফুল্ল হয়, ক্ষীরোদবাসিনীকে দেখিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে তেমনই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ছত্রিশ

অপ্রশস্ত পথে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের একেবারে সামনা-সামনি পড়িয়া গিয়া ক্ষীরোদবাসিনীকে বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেই হইল। দূর হইতে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জেকে দেখিয়া সে কিন্তু একটুও খুশি হয় নাই। কারণ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিবার তাগিদ তো ছিলই; তদুপরি, ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের পাল্লায় একবার পড়িলে কিছুটা সময় কূট এবং অসাধু প্রসঙ্গে অপব্যয়িত হইবে, এ কথাও তাহার অজানা ছিল না।

ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী দ্বারিকানাথ বয়সে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের অপেক্ষা কিছু বড় ছিল বলিয়া ত্রৈলোক্য ক্ষীরোদবাসিনীকে বউঠাকরুণ বলিয়া সম্বোধন করিত। বলিল, "এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে বউঠাকরুণ ?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "পরশু মধু ঘোষালের নাতনীর বিয়ে। কাজকর্মের পরামর্শের জন্যে ঘোষাল-গিন্নী ক'দিন ধ'রে ডাকাডাকি করছিল, তাই একবার গিয়েছিলাম।"

"তা তোমার নিজের নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে যাও নি কেন ?"

"দুজনে গেলে তো চলে না, ঠাকুরপো। সন্ধ্যার সময়েও তো যা হোক কাজ কর্ম কিছু থাকে। ঘরে আর অপর লোক কেউ নেই, তাই একাই গিয়েছিলাম।"

"কিন্তু অমন সমর্থ সুন্দরী মেয়েকে রাত্রিকালে একা রেখে যাওয়া তো উচিত নয়, বউঠাকরুণ।"

মৃদু হাসিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সমর্থ বটে, কিন্তু সুন্দরী তো নয়, ঠাকুরপো। কালো মেয়েকে সুন্দরী মেয়ে বলছ কেমন করে ?"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া অল্প একটু হাসিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "কটা রঙ না হলে সুন্দরী হয় না—এ কথা তোমাকে কে বললে ? ছানাবড়াও তো কালো, কিন্তু তাই বলে রসগোল্লার চেয়ে কম মিষ্টি লাগে কি ?"

কথাটা শেষ করিয়া অবিলম্বে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সে কথা অবশ্য ঠিকই বলেছ তুমি।" তাহার পর পাশ কাটাইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম দেখাইয়া বলিল, "আচ্ছা চলি তা হ'লে, ঠাকুরপো—মেয়েটা আবার একলা রয়েছে।"

পথটা সেখানে এত সঙ্কীর্ণ যে, পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলেই পাশ কাটানো যায় না, যদি না সম্মুখের ব্যক্তি এক দিকে সরিয়া গিয়া একটু পথ করিয়া দেয়। ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে কিন্তু ক্ষীরোদবাসিনীকে তেমন কোনও সুবিধা না করিয়া দিয়া পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "ব্যস্ত হবার দরকার নেই বউঠাকরুণ, শিবানী তোমার একলা নেই। বেশ ভালো পাহারা তার কাছে মোতায়েন আছে।"

"পাহারা।'

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পাহারা। তোমাদের জমিদার-বাড়ির স্বয়ং বড় মহারাজ পাহারা দিচ্ছেন।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা শুনিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর মুখ শুকাইল। কী বলিবে সহসা ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল, "দিবাকর এসেছে বুঝি ?"

সহসা ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের উচ্চ হাস্যে নিদ্রাচ্ছন্ন পল্লীরজনী চকিত হইয়া উঠিল। ত্রৈলোক্য বলিল, "তুমি বলছ, এসেছে বুঝি! অথচ দিবাকর বললে, তুমি নিজে তাকে বসিয়ে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। তা সে যাই হোক, শিবানীকে এমন করে একলা রেখে বেরুনো উচিত হয় না, বউঠাকরুণ।"

এরূপভাবে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গিয়া ক্ষীরোদবাসিনী মনে মনে বিষম অপ্রতিভ হইল। কিন্তু এই অসংবরণীয় অসঙ্গতিকে সামলাইয়া লইবার কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া বলিল, "দিবাকর কিন্তু অতিশয় সৎ ছেলে ঠাকুরপো।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "আমিই কি বলছি অসৎ ? ঘি-ও তো অসৎ নয়, কিন্তু আগুনের পাশে থাকলে গলেই। সেই জন্যে একটু সাবধানে থাকাই উচিত। তবে যদি মনে মনে তেমন কোনও ইয়ে থাকে, তা হ'লে অবশ্য আলাদা কথা।"

'মতলব' কথাটা নিতান্ত শ্রুতিকটু হইবে বলিয়া বোধহয় ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে

'ইয়ে' শব্দের দ্বারা তাহার স্থান পূরণ করিল। কিন্তু বলিবার ভঙ্গি এবং সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য ভেদ করিয়া সেই 'মতলব' কথারই দুর্গন্ধ বাহির হইতে বিশেষ কিছু বাকি রইল না। ঈষৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "মনে মনে কী থাকে ঠাকুরপো ?"

কপট সংকোচের স্খলিত কণ্ঠে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "না না বউঠাকরুণ, কথাটাকে হঠাৎ দূষিত দৃষ্টিতে দেখলে অন্যায় করা হবে। তোমার নাতনীর অদৃষ্টে যদি জমিদারের ঘরণী হওয়াই লেখা থাকে, তাতে আপত্তির কী আছে বল ?"

রুষ্ট কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এত বড় অধর্মের কথা আমাদের কারও মনে নেই কিন্তু, ঠাকুরপো।"

মৃদু হাসিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তোমাদের মনে কী আছে না আছে তা তোমরাই জানো; কিন্তু দিবাকরের মনে কিছু আছে কি-না, তা বলতে পার কি ? আচ্ছা গ্রামের আর কারও বাড়িতে সে তো ভুলেও কোনও দিন পায়ের ধুলো ফেলে না; কিন্তু তোমাদের বাড়িতে নিত্য সন্ধ্যার পর দু তিন ঘণ্টা করে কেন সে কাটায় তার কোনও কারণ দেখাতে পার ? তুমি কি মনে কর একমাত্র তোমার আকর্ষণেই সে আসে আর থাকে ?"

যুক্তি-তর্কের এই প্রবল আক্রমণের তাড়নায় ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতিবাদের বেগ সহসা নিস্তেজ হইয়া গেল। কারণ একমাত্র তাহারই আকর্ষণে দিবাকর নিত্য তাহাদের বাড়ি আসে, এমন একটা দাবি সে নিজের মনের দরবারেও করিতে পারিল না। যে কথা এ পর্যন্ত কাহারও কাছে সে প্রকাশ করে নাই, অবস্থার বিপাকে পড়িয়া অবাঞ্ছনীয়তর ধারণার দায় হইতে মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে এখন তাহাই প্রকাশ করা সমীচীন মনে করিল। বলিল, "দিবাকর এসে শিবুকে একটু একটু ইংরিজী পড়ায়।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কৈফিয়ৎ শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "মন্দ কথা নয়। ভোঁদড় পুকুরে এসে মাছকে সাঁতার কাটতে শেখায়! মাইনে দাও কত করে বউঠাকরুণ ?"

অপ্রতিভ স্বরে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আমি গরীব মানুষ, মাইনে দেবার কথা বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছ ঠাকুরপো।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "না না, এতে লজ্জার কী আছে। স্বয়ং জমিদার মহারাজ বিনা বেতনে তোমার ঘরে বাঁধা পড়েছেন, এ তো গৌরবের কথা। বেশ, বেশ। তোমার একটা হিল্লে হয়ে গেল। তবে কি-না দ্বারিকদা নিতান্তই স্নেহ করতেন, সেই কথা স্মরণ করে যদি একটা হিতকথা বলি, তা হলে রাগ করো না।"

"কী হিতকথা ?"

"গ্রামে বাস করতে হলে শুধু জমিদারকে ধরে থাকলেই চলে না, গ্রামের লোককেও কিছু কিছু রাজী রাখতে হয়। জমিদার আর বড়লোক, এই দুই

জাতই আলাদা জেনো। খুব বিশ্বাস ওদের করতে নেই? নিজের স্বার্থের জন্যে তেমন যদি কখনও দরকার হয়, তখন দেখবে ঐ দিবাকর তোমাকে আর তোমার নাতনীকে চিনতেই পারছে না। তখন যেন এ-কূল ও-কূল দুকূল না হারাতে হয়। তুমি বলছিলে অধর্ম; কিন্তু তিন পুরুষ আগে দিবাকরের প্রপিতামহ রাজীব বাঁড়ুজ্জের একসঙ্গে বেঁচে থাকা সাতটা বউ যদি অধর্ম না হয়ে থাকে, তা হলে আজ দিবাকরের দুটো বউ কী ক'রে অধর্ম হয় তা বুঝি নে। পার যদি নাতনীকে দিবাকরের গলায় ঝুলিয়ে দাও—সে অবশ্য হবে বহুৎ আচ্ছা। আর তা যদি না পার তা হলে অসাবধান হয়ো না—এই আমার হিতকথা।" বলিরা ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল।

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "তুমি নিজে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে ঠাকুরপো?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "ঐ দেখ, কথায় কথায় আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম। কে যেন বলছিল, তুমি না-কি চায়ের শেয়ার কিছু বিক্রি করবে। তাই খবরটা পাকা করে তোমার কাছে জানতে গিয়েছিলাম।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কটা শেয়ারই বা বিক্রি করতে বাকি আছে যে, আবার শেয়ার বিক্রি করব? এ মিথ্যে কথা তোমাকে কে বললে ঠাকুরপো?"

একটু ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তা তো ঠিক মনে পড়ছে না। দু-তিন দিন আগে কার মুখে যেন শুনেছিলাম। তা হ'লে দেখছি, কথাটা সত্যি নয়—বাজে।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কথাটা কিন্তু মূলেও সত্য নহে; অর্থাৎ কোনও দিন কাহারও মুখে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে এমন কথা শুনে নাই। প্রতিদিন দিবাকর সন্ধ্যার পর ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহে আসে এই সংবাদ পাইয়া স্বচক্ষে তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে ক্ষীরোদবাসিনী গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ক্ষীরোদবাসিনীর দুর্ভাগ্যক্রমে আজই সে সময়ে ক্ষীরোদবাসিনী গৃহে উপস্থিত ছিল না। যেটুকু দেখিবার আশায় সে আজ আসিয়াছিল, আসলে দেখিয়া গেল তদপেক্ষা অনেক কিছু বেশি।

সাঁয়ত্রিশ

ক্ষীরোদবাসিনী মনে করিয়াছিল শিবানীকে দিবাকরের ইংরেজী পড়াইবার কথা তাহারই নিকট ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে প্রথম জানিতে পারিল। কিন্তু তৎপূর্বে তাহার গৃহে গিয়া সে কথাও যে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে ঘটনাক্রমে অবগত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা সে জানিত না।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের সহিত কথোপকথনের ফলে তাহার মন বেশ খানিকটা দমিয়া গিয়াছিল। ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে অসরল ব্যক্তি, অনুদার দাক্ষিণ্যবর্জিত তাহার রীতি এবং সর্বোপরি দিবাকরের সহিত তাহাদের একটা অন্তঃপ্রবাহী মনোমালিন্য বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে. এ সকল কথা হিসাবের মধ্যে লইয়াও ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা একেবারে সে উড়াইয়া দিতেও পারিল না। এ পর্যন্ত মনের যে অংশটা নিশ্চিন্ত এবং নির্মল ছিল তাহার মধ্যে সংশয়ের মেঘ আসিয়া দেখা দিল। ত্রৈলোক্যের ব্যবহৃত ঘৃত এবং অগ্নির চিরন্তন উপমার কথা মনে পড়িয়া মনে হইল, সত্যই তো ঘরে ওরূপ সুন্দরী এবং শিক্ষিতা স্ত্রী থাকিতে দিবাকরের নিত্য-নিয়মিতভাবে শিবানীকে পড়াইতে আসিয়া এতটা সময় ব্যয় করিয়া যাইবার কী এমন সদুদ্দেশ্য থাকিতে পারে? শিবানীর সহিত তাহার আত্মীয়তা অথবা পরিচয়ের দৃঢ়তা এরূপ নহে, যাহাতে তাহার আচরণ সহজ বলিয়া বিবেচনা করা যায়। তাহা হইলে যূথিকা কি তাহাকে ঠিক সেই পরিমাণ সন্তোষ দিতে পারিতেছে না, যাহা তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়?

গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী পথ চলিতে লাগিল, এবং অতঃপর দিবাকরের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে কী প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন হইবে তদ্বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল।

গৃহের ভিতরে শিবানী তখন মৃদু কণ্ঠে কি একটা গান গাহিতেছিল। দ্বারের সম্মুখে ক্ষীরোদবাসিনী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া রহিল। দিবাকরের কোনও কথা শুনা যাইতেছিল না। কিন্তু অল্প পরে গানটা থামিতেই শিবানী এবং দিবাকর উভয়েই একত্রে কোনও কারণবশত হাসিয়া উঠিল। ক্ষীরোদবাসিনীর শ্রবণে তাহা ঠিক ভালো লাগিল না। কড়া নাড়িয়া ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে সে ডাকিল, "শিবু, দোর খোল্।"

দ্বার খুলিয়া ক্ষীরোদবাসিনীকে দেখিয়া শিবানী বলিল, "ঠাক্‌মা, দাদার কাছে তুমি একটু বসো, আমি ততক্ষণ দুধটা ফুটিয়ে নিই গে।"

"এতক্ষণ নিস নি কেন?"

"বা রে! দাদাকে একলা বসিয়ে রেখে কেমন করে নোব?" বলিয়া মৃদু হাসিয়া প্রস্থান করিল।

দিবাকরের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "বড্ড দেরি হয়ে গেল দিবাকর, না ?"

দিবাকর বলিল, "না, দেরি কই ?"

"ব্যস্ত হচ্ছিলি বাড়ি যাবার জন্যে ?"

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "মোটেই না, তুমি আরও খানিকটা দেরি করে এলেও ব্যস্ত হতাম না।"

উত্তরটা ক্ষীরোদবাসিনীর খুব ভালো লাগিল না। এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা দিবাকর, বড়লোকের বাড়ি ঘন ঘন যেতে একদিন তুই আমাকে মানা করেছিলি, সে কথা তোর মনে আছে ?"

"আছে বই কি।"

"আচ্ছা, গরীবলোকের বাড়ি ঘন ঘন আসতে আমি যদি আজ তোকে মানা করি, তা হ'লে তুই কী বলবি ?"

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রশ্ন শুনিয়া দিবাকরের মুখে একটু মলিন ছায়া নামিয়া আসিল ; চিন্তিত মনে বলিল, "তা হ'লে কী বলব ?" কিন্তু পরক্ষণেই সমুজ্জলমুখে বলিল, "তা হ'লে বলব, পথে ত্রৈলোক্য চাটুজ্যের সঙ্গে তোমার নিশ্চয় দেখা হয়েছিল। বল, ঠিক বলেছি কি-না ?" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিবাকরের অনুমানশক্তির নির্ভুলতা দেখিয়া ক্ষীরোদবাসিনীও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "তা ঠিক বলেছিস বটে, কিন্তু ও-লোকটাকে আমি ভারি ভয় করি, দিবাকর।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "কিন্তু এ লোকটাকে যদি একটু বেশি বিশ্বাস করতে, তা হ'লে ও-লোকটাকে অত ভয় না করলেও চলত। ওর কথা ভেবে ভয় পাও তুমি, আর আমার কথা ভেবে ভরসা পাও না ?"

"তা নিশ্চয়ই পাই। তুই ভদ্র, আর ও-লোকটা যে অতিশয় নোংরা, দিবাকর।"

"তা হ'লে ওকে না ছুঁলেই পার।"

"আমি তো ছুঁতে চাইনে, ও যে আমাকে ছুঁতে আসে।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "একান্তই যদি ছুঁয়ে দেয়, আমি তোমায় শুদ্ধি করে নোব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

"আমার জন্যে ভাবি নে তো ভাই, ভাবি শিবানীর জন্যে। গরীবের ঘরের আইবুড়ো মেয়ে, দুশ্চিন্তা তো ওকে নিয়েই।"

"তা হ'লে শিবানীর বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও। ওর সব ভার আমি নিলাম।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া বিস্ময়চকিত কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "ওর সব ভার তুই নিলি ? তার মানে কী দিবাকর ?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "মানে টানে জিজ্ঞাসা করো না। এত সহজ কথায় মানে বলতে গেলে অনেক সময়ে মানে দুর্বোধ্য হয়েই ওঠে।"

এ কথায় ক্ষীরোদবাসিনীর মনের খট্‌কা বাড়িয়াই গেল, কিন্তু সে খট্‌কা নিরসনের সময় মিলিল না। গাত্রোত্থান করিয়া দিবাকর বলিল, "রাত হয়েছে, আজ চললাম ক্ষীরোদ-ঠাকুমা।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কাল আসছিস তো?"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "গরীবের বাড়ি আবার কালই আসতে বলছ?"

ক্ষীরোদবাসিনীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, গরীবের বাড়ি নয়, বড়লোকের বাড়ি। আসিস।"

"আসব।" বলিয়া দিবাকর বারান্দা হইতে অবতরণ করিল।

দিবাকর প্রস্থান করিলে দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া ক্ষীরোদবাসিনী মুখ হাত পা ধুইয়া বারান্দায় মাদুরের উপর উপবেশন করিল। 'মানে বলতে গেলে মানে অনেক সময় দুর্বোধ্য হয়েই ওঠে'—ক্ষণকাল পূর্বের দিবাকরের এই উক্তি তাহার সমস্যার দুশ্চিন্তাকে আরও খানিকটা বাড়াইয়াই তুলিয়াছিল। নিজে অনেকক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া সন্তোষজনক কোন আন্দাজ করিতে না পারিয়া শিবানীকে মথিত করিয়া কোনও প্রকার মানে খুঁজিয়া বাহির করা যায় কি না, সেই অভিপ্রায়ে উচ্চৈঃস্বরে সে ডাক দিল "শিবু, তোর হলো?"

"হলো ঠাকুমা, যাচ্ছি এখনই।" বলিয়া রান্নাঘর হইতে শিবানী সাড়া দিল; এবং মিনিট দুই তিনের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর কাছে আসিয়া বসিল।

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আজ কতটা পড়লি শিবু?"

শিবানী বলিল, "বেশি নয়, অল্প একটু।"

"কেন, এতক্ষণ তা হ'লে কী করছিলি?"

সহজ সুরে শিবানী বলিল, "গল্পগুজব করছিলাম—গোটা দুতিন গান গাইলাম —এই আর কি।"

"কিসের গল্পগুজব?"

"এমনি,—এ-দিক ও-দিক সে-দিক।"

এ-দিক ও-দিক সে-দিকের সব দিকগুলোই আপত্তি এবং সমস্যা হইতে মুক্ত কি-না, তাহা নির্ণয় করিবার বাগ না দেখিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "দিবাকরকে তোর কেমন লাগে রে শিবু?"

"আজকাল?"

"হ্যাঁ আজকাল?"

উৎসাহিত হইয়া শিবানী বলিল, "খুব ভালো লাগে।"

"তোকে ওর কেমন লাগে, তা কিছু বুঝতে পারিস?"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া মৃদু হাসিয়া শিবানী বলিল, "খুব খারাপ লাগে না হয়তো।"

উত্তর শুনিয়া ক্ষীরোদবাসিনী খুশি হইল না। ইহা অপেক্ষা 'ভালো লাগে'

বলিলে সে বোধ হয় মোটের উপর কম উদ্বিগ্ন হইত। মনে হইল, 'খুব খারাপ লাগে না হয়তো'-র মধ্যে 'খুব ভাল লাগে'-র স্থানও থাকিতে পারে। এ পথ পরিত্যাগ করিয়া সে অন্য পথ অবলম্বন করিল। বলিল, "যূথিকা আর দিবাকরের মধ্যে কাকে তোর বেশি ভালো লাগে?"

দ্বিধাহীন অবলীলার সহিত শিবানী বলিল, "দিবাকরদাদাকে নিশ্চয়ই।"

"কেন?"

"ও মা! এ কথার কেন আছে নাকি?"

এ পথেও সুবিধার লক্ষণ না দেখিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আবার আমাদের জলপাইগুড়ি চলে গেলে ভালো হয় শিবু।"

অকস্মাৎ বিষয়ান্তের এ সুদীর্ঘ উল্লঙ্ঘন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শিবানী বলিল, "বাস্ রে! দিবাকরদাদার কথা থেকে একেবারে জলপাইগুড়ি যাবে কেন?"

"মনসাগাছা কেমন ভাল লাগছে না। তোর মনসাগাছা ভালো লাগে?"

"লাগে।"

"জলপাইগুড়ির চেয়েও?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া শিবানী বলিল, "হ্যাঁ জলপাইগুড়ির চেয়েও।"

"কিসের জন্যে মনসাগাছা এত ভাল লাগে শুনি?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া শিবানী বলিল, মোটের ওপর—সব জড়িয়ে।"

এই মোটের ওপরের সর্বপেক্ষা প্রবল অংশ দিবাকরের কি-না তাহা নির্ণয় করা সহজ হইবে না বুঝিতে পারিয়া ক্ষীরোদবাসিনী চুপ করিয়া গেল।

শিবানীর মন্থন নিষ্ফল হইল। মন্থনের ফলে সংশয়ের সমুদ্র তল হইতে এমন কোন পদার্থ উঠিল না, যাহার সাহায্যে সামান্য মাত্রও নিশ্চয়তার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

আটত্রিশ

দিন চারেক পরের কথা।

সন্ধ্যার পর প্রাত্যহিক পাঠ শেষ হইলে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তর্কতীর্থ মশায়, সেই ক্রিয়াপদ্ধতিটা তৈরী হয়েছে কি?"

তিন দিন হইল বাণীকণ্ঠ ক্রিয়াপদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ঐকান্তিক সংকোচ এবং অনিচ্ছাবশত এ পর্যন্ত সে কথা যূথিকাকে বলিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। যূথিকার প্রশ্নে বাধ্য হইয়া ক্ষুণ্নস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তৈরি হয়েছে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এমন সাংঘাতিকভাবে নিজেকে বঞ্চিত করবার আগে আর একবার তুমি কথাটা ভালো করে বিবেচনা করে দেখ।"

মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আপনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন বলে আপনার

মনে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমাকে এর দ্বারা আমার জীবনে কোনও অশুভ হবে না। তা ছাড়া আমি তো ইতিমধ্যেই কয়েক দিন থেকে মনে-প্রাণে ইংরিজী বর্জন করেছি। বাকি আছে শুধু সে কথা ভগবানের কাছে স্বীকার করা। কালই তা হ'লে সে কাজটা শেষ করিয়ে দিন তর্কতীর্থ মশায়।"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "কাল তিথিটা তেমন শুভ নয়; পরশু বুধবারে গোবিন্দজীর পূজার পর তুমি যে সময়ে প্রণাম কর, সেই সময়ে না হয় করা যাবে।"

"কতটা সময় লাগবে?"

"মিনিট পনর-ষোলর বেশি নয়।"

সময়ের পরিমাণ শুনিয়া মনে মনে খুশি হইয়া যূথিকা বলিল, "তার জন্যে কী ব্যবস্থা করে রাখতে হবে, ব'লে দিন আমাকে।"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "বিশেষ ক'রে কোনও ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন হবে না মা, নিত্যপূজার জন্যে তোমাদের যা ব্যবস্থা থাকে তা থেকেই আমি তার ব্যবস্থা করে নেব।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "ক্রিয়াপদ্ধতি সংস্কৃত ভাষাতেই করেছেন তো তর্কতীর্থ মশায়?"

হ্যাঁ মা, সংস্কৃত ভাষাতেই করেছি।"

"কাল আরতি করতে আসবার সময়ে সেটা সঙ্গে এনে আমাকে যদি তার অর্থ বুঝিয়ে দেন তা হ'লে ভালো হয়।"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "এ খুবই ভালো কথা মা, কাল আসবার সময়ে আমি সঙ্গে নিয়ে আসব।"

পরদিন সন্ধ্যার সময়ে ক্রিয়াপদ্ধতির মূল পাঠ শুনিয়া এবং অর্থ উপলব্ধি করিয়া যূথিকা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। বলিল, "চমৎকার হয়েছে তর্কতীর্থ মশায়, আমার ভারি ভালো লাগল।"

"তৃপ্তি হয়েছে মা, তোমার?"

"অত্যন্ত। অন্তরের কথা দিয়ে আপনি উৎসর্গ মন্ত্রটি রচিত করেছেন। খুব তৃপ্তি পেয়েছি আমি।"

গভীর নিনাদময়ী সংস্কৃত ভাষার অভ্যন্তরে অবস্থিত উৎসর্গ-মন্ত্রের একটা অংশ বারংবার পাঠ করিয়া যূথিকা প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। তাহার জীবনের অভাবনীয় বেদনার মর্মন্তুদ অনুভূতি ইহার মধ্যে ধ্বনিত।

'দিয়েছিলে তুমি শুভ, অদৃষ্টবশে আমার জীবনে তা অশুভ হয়েছে। দিয়েছিলে অমৃত, হয়েছে গরল। হে শুভাশুভ-দুঃখসুখের একমাত্র আধার, হে গোবিন্দ, তুমি আমার জীবনের গরলীভূত অমৃত গ্রহণ কর। যে ভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত শক্তি আমার নেই, হে নাথ, হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর, তুমি আমার সেই দুর্বহ ভার হরণ কর।"

পরদিন বুধবারে গোবিন্দজীর পূজা শেষ হইবার পর যথানির্ধারিত ইংরেজী

বর্জনের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল। আগ্নেয়গিরি যেমন হৃদয়ের মধ্যে গলিত ধাতুর উপদ্রব ধারণ করিয়াও বাহিরে স্তব্ধ হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপে ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণের সকল উচ্ছ্বাস রোধ করিয়া যূথিকা আদি হইতেই অন্ত অবধি সুদৃঢ় অবিচলতার সহিত সে ক্রিয়া শেষ করিল। শুধু উৎসর্গ-মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গোবিন্দজীর পদপ্রান্তে এম. এ. ডিপ্লোমাখানা অর্পণ করিবার সময়ে বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরির গলিত স্রাবেরই ন্যায়, কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু চক্ষু ভেদ করিয়া নিঃশব্দে ঝড়িয়া পড়িয়াছিল।

কয়েকদিন হইতে বাতের ব্যথায় শয্যাগত আছেন বলিয়া গোবিন্দজীর পূজাকালে প্রসন্নময়ী উপস্থিত ছিলেন না, এবং যে দুই-তিন জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, ইংরেজী বর্জনের অনুষ্ঠান হয় তাহারা লক্ষ্যই করিল না অথবা লক্ষ্য করিয়াও বুঝিল না তেমন কিছু। শুধু দুইটি মানুষের জ্ঞাতসারে এমন একটা অভূতপূর্ব উৎসর্জন হইয়া গেল জগতের ইতিহাসে হয়তো যাহা অদ্বিতীয়, এবং আত্মবিলয়ের অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয়। এই নিরতিশয় অবিশ্বাস্য ঘটনার একমাত্র সাক্ষী রহিলেন দেবতা।

ক্ষুব্ধ স্খলিত কণ্ঠে বাণীকণ্ঠ বলিলেন; "তোমার উপাধি-পত্রের কী ব্যবস্থা করব মা?"

যূথিকা বলিল, "যা আপনি ভালো বিবেচনা করেন তর্কতীর্থ মশায়। হয় আগুন, নয় জল, নয় অন্য আর কিছু—যা আপনার ভালো মনে হয়।"

গোবিন্দজীর চরণ হইতে একটি ফুল তুলিয়া লইয়া বাণীকণ্ঠ যূথিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। তৎপরে তাহার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার এত বড় আত্মোৎসর্গ গোবিন্দ অপুরস্কৃত রাখবেন না বউমা, শান্তি আর সৌভাগ্যে তোমার রিক্ততা পূর্ণ হবে।" বলিয়া উত্তরীয়প্রান্তে চক্ষু মুছিলেন।

নত হইয়া যূথিকা বাণীকণ্ঠের পদধূলি গ্রহণ করিল।

ডিপ্লোমাখানা তুলিয়া লইয়া বাণীকণ্ঠ প্রস্থান করিলে যূথিকা পিছন দিকের ফুলবাগানে গিয়া পল্লবঘন বকুলগাছের ছায়ায় স্থাপিত একটা বেঞ্চের উপর উপবেশন করিল। এই জায়গাটা তাহার অতিশয় প্রিয়। সুখে এখানে সে আনন্দ পায় দুঃখে পায় শান্তি।

ডিপ্লোমা উৎসর্গ করিবার সময়ে হয়তো একটা মর্মন্তুদ বেদনার আঘাতেই চোখের জল নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু সেই বেদনা ক্রমশ বেগ হারাইয়া হারাইয়া এখন সহজ হইয়া আসিয়াছে,—ঠিক যেমন গিরিমুখ-নিঃসৃত উচ্ছল জলরাশি সমতলভূমিতে উপনীত হইয়া শান্ত হয়। দূর আকাশের রৌদ্রদীপ্ত নীলিমার মধ্যে একদল চিল আকম্পিত প্রসারিত পক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া একটা অনুভূতপূর্ব অব্যক্ত ঔদাস্যে যূথিকার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল।

প্রিয়জনের মৃতদেহ পুড়াইয়া শেষ করিয়া শ্মশান হইতে যেরূপ বৈরাগ্য লইয়া

মানুষ গৃহে ফিরে, ঠিক সেইরূপ একটা বৈরাগ্য যূথিকা অনুভব করিতে লাগিল তাহার অন্তরের মধ্যে। ভস্মীভূত প্রিয়জনের মতো বিসর্জিত ইংরেজী বিদ্যাও যে তাহার জীবনে আর কোনও দিন ফিরিয়া আসিবে না, সে কথা তাহার সত্যসন্ধ মনে সুস্পষ্ট হইতে সামান্য মাত্রও বাকি ছিল না।

আসক্তির কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া জীবন কেন্দ্রান্তরে আবর্তিত হইতে লাগিল। মনে হইল, জীবনের অত বড় একটা সার বস্তু হইতে রিক্ত হইবার পর আর কোনও কিছু হইতে রিক্ত হওয়াই তাহার পক্ষে কঠিন রহিল না;—এমন কি স্বামী হইতেও না। একটা সুনিবিড় চিন্তাগর্ভে দেখিতে দেখিতে যূথিকা নিমগ্ন হইয়া গেল।

"বউরাণী-মা!"

তন্দ্রাবিমুক্ত হইয়া যূথিকা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, আনন্দ তাহাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। বলিল, "কী বলছিস আনন্দ?"

"চা খাবার তৈরি হয়েছে।"

"আচ্ছা চল্ যাচ্ছি।"

সমস্ত দিন মনটা বৈরাগ্যের একটা তরল বিলাসে আবিষ্ট হইয়া রহিল। সন্ধ্যার পর সেদিন আর সংস্কৃত পড়িতে ভালো লাগিল না—আসক্তি যেন তাহা হইতেও সরিয়া গিয়াছে।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চন্দ্র বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছে। দ্বিতলের বারান্দার পূর্বপ্রান্তে চেয়ারে বসিয়া যূথিকা আকাশ-পাতাল কত কি চিন্তা করিতেছিল; এমন সময়ে দিবাকর আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তথায় উপবেশন করিল।

যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

দিবাকর বলিল, "একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

"কোথায়?"

বলিতেই হইল, "ক্ষীরোদ ঠাকুরের বাড়ি।"

"কোনও কাজ ছিল?"

"না, এমনই গল্প সল্প করতে!"

যে বৈরাগ্য সমস্ত দিন মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, পুনরায় তাহা গাঢ় হইয়া নামিয়া আসিল। এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করিয়া যূথিকা বলিল, "যদি কিছু মনে না কর তো একটা কথা বলি।"

"কী কথা?"

"শিবানীকে বিয়ে করে তুমি সুখী হও?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "সে অবশ্য মন্দ কথা নয়; কিন্তু তোমার গতি কী হবে?"

"আমার গতি? আমার গতি তো ঠিক হয়েই আছে—বাংলা দেশের

কোনও মেয়ে ইস্কুলে আমার গতি হবে। লাভের মধ্যে তোমার আর বিলেত যাওয়ার দরকার হবে না।"

"কেন!"

"শিবানী তো ইংরিজীতে এম. এ.-পাস মেয়ে নয়।" তাহার পর কণ্ঠস্বর ঈষৎ গভীর করিয়া বলিল, "দেখ, আমি পরিহাস করছি না। শিবানীকে বিয়ে করলে তুমি যদি সত্যি-সত্যিই সুখী হও তা হলে নিশ্চয় বিয়ে কর। তুমিও নীলকান্তমণির প্রত্যাশী, আর শিবানীও ক্ষীরোদ ঠাকুমার কালোমানিক। তা হলে বাধা কোথায়?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "তুমি বুঝি সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' পড়েছ?"

যূথিকা বলিল, "সম্প্রতি নয়, অনেক আগে পড়েছি।"

'প্লট মনে আছে?"

"আছে।"

"তোমার ভয় নেই, আমাদের জীবনের কাহিনী দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হবে না।"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "তা নিশ্চয় হবে না, কারণ, আমাদের জীবনের কাহিনীতে সূর্যমুখী কোনদিন মনসাগাছায় ফিরে আসবে না; সুতরাং কুন্দনন্দিনীরও বিষ খাওয়ার দরকার হবে না।"

দিবাকর বলিল, "সে যাই হোক, এ নগেন্দ্রনাথের ওপরে এত অবিশ্বাস কেন তোমার?"

যূথিকা বলিল, "বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। আমাদের কাহিনীর সূর্যমুখী ঠিক 'বিষবৃক্ষের' সূর্যমুখীর মতো নগেন্দ্রনাথকে সুখী দেখতেই চায়। কিন্তু তাই বলে সে তার মতো দাঁড়িয়ে থেকে নগেন্দ্রনাথের বিয়ে দেওয়াতে পারবে না। বিয়ের আগেই সরে পড়বে।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রকার বিষবৃক্ষের আলোচনা আরও কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, আহারের জন্য ভোলা আহ্বান করিতে আসায় আপাতত তাহাতে ছেদ পড়িল।

উনচল্লিশ

বেলা তখন সাড়ে তিনটা। মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর দিবাকর জমিদারী সেরেস্তায় নিজের কক্ষে বসিয়া কাজকর্ম দেখিতেছে, এবং একতলায় পড়িবার ঘরে যূথিকা সংস্কৃত অধ্যয়নে রত, এমন সময়ে আনন্দ আসিয়া বলিল, "বউরাণী-মা, মেয়ে-ইস্কুলের বড় মাস্টার একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান?"

যূথিকা বলিল, "কে? মিস্ মিত্র?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, করুণাদিদি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "আচ্ছা এইখানেই ডেকে আন।"

আনন্দ প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল পরে মিস্ মিত্রকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মিস্ মিত্র প্রবেশ করিয়া যূথিকার পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে বিশেষ একটু কথা আছে দিদি।"

নিজের আগ্রহ এবং যূথিকার অনুমোদন অনুসারে কিছু দিন হইতে মিস্ মিত্র যূথিকাকে "দিদি" বলিয়া সম্বোধন করে।

ইঙ্গিতে পাশের চেয়ার দেখাইয়া যূথিকা বলিল, "বস।" মিস মিত্র উপবেশন করিলে বলিল, "কী কথা বল ?"

দ্বারের দিকে একবার সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিয়া মিস মিত্র বলিল, "এখানেই বলব ? কেউ আসবে না তো এখানে ?"

যূথিকা বলিল, "কেউ আসবে না, নির্ভয়ে বল।"

মিস্ মিত্রের মুখে সঙ্কোচ এবং বিহ্বলতার একটা ছায়া প্রথম হইতেই দেখা গিয়াছিল। ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে সে বলিল, "আসলে যে-কথাটা বলতে এসেছি, তা বলবার আগে এই চিঠিটা আপনাকে দেখাই।" বলিয়া খামের ভিতর হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া যূথিকার হাতে দিয়া বলিল, "আমার ছোটকাকা লিখেছেন, আজকের ডাকে এসেছে—আপনি পড়ে দেখুন।"

চিঠিটা পাঠ করিয়া যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কী স্থির করেছ ? যেতে চাও ?"

"যাব ব'লেই মনে করছি।"

"কিন্তু এখানে তুমি যা মাইনে পাচ্ছ তার চেয়ে ওখানকার মাইনে তো কিছু কমই দেখছি করুণা।"

"কিছু বেশি হ'লেও ওখানে যেতাম না, আপনার লোভেই এখানে থাকতাম। কিন্তু—" অতঃপর কেমন করিয়া কথাটা শেষ করিবে ঠিক ভাবিয়া না পাইয়া মিস্ মিত্র থামিয়া গেল।

মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু কী, করুণা ? আমার ওপর লোভ কমে গেছে না-কি তোমার ?"

মিস্ মিত্র বলিল, "আপনার ওপর লোভ একটুও কমে নি দিদি, ইস্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক আপনি ছেড়ে দেবার পর থেকে ইস্কুলের ওপরই লোভ গেছে। আজ একটু আগে যে খবর পেলাম, তা যদি সত্য হয়, আর দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত সেই খবরের মতোই ঘটনা যদি ঘটে, তা হ'লে আগেভাগেই এ পাপ-মনসাগাছা ছেড়ে যেতে পারলে ভালো হয়।"

মিস মিত্রের কথা শুনিয়া একটা দুশ্চিন্তার মেঘে মুহূর্তের জন্য যূথিকার মুখ একটু মলিন হইল; কিন্তু পরক্ষণেই হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সে বলিল, "কেন করুণা, মনসাগাছায় এমন কী অন্যায় ঘটনা ঘটবে বলে ভয় করছ।"

মিস্ মিত্র বলিল, "বলছি সে কথা। কিন্তু দিদি, আপনি যেন কিছুতেই

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার বোন নেই, আপনাকে যদি নিজের বড় বোনের মতো না ভালোবাসতাম, তা হ'লে কখনই এমন করে ব্যস্ত হয়ে আপনার কাছে ছুটে আসতাম না। আপনি আমার মনিব, আশ্রয়দাতা—এ সব চর্চায় যদি আমার অপরাধ হয়, আপনি আমাকে দয়া করে ক্ষমা করবেন।"

মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "তোমার ভয় নেই, কী বলবে অসঙ্কোচে বল।"

"শিবানীকে আপনি নিশ্চয় জানেন ?"

শিবানীর নামোল্লেখে যূথিকার মুখের উপর দিয়া পুনরায় একটা ক্ষণস্থায়ী মলিনতা ভাসিয়া গেল ; বলিল, "জানি।"

"আমাদের ডিরেক্টার মশায়, শিবানীকে মাস দেড়েক-দুই প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ইংরিজী পড়ান, এ কথা আপনি জানেন ?"

"না, তা জানি নে।"

"শিবানীর বিয়ের কথা আপনি কিছু শুনেছেন দিদি ?"

"তাও শুনি নি।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া মিস্ মিত্র বলিল, "আমি কিন্তু আজ এইমাত্র শুনেছি। কিন্তু সে এত কুৎসিত আর অবিশ্বাস্য কথা যে আমি মুখ দিয়ে বার করতে পারছি নে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "বুঝতে পারছি করুণা, তোমাকে বলতে হবে না। কিন্তু এ কথা তোমাকে কে বললে ?"

মিস মিত্র বলিল, "বিনোদা। আপনি তাকে জানেন। সে না-কি ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের বিধবা ভাইঝি উমার মুখ শুনেছে। ভারি ভালো মেয়ে বিনোদা। আপনাকে সে অতিশয় ভক্তি করে, আমাকেও ভালোবাসে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে নি, তাই তাড়াতাড়ি আমাকে এসে জানিয়েছে। বোশেখ মাসের পাঁচুই নাকি কলকাতায় গিয়ে শিবানীর বিয়ে হবার কথা। এ কিন্তু কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না দিদি। এর যা-হয় একটা বিহিত করতেই হবে।"

এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করিয়া অন্যমনস্কভাবে যূথিকা বলিল, "তা তো করতেই হবে করুণা।"

যূথিকার কথায় উৎসাহিত হইয়া মিস্ মিত্র বলিল, "এ শুধু ঐ কুহকিনী ক্ষীরোদবাসিনীর কাণ্ড। ইংরিজী পড়ানোর ফাঁদ পেতে ঐ কালো মেয়েটাকে পার করবার ব্যবস্থা করেছে। গ্রামে না-কি অনেকেই এ কথা জানে, কিন্তু তবুও এ কথা বিশ্বাস হয় না দিদি।"

যূথিকার নিকট হইতে আর কোনও সাড়া না পাইয়া এবং তাহার স্তব্ধ গভীর মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়া মিস্ মিত্র আর কোনও কথা বলিতে সাহস পাইল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হাতের রিস্টওয়াচ্ দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ইস্কুলের ছুটি হওয়ার সময় হলো—এখন তা হ'লে আসি দিদি।"

যূথিকা বলিল, "এস।"

"অপরাধ করে গেলাম না তো দিদি ?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, 'না। তুমি যে আমাকে সত্যিই ভালোবাস, তার প্রমাণ দিয়ে গেলে।"

মিস্ মিত্র প্রস্থান করিলে ক্ষণকাল যূথিকা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যে-কথার সামান্য একটু সূত্রপাত মনে মনে সে সন্দেহ করিতেছিল, ভিতরে ভিতরে তাহা যে ইহারই মধ্যে এতটা পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা জানা ছিল না। দেখিতে দেখিতে বড় বড় দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষু হইতে নির্গত হইয়া আসিল।

একমাত্র দুঃখই অশ্রুকে নিষ্কাশিত করিয়া আনে, এ কথা যে জানে, সে অশ্রুর সম্পূর্ণ তত্ত্ব অবগত নহে।

বইগুলো গুছাইয়া তুলিয়া রাখিয়া যূথিকা প্রসন্নময়ীর কক্ষে উপস্থিত হইল। শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল, "বাঁ হাটুর ব্যথাটা এ বেলা কেমন আছে, পিসিমা ?"

প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ও-বেলার চেয়ে একটু কমই বোধ হচ্ছে। তারিণী কবরেজের এ তেলটা মন্দ নয় দেখছি।"

"একটু মালিস করে দেব ?"

মাথা নাড়িয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "না না, বউমা, মালিস করতে হবে না। ও-বেলা অতক্ষণ মালিস করে দিলে, আবার এরই মধ্যে মালিশ কেন ? রাত্রে ঘুমোবার আগে চাঁপার মা একটু দেবে অখন।"

'তা হ'লে একটু পা টিপে দিই ?" বলিয়া যূথিকা প্রসন্নময়ীর পদদ্বয়ে হস্তার্পণ করিল।

ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "না না, পা টিপতেও হবে না। তুমি বস, একটু গল্প করি।"

"তা হলে পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই।" বলিয়া আর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া যূথিকা প্রসন্নময়ীর পদসেবায় রত হইল।

যূথিকাকে নিরস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা প্রসন্নময়ী আত্মসমর্পণ করিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "এমন নাছোড়বান্দা মেয়ে আমি যদি জীবনে দুটি দেখেছি !"

তাহার পর, যে-সংসার কিছুদিন হইতে নিজে দেখিতে পারিতেছেন না, সেই সংসারের অল্প-স্বল্প খবর লইতে লাগিলেন।

কথায় কথায় দিবাকরের কথা উঠিল। বলিলেন, "হাঁ, বউমা, দিবা এখনও সে সব কথা বলে না-কি ?"

"কী কথা, পিসিমা ?"

"ঐ যে ইংরিজী শিখতে বিলেতে যাবার কথা। আমাকে একদিন বলছিল যে।"

যূথিকা বলিল, "আর বোধ হয় যাওয়ার দরকার হবে না।"

"হবে না ?"—তাড়াতাড়ি প্রসন্নময়ী শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। যুক্তকর মস্তকে

ঠেকাইয়া বলিলেন, "গোবিন্দ। গোবিন্দ।" তৎপরে সহর্ষে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বাঁচালে বউমা। গোবিন্দর কাছে অনেক দরবার করেছিলাম, দয়া করেছেন তা হ'লে।" তাহার পর তিনি রুষ্ট কণ্ঠে কতকটা নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, "দরকার কী বাপু তোর বিলেতে যাবার। ঘরে এমন বিদ্বান বউ রয়েছে, শেখ্ না কেন কত ইংরিজী শিখবি। এ কেবল সেই দেবা ভটচাজ্জির কারসাজি বই তো নয়। নিজের ন্যাজ কেটেছে, এখন অপরের ন্যাজ কাটবার জন্মে ব্যস্ত।"

যূথিকা বলিল, "আপনার কষ্ট হচ্ছে পিসিমা, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি এখন যাই।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এস মা, ভারি সুসংবাদ দিয়ে গেলে। বেঁচে থাকো।" বলিয়া প্রসন্নময়ী শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন।

প্রসন্নময়ীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া যূথিকা পিছন দিকের ফুলবাগানে বকুলগাছতলার বেঞ্চে গিয়া কিছুক্ষণ বসিল; সন্ধ্যাকালে গোবিন্দজীর আরতির সময়ে সমস্তক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আরতি দেখিল, তাহার পর সংস্কৃত অধ্যয়নের সময় উপস্থিত হইলে বাণীকণ্ঠর হস্তে একটা পুস্তক দিয়া বলিল, "আপনার বইখানা ফিরিয়ে দিচ্ছি তর্কতীর্থ মহাশয়।"

সবিস্ময়ে বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "কেন মা? এ বই তো আরও কিছুদিন তোমার কাজে লাগতে পারত।"

"আমি বোধ হয় কাল কলকাতা যাচ্ছি।" বলিয়া যূথিকা নত হইয়া বাণীকণ্ঠর পদধূলি লইয়া তাঁহার পায়ের নিকট একতাড়া নোট স্থাপিত করিল।

পারিশ্রমিকের হিসাবে বাণীকণ্ঠর বিশেষ কিছুই পাওনা বাকি ছিল না। নোটগুলো তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কিসের টাকা বউমা?"

যূথিকা বলিল, "সামান্য প্রণামী।"

এক মুহূর্ত চিন্তাবিষ্ট থাকিয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "কী ব্যাপার বল তো, বউমা?"

"এমন কিছু নয়, তর্কতীর্থ মহাশয়।" বলিয়া সে প্রসঙ্গের শেষ করিয়া যূথিকা বাণীকণ্ঠর নিকট বিদায় লইল। তাহার পর দ্বিতলের বারান্দায় গিয়া দিবাকরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চল্লিশ

রাত্রি নয়টার সময়ে দিবাকর গৃহে ফিরিল। উপরে আসিয়া দেখিল, বারান্দায় যূথিকা বসিয়া আছে। নিকটে আসিয়া বলিল, "কী করছ এখানে একা বসে ?"

যূথিকা বলিল, "তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

শুক্লা নবমীর প্রথম দিকের রাত্রি; উল্লসিত জ্যোৎস্নার শুভ্র কিরণে ধরিত্রী নিমগ্ন। দিবাকরের মনটাও একটা হালকা খুশির আমেজে প্রসন্ন ছিল। স্মিতমুখে বলিল, "রাতটা আজ অপেক্ষা করবার মতো চমৎকার বটে। তবে হাতের কাছে বেলফুলের একটা মালা থাকলে আরও ভালো হতো। বলিয়া পাশের একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া যূথিকার একখানা হাত টানিয়া লইয়া অল্প অল্প নাড়িতে লাগিল।

যূথিকা ইহাতে আপত্তি করিল না, হাত টানিয়া ছাড়াইয়াও লইল না। মনে মনে শুধু বলিল, 'বেলফুলের মালার কথা বলছ, কিন্তু আজ যে মালা-ছেঁড়ার পালা সে কথা তুমি জান না।' প্রকাশ্যে বলিল, "প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তুমি শিবানীকে ইংরিজী পড়াও ?"

দিবাকর বলিল, "পড়াই।"

"মাস দুই আড়াই পড়াচ্ছ।"

প্রথম প্রশ্নেই তাহার হাতের মুঠি শিথিল হইয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয় প্রশ্নে দিবাকরের হাত হইতে যূথিকার হাত খসিয়া পড়িল। বলিল, 'তা হবে।'

"এ কথা এতদিন আমাকে বলো নি কেন !"

"এমন তো অনেক কথাই তোমাকে বলি নি। জমিদারী সেরেস্তার অনেক কথাই তোমাকে বলি নে।"

"কিন্তু শিবানীর কথায় আর জমিদারী সেরেস্তার কথায় তফাত আছে। শিবানীর কথা এতদিন কেন বলো নি, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

মেজাজটা প্রথমে ছিল মসৃণ, সহসা একেবারে পাল্টাইয়া বিপরীত হইল। রুক্ষকণ্ঠে সে বলিল, "সে কথার কৈফিয়ৎও দিতে হবে নাকি তোমাকে।"

যূথিকা বলিল, "না, দিতে হবে না। শোন, কাল আমি মনসাগাছা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

শিবানীর সহিত দিবাকরের বিবাহ সম্পর্কে যে সংবাদ মিস্ মিত্র দিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোনও কথাই উত্থাপিত না করিয়া যূথিকা একেবারে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিল। সমগ্র সংবাদের এক অংশের সত্যতার প্রমাণ পাইয়া হয় সে অবশিষ্ট অংশও সত্য বলিয়াই মানিয়া লইল; অথবা দিবাকরের মুখ হইতে এই মাত্র যে কথার প্রমাণ পাইল, তাহার ভিতর দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকরের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ নবতর ভিত্তি লাভ করিয়া এমনই যথেষ্ট মনে হইল যে, বিবাহের

কুৎসিত প্রসঙ্গে প্রবেশ করিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইল না। সেজন্য একেবারে সে বলিয়া বসিল, "কাল আমি মনসাগাছা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া রূঢ়স্বরে দিবাকর বলিল, "কেন, শুনি।"

দিবাকরের প্রশ্ন শুনিয়া যূথিকার মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বলিল, "কৈফিয়ৎ দিতে তুমি নিজে আপত্তি কর, অথচ আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করছ? যাব আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে।"

ক্রোধে এবং সন্ত্রাসের যুক্ত ক্রিয়ায় সঞ্জাত একটা উৎকট বিস্ময়ে দিবাকরের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। যূথিকার কথার ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবার জন্য এক মুহূর্ত সময় লইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া সগর্জনে সে বলিল, "সাহস কর তুমি এত বড় কথা বলতে?"

মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "করলাম তো।" তাহার পর কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া বলিল, "অবুঝ হয়ো না। কী হবে এই রকম করে পরস্পরে জড়িয়ে থেকে সমস্ত জীবন দুঃখ পেয়ে? তোমার দিকের কথা তো অনেক দিন অনেক কিছু বলেছি, আজ আর সে-সব কথা তুলে তোমাকে বিরক্ত করতে চাই নে। এবার নিজের দিকের কথা একটু বলি। দেখ, আমিও বিরক্তি হয়ে' গেছি আমার এই এখানকার জীবন নিয়ে। এ ধন-সম্পত্তি টাকা-কড়ি আর ভালো লাগে না আমার। মোহ গেছে কেটে। তুমি ঠিকই ধরেছিলে, একমাত্র তোমার টাকার লোভেই তোমাকে আমি বিয়ে করেছিলাম; ভালোবেসে করি নি।"

দিবাকর চিৎকার করিয়া উঠিল, "খবরদার! ফের যদি এ কথা উচ্চারণ কর, তা হ'লে তোমাকে আমি খুন করব।"

যূথিকার মুখে পুনরায় ক্ষীণ হাস্য দেখা দিল; বলিল, "তা হ'লে তো ভালোই হয়; সংক্ষেপে সমস্ত জটিলতা চুকে যায়। রইলাম বসে এখানে; নিয়ে এস তোমার বন্দুক, গুলি কর আমাকে।"

"তুমি অতি সর্বনেশে মেয়েমানুষ!"

"বিদেয় কর এ সর্বনেশে মেয়েমানুষকে কুলোর বাতাস দিয়ে তোমাদের ঘোষাল মশায়ের সঙ্গে।"

"কোথায়? কোন্ চুলোয়?"

"আপাতত কলকাতায় ঠাকুরপোর বাসায় কিছুদিনের জন্যে। সেখানে গিয়ে খুঁজে পেতে একটা নার্সিং হোম ঠিক করে নোব। তারপর, তোমার সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, প্রথম যেদিন তাকে পাঠাবার মতো অবস্থা হবে সেই দিনই তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার ব্যবস্থা করব।"

সবিদ্রূপকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "ঠাকুরপোর বাসায় না গিয়ে একেবারে সুনীথ চাটুজ্জের বাড়ি গিয়ে উঠলেই তো ভালো হতো। টাকার লোভে আমাকে বিয়ে করেছিলে, এখন সুনীথ চাটুজ্জেকে দেখে নতুন লোভ হয়েছে।"

এ কথায় কোনও উত্তর না দিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যূথিকা

বলিল, "কাল রাত্রের গাড়িতে ঘোষাল মশায়ের সঙ্গে আমার কলকাতা যাবার ব্যবস্থা কর।" বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

দৃপ্ত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "না, করব না। তোমাকে এখানে বন্দী করে রেখে দোব।"

ফিরিয়া যূথিকা দাঁড়াইয়া বলিল, 'সে চেষ্টা কোরো না। পারবে না আমাকে আটকে রাখতে। সত্যই আমি সর্বনেশে মেয়েমানুষ, যা করব বলি তা করতে কিছুতে ছাড়ি নে। ঘোষাল মশায়কে দিয়ে যদি আমাকে না পাঠাও, তা হলে সাত-আট মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠব। তাতে যদি বাধা দাও, যদি বন্দী করেই রাখো, একান্তই যদি দেহ নিয়ে পালাবার সুবিধে না পাই, তাহ'লে অগত্যা দেহ ছেড়েই পালাব। কিছুতেই রাখতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত পালাবই।" তাহার পর অনুনয়ের কোমলকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ছেলেমানুষি করো না। কী হবে একজন অনিচ্ছুক স্ত্রীকে ঘরে আটকে রেখে? ছাড়াছাড়ি যখন হচ্ছেই, তখন যতটা সৌষ্ঠবের সঙ্গে হয়, সেইটাই ভালো নয় কি? তোমাদের বড় ঘর, বড় সম্ভ্রম, তাতে কলঙ্কের দাগ যতটা কম লাগে, সেই চেষ্টাই আমাদের দুজনেরই করা উচিত।"

আর কোনও কথা না বলিয়া যূথিকা প্রস্থান করিল।

রাত্রি বারোটার সময়ে শয়ন করিতে আসিয়া দিবাকর দেখিল, শয্যায় যূথিকা নাই। পাশের ঘরের দ্বার নিঃশব্দে ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে বন্ধ। বুঝিল, সেই ঘরে যূথিকা শয়ন করিয়াছে।

ঝটিকার শেষের দিকে যেমন হয়, পরদিন দিবাকরের ক্রোধ তেমনি খানিক মন্দীভূত হইল বটে, কিন্তু একটা দুর্বার অভিমান সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া রহিল। একমাত্র ঘোষাল মহাশয়ের সহিত যূথিকাকে কলিকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কিছু করিবার সে সুবিধা পাইল না। যূথিকার সহিত মিটমাট করিবার তো নহেই, এমন কি কলহ করিবারও নহে। সমস্তক্ষণ যূথিকা দিবাকর হইতে দূরে দূরে সরিয়া রহিল।

যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইলে, যূথিকা প্রথমে গৃহদেবতা গোবিন্দজীকে প্রণাম করিল। তাহার পর প্রসন্নময়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

কিছু পূর্বে চাঁপার মার মুখে প্রসন্নময়ী যূথিকার কলিকাতা যাইবার কথা শুনিয়াছিলেন। যূথিকার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমার তো জষ্টি মাসে যাবার কথা ছিল বউমা তাড়াতাড়ি এ মাসে যাচ্ছ কেন?"

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া যূথিকা একটু হাসিল।

"যাওয়া হঠাৎ ঠিক হলো?"

"হ্যাঁ"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "আমি তো বেতো রুগী, নিজ

হাতে যত্ন আত্তি কিছুই করতে পারি নে। মার কাছে গিয়ে একটু আরামে যত্নে থাক, সে কথা ভালো।"

যূথিকার প্রস্থান করিবার উপক্রম দেখিয়া আর কথা না বাড়াইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ছেলে কোলে করে ভালোয় ভালোয় ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে এসো, গোবিন্দজীর কাছে সেই প্রার্থনা করি।"

আর একবার প্রসন্নময়ীকে প্রণাম করিয়া যূথিকা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া কোনও দিকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে দিবাকরকে প্রণাম করিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

গাড়ি যখন ছাড়িল, তখন দিবাকর জমিদারী সেরেস্তায় তাহার নিজ কক্ষে বসিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে অকারণে একটা অজরুরী দলিলের দিকে চাহিয়া ছিল।

একচল্লিশ

যে অকল্পনীয় ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটিয়াই গেল, তাহার সন্তাপ এবং প্রদাহের অসাধারণত্ব দিবাকরের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া এতই কেন্দ্রচ্যুত করিয়া দিয়াছিল যে, পূর্বাপর সব কথা বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতাও যেন তাহার লোপ পাইয়াছিল। গত রাত্রের যূথিকার সেই শান্ত অথচ কঠিন অনমনীয় ভঙ্গী দেখিয়া যূথিকাকে নিরস্ত করিতে সে হয়তো সাহস পায় নাই। অথবা, দুর্বার ক্রোধ এবং অভিমানের প্রভাবে হয়তো সে-চেষ্টা করিতে প্রবৃত্তিই হয় নাই। কিন্তু তাহার মনের কোনো সুদূর প্রদেশে এমন একটু প্রত্যাশাও লাগিয়া ছিল যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো যূথিকা নিজেই নিরস্ত হইবে। কিন্তু সন্ধির কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া গাড়িতে উঠিয়া সে যখন সত্য সত্যই চলিয়া গেল, তখন তাহার এই কথাই বারংবার মনে হইতে লাগিল যে, যে-পথে যূথিকা যাত্রা আরম্ভ করিল, তাহার শেষ প্রান্তে না পৌঁছিয়া সে হয়তো নিবৃত্ত হইবে না। মনে পড়িল গত রাত্রির কথা, 'সত্যিই আমি সর্বনেশে মেয়েমানুষ, যা করব বলি তা করতে কখনও ছাড়ি নে।' অজরুরী দলিলটা দেরাজের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবাকর তাড়াতাড়ি পথে বাহির হইয়া পড়িল।

অকারণে নন্দীপুরের দিকে খুব খানিকটা ঘুরিয়া আসিল। গৃহে ফিরিয়া পড়িবার ঘরে গিয়া দুই-চারটা বই খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোটাতেই মন বসিল না। বারান্দায় এক কোণে সামান্য একটু ঝুল জমিয়াছিল, তজ্জন্য ভোলাকে অপরিমিত তিরস্কার করিল। অবশেষে সন্ধ্যার পর যূথিকার সেই অতি-প্রিয় বসিবারস্থান বকুলগাছের তলায় বেঞ্চে গিয়া বসিল।

আকাশের এলোমেলো হাওয়ায় ছিন্ন খণ্ড মেঘসমূহ যেমন একটা অবিচ্ছিন্ন

ধারায় জমাট বাঁধিতে না পারিয়া ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়, দিবাকরের মনের ভিতরের চিন্তারাশিরও ঠিক সেইরূপ ছিন্ন অসংলগ্ন অবস্থা। কখনও ক্রোধ, কখনও অভিমান, কখনও লজ্জা, কখনও বা ভয়ের দ্বারা তাড়িত হইয়া খণ্ড চিন্তারাশিগুলো নিরুপায় মীমাংসাহীনতায় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মনে হইল চিত্তশক্তির যে দৃঢ়তা দেখাইয়া যূথিকা চলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রভাবে সে যদি শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বসে, তাহা হইলে সে ভুবনের লজ্জা এবং গ্লানি লুকাইবার উপযুক্ত স্থান বিশ্বসংসারে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। গ্রামের বাস তো উঠাইতেই হইবে ;—হয়তো বা বেশ কিছুদিনের জন্য দেশ ছাড়িয়া বিদেশে পাড়ি দিতে হবে। এত বড় অভিজাত বংশের মর্যাদার শুভ্র ঐতিহ্যলিপিতে এমন কুৎসিৎ কলঙ্কের দাগ লাগিতে দেখিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে কোম্পানি সুযোগ পাইয়া যখন লাফাইতে থাকিবে, যখন তাহারা রটনা করিতে থাকিবে যে, বংশের চিরাগত সংস্কার এবং নীতির বিরুদ্ধে একটা এম. এ. পাস-করা মেয়েকে আমদানি করিয়া আনিবার অবিমৃষ্যকারিতার অনিবার্য ফল ফলিয়াছে, তখন এ কথা প্রমাণ করা কঠিন হইবে যে, যূথিকার ইংরেজী শিক্ষার অজীর্ণতা এ ঘটনার জন্য দায়ী নহে, ইংরেজী শিক্ষা যূথিকার মধ্যে জীর্ণ বস্তু।

কিন্তু কেনই বা যূথিকা সহসা এরূপ চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বসিল? কী এমন গুরুতর দাম্পত্য অপরাধ তাহার দিকে সূচিত হইয়াছে, যাহাতে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাব সমর্থনীয় হইতে পারে? শিবানীকে কেন্দ্র করিয়া এমন কী সংশয়াত্মক অবস্থা দেখা দিয়াছে, যাহা এইরূপ গুরুতরভাবে দণ্ডিত হইবার যোগ্য? মনে পড়িল অনেক দিনের অনেক তর্কের কথা। একদিন যূথিকা বলিয়াছিল, "তোমার মঙ্গলের জন্যে তোমাকে মুক্তি দেওয়ার দরকার বোধ করলে আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতেও পারি।" আর একদিন বলিয়াছিল, "আমাদের কাহিনীর সূর্যমুখী ঠিক 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখীর মতো নগেন্দ্রনাথকে সুখী দেখতেই চায়।" নীলকান্তমণির উপমা লইয়া কতদিন কত কথা হইয়াছিল, সে সকল কথাও একে একে মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু এ সকল কথা তো প্রভাতকালের মেঘখণ্ডের মতো দাম্পত্য জীবনের আকাশে আসে যেমন হাল্কা কারণে, বিলীনও হয় তেমনি চক্ষের পলকে। ইহাদের স্থায়ী মূল্য কোথায়?

কিন্তু যে কারণটা গত রাত্রে যূথিকা নির্দেশ করিয়াছিল, "টাকার লোভেই তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, ভালোবেসে নয়। 'মোহ গেছে কেটে।" সহসা সে কথা মনে পড়িয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সমস্ত চিত্ত চকিত হইয়া উঠিল। যূথিকার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া সহজে মনে হয় না, কিন্তু কথাটা এমনই নিষ্ঠুর যে, ক্রোধ অথবা অভিমানের তাড়নায় মিথ্যা করিয়া বলিলেও ইহার নিষ্ঠুরতা বিশেষ কিছু কমে না। সত্য হইলে তো কথাই নাই। মনে হইল, যূথিকার মনে যদি বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প সত্য সত্যই জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে এই

কথাটাই হয়তো সত্য। কারণ, মোহ যদি সত্যই কাটিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ।

একটা দুর্বার অভিমানে সমস্ত মন ছাইয়া আসিল। মনে হইল, যূথিকা এই ভঙ্গী অবলম্বন করিবার সাহস পাইয়াছে শুধু তাহার উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার জোরে। বাংলা দেশের কোনও মেয়ে-ইস্কুলে সে প্রবেশ করিবে—এ সকল কথার কথা। ভালো রকমেই সে জানে যে, দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিলেও বাংলা দেশের অথবা পাঞ্জাবের কোনো গার্লস কলেজে একটা মাহিনার চাকরি তাহার পক্ষে দুর্লভ হইবে না,—তাই তাহার এত দুঃসাহস। অন্নবস্ত্র-সমস্যা সমাধান করিবার শক্তির মাত্রার উপরেই মানুষের যত পরাক্রম এবং দুর্বলতার বাস।

কিছুক্ষণ হইতে গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি হইতেছিল। কাঁসর-ঘণ্টা নীরব হইবার ক্ষণকাল পরে অদূরে ভোলাকে দেখা গেল। নিকটে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "হুজুরের সঙ্গে ঠাকুরমশায় একবার দেখা করতে ইচ্ছে করেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দিবাকর বলিল, "কে? তর্কতীর্থ মশায়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

মনটা প্রথমে বিরূপ লইয়া উঠিল, মনে হইল বলে, এখন নয়; কিন্তু তাহার পর কী ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, এখানেই ডেকে নিয়ে আয়।"

বাণীকণ্ঠ উপস্থিত হইলে দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর প্রণাম করিয়া তাহাকে বেঞ্চে বসাইয়া বেঞ্চের এক প্রান্তে নিজে উপবেশন করিল।

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "দিবাকর, আমি যে তোমাদের শুভানুধ্যায়ী, সে বিশ্বাস তোমার আছে তো?"

দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় আছে।"

"তোমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর আমাকে শুধু তাঁর পরিবারে আচার্য আর পুরোহিত বলেই জানতেন না, তাঁর একজন বন্ধু বলেও গণ্য করতেন, সে কথা তুমি অবগত আছ?"

"আছি। আপনাকে পিতৃবন্ধু বলে মনে রাখবার জন্তে মৃত্যুকালে তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন।"

"তা হলে আমি যদি তোমার পরিবারিক ব্যাপার নিয়ে একটু আলোচনা করি, তা হলে তুমি তা অনধিকার চর্চা বলে মনে করবে না তো?"

"না করব না।"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "মা-যূথিকার সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই। কয়েকটা কারণে তাঁর বিষয়ে আমার মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে কথার পূর্বে একটা কথা তোমার কাছ থেকে জানা দরকার।"

"কী কথা?"

"কয়েক দিন আগে বউমা তাঁর ইংরেজী বিদ্যা সম্বন্ধে একটা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, সে বিষয়ে তুমি অবগত আছ?"

বাণীকণ্ঠর কথা শুনিয়া সকৌতূহলে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরিজী বিদ্যা সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা ?"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "তা হ'লে বুঝতে পারছি, সে বিষয়ে তুমি এখনও কিছু জান না। আজ ন' দিন হলো একটা অনুষ্ঠানের দ্বারা মা-যূথিকা তাঁর জীবনের অমূল্য সম্পদ ইংরিজীবিদ্যা গোবিন্দজীকে অর্পণ করেছেন।"

চকিত হইয়া দিবাকর বলিল, "তার মানে ?"

"তার মানে, গোবিন্দজীর কাছে তিনি শপথ করেছেন, এ জীবনে আর কোনও দিন ইংরিজী পড়বেন না, লিখবেন না, অথবা বলবেন না।"

"সে কী।" বুকে ছুরিকাঘাত হইলে মুখের যে অবস্থা হয়, দিবাকরের মুখেরও কতকটা সেই অবস্থা হইল। পর-মুহূর্তে সে একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "এ অনুষ্ঠান কে করালে ? আপনি ?"

"আমি ভিন্ন আর কে করাবে দিবাকর ?"

উচ্ছ্বসিত হইয়া দিবাকর বলিল, "আমাকে না জানিয়ে, আমার বিনা অনুমতিতে কেন এ কাজ আপনি করলেন ?"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "বউমার নিষেধ ছিল বলে তোমাকে জানাতে পারি নি। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর, কোনদিকে আমি যাই বল তো বাবা ?"

তিক্তকণ্ঠে দিবাকর বলিল,"দক্ষিণার খাতিরে এত গর্হিত কাজও আপনারা করতে পারেন তর্কতীর্থ মশায়। কত দক্ষিণা পেয়েছেন যূথিকার কাছে।"

একটি হরিতকীর দক্ষিণায় বাণীকণ্ঠ এ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। সে কথা না বলিয়া বলিলেন, "কিছু অবশ্য পেয়েছি।"

দিবাকর বলিল, "এর চেয়ে তার প্রাণটা উৎসর্গ ক'রে দিলেন না কেন! আমাকে বললে সে কাজের জন্যে আমি আপনাকে চতুর্গুণ দক্ষিণা দিতাম—সে এর চেয়ে অনেক ভালো হতো।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "এ তুমি ঠিকই বলছ দিবাকর, সে এর চেয়ে সত্যই ভালো হতো। তুমি যে বিদ্যার মূল্য এতটা দিতে পারলে তাতে আমি খুশিও যেমন হয়েছি, বিস্মিতও হয়েছি তেমনি। এখন আমি চললাম। তুমি উপস্থিত উগ্র উত্তেজনার মধ্যে রয়েছ, এখন তোমার সঙ্গে আলোচনা সম্ভব নয়। যাবার আগে একটা কথা কিন্তু তোমাকে বলে যাই। ঠিক দক্ষিণার লোভে এ কাজ আমি করি নি, বউমার অনুরোধে বাধ্য হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে করেছি। তার আগে বউমাকে বিরত করতে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। কিন্তু বউমা যখন বললেন ইংরিজী বিদ্যা তাঁর জীবনে শুভ হয় নি বলে দেবতার পদে তা উৎসর্গ ক'রে তিনি চাল্কা হতে চান, আর যখন তাঁর কাছে শুনলাম, কয়েক দিন আগে থেকেই মনে প্রাণে তিনি ইংরেজী বর্জন করেছেন, তখন দেখলাম অযথা প্রতিবাদ করে কোনও লাভ নেই। ইংরিজী বিদ্যা কেন বউমার জীবনে শুভ হয় নি, সে বিষয়ে নিজের কৌতূহলকে প্রশ্রয় দিই নি, কিন্তু তুমি হয়তো সে কথা সহজেই বুঝতে পারবে।

এ বিষয়ে তোমাকে শুধু এইটুকু বলে যাই যে, লেখাপড়ার ব্যাপারে কৃতবিদ্য হতে না পারা অবশ্য লজ্জার কথা, কিন্তু অপরের বহুকষ্টার্জিত বিদ্যাকে কেউ যদি পণ্ড করে দেয় তো সে লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই।"

বেঞ্চ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাণীকণ্ঠ প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

দিবাকর বলিল, "আমার মাথার ঠিক নেই তর্কতীর্থ মশায়। অন্যায় কথা যা বলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

বাণীকণ্ঠ স্বভাবত শান্তপ্রকৃতির ক্ষমাপরায়ণ মানুষ, সহজে ক্রুদ্ধ অথবা কঠিন হন না। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ কথার অন্তে যে তীক্ষ্ণ হুল তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা দিবাকরের প্রতি ক্রোধবশত ততটা নহে যতটা যূথিকার প্রতি সমবেদনাবশত। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার অন্যায় কথায় মোটের উপর আমি খুশিই হয়েছি দিবাকর। ক্রোধটা তোমার উপরকার ফেনা, যার তলায় প্রকৃত অনুশোচনা দেখা দিয়েছে, আমার এই অনুমান যেন সত্য হয়।" বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

বিয়াল্লিশ

বাণীকণ্ঠর অনুমানে বিন্দুমাত্র ভুল ছিল না। একটা উগ্র পরিতাপের গ্লানি এবং লজ্জায় দিবাকরের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় মথিত হইতেছিল। কয়েক মিনিট পূর্বেও সে যখন যূথিকার ইংরেজী বিদ্যার উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়াছে, তখনও সে জানে না যে, সেই ইংরেজীবিদ্যা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত করিয়া কী গভীর মর্মপীড়া লইয়া যূথিকা চলিয়া গিয়াছে। নয় দিন পূর্বে যূথিকা ইংরেজী বর্জন করিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে একদিনও সে কথা সে তাহাকে জানায় নাই।

মিথ্যা অভিমান এবং অহঙ্কারের ছদ্মবেশধারী নীচ ঈর্ষার তাড়নায় যে ইংরেজী বিদ্যার অভিযোগে কত বেদনা কত গঞ্জনা সে যূথিকাকে দিয়াছে, সে বহু কষ্টে বহু সাধনায় অর্জিত বিদ্যা যূথিকা অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিল। কত মহৎ যূথিকা,—আর তাহার তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য সে।

সুন্দরী শিক্ষিতা যূথিকা,—যাহার রূপে-লাবণ্যে, কথায় বার্তায়, হাস্য-পরিহাসে এই বৃহৎ পুরী ঝলমল্ করিত,—তাহাকে হারাইয়া আজ তাহা অন্ধকার। এই অমূল্য সম্পদ সৌভাগ্য তাহাকে দিয়াছিল। হাতে যখন পাইয়াছিল, তখন তাহার মূল্য বুঝে নাই, বুঝিল আজ তাহা হারাইয়া। এখন তো দূরে চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া পাইবে কি-না কে জানে।

একটা উগ্র বিরহ-বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া দিবাকর ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর অন্তরের উষ্ণ বাষ্পরাশি প্রগাঢ় অশ্রু ধারায় দুই চক্ষু বাহিয়া নামিয়া আসিল।

সেদিন দিবাকর চা খাইল না, আহার করিল না, সমস্ত রাত্রি কাটাইল স্বপ্নে এবং অনিদ্রায়। প্রত্যুষে যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন ক্ষুব্ধ অন্তরে ঝটিকা স্তব্ধ হইয়াছে, বেদনা হইয়াছে মধুর।

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুইয়া শুধু এক পেয়ালা চা পান করিয়া কাগজ কলম লইয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল—

প্রাণাধিকা যূথিকা,

ফিরে এস, ফিরে এস তুমি। ফিরে আসতে বিলম্ব করে তোমার হতভাগ্য অনুতপ্ত স্বামীর দুঃখ আর বেশি বড়িয়ো না।

তর্কতীর্থ মহাশয়ের মুখে তোমার ইংরিজী বর্জনের কথা শুনে পর্যন্ত আমি মনের সকল ধৈর্য হারিয়েছি। এ তুমি কেন করলে যূথিকা? নিজেকে এমনভাবে পঙ্গু করে এত বড় শাস্তি কেন আমাকে দিলে? অপরাধ হয়তো কিছু করেছিলাম কিন্তু তাই বলে সে কি এত বড়ই অপরাধ? এ রকম অঙ্গহীন অবস্থায় আমার কাছ থেকে দূরে থেকে আমার শাস্তি আর বাড়িয়ো না। তোমার পাশে থেকে আমার অপরাধ খানিকটা কমাবার সুযোগ দিয়ো। আমার অগোচরে আমাকে না জানিয়ে এ কাজ করে তুমি কিন্তু ভারী অন্যায় করেছ। তোমার এ প্রতিজ্ঞা যদি প্রত্যাহার করে না নাও, তা হলে এর জন্যে কোনদিন তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।

সেদিন তুমি বলেছিলে, আমাকে তুমি বিয়ে করেছিলে টাকার লোভে, ভালো-বেসে নয়। আমি শপথ করে বলতে পারি, এত বড় মিথ্যা কথা জীবনে কোনদিন তুমি বল নি। আজ পর্যন্ত তুমি সব সুদ্ধ দুবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছ। প্রথম বারে আমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগ্রহে সত্য কথা বল নি; আর এবার দ্বিতীয় বারে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে মিথ্যা কথা বলেছ। বল, ঠিক কথা কি না?

শোন যূথিকা। শিবানী সম্বন্ধে আমার মন একেবারে ষোল আনা নির্মল। এ কথা আমি অকপটে বললাম, তুমি যদি তেমনি অসঙ্কোচে বিশ্বাস কর, তা হলেই মঙ্গল, নচেৎ এর প্রমাণ আমি কী করে দিতে পারি বল? আমার মনের কথা তোমার মনে যদি সহজে স্থান না পায়, তা হলেই বিপদ। নিশাকর অবশ্য এর প্রমাণ দিতে পারে, কিন্তু একটা মূর্খ কালো মেয়েকে কী করে আমি তাকে বিয়ে করতে বলি? তবে একান্তই যদি সে বিয়ে করতে রাজী হয়, তা হলে এ কথা নিশ্চয় বিশ্বাস করো যে, শিবানী সম্বন্ধে আমার মন একেবারে খাঁটি না হলে কখনই আমি তাকে আমার ভ্রাতৃবধূরূপে এ বাড়িতে আসতে দিতাম না।

শিবানীকে ইংরিজী পড়ানোর কথা কেন তোমাকে বলি নি সে কথা যদি জিজ্ঞাসা কর তা হলে বলতেই হয় যে অনেক ভেবে চিন্তেও এর সদুত্তর এখনও ঠিক করতে পারি নি। যদি বলি, দু মাস আড়াই মাসের মধ্যে একদিনও তোমাকে সেটা বলতে খেয়াল হয় নি, তা হলে নিশ্চয়ই সত্য কথা বলা হবে না। যদি বলি, কোন মলিন ব্যাপার অগোচরে রাখবার জন্যেও কথা গোপন করেছি

তা হলেও মিথ্যে কথা বলা হবে। আমাদের অনেক কার্যের অনেক কারণ গোপন মনে গুপ্ত থাকে বলে কোনও কোনও সময়ে কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন হয়। হয়তো সে কারণ নিজ অহঙ্কার অথবা অভিমান-প্রসূত কোনও সঙ্কোচ। হয়তো তা নিজে মূর্খ হয়ে একটি ততোধিক মূর্খ মেয়েকে শিক্ষাদান করার বাহাদুরি লুকোবার দুর্বলতা। কিন্তু যাই হোক না কেন, সে কারণটা নিশ্চয় এমন কিছু নয়, যা তোমার পক্ষে আপত্তিকর অথবা বিরক্তিকর হতে পারে।

যে কথা এখনও লিখি নি, তার কাছে যে সব কথা উপরে লিখেছি তা কিন্তু একেবারে তুচ্ছ। সে কথা হচ্ছে তোমার প্রতি আমার সদ্য-জাগ্রত প্রেমের কথা। আশ্চর্য। কেমন করে এত বড় প্রেম মিথ্যা অভিমান আর অহঙ্কারের মোহে কিছুদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এর বিস্তার আর গভীরতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কোন্ বাধা অপসৃত হয়ে কোন্ আবরণ সরে গিয়ে এ দেখা দিলে তা জানি নে, কিন্তু এর প্লাবনে আমার সমস্ত হৃদয়-মন ভরে গেছে। তুচ্ছ এর কাছে কৈফিয়ৎ দেখানো, তুচ্ছ এর কাছে যুক্তি তর্কের অবতারণা, তুচ্ছ এর কাছে বিলাত যাওয়া, আর তুচ্ছ এর কাছে বিলাত না যাওয়া।

ফিরে এস যূথিকা। তুমি আমার বহু আদরের বহু সম্মানের কমল-হীরে। ফিরে এসে আমার গৃহ আলোকিত কর, আমার মন আলোকিত কর, নিরানন্দ থেকে আমাকে আনন্দের মধ্যে ফিরিয়ে নাও।

তোমার দৃঢ়তাকে আমি ভয় করি। নিষ্ঠুর হয়ো না, এই তোমার প্রতি আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

তোমার অনুতপ্ত স্বামী
দিবাকর

চিঠিখানা খামে মুড়িয়া যূথিকার নাম ঠিকানা লিখিয়া গালা দিয়া সীল করিয়া দিবাকর সেই দিনই একজন ভৃত্যের মারফৎ কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল।

বৈকালে মধুসূদন ঘোষালের নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিল, যূথিকার সহিত সে নিরাপদে নিশাকরের নিকট পৌঁছিয়াছে।

তেতাল্লিশ

পরদিন বেলা দশটা আন্দাজ দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া দিবাকর নিশাকরকে একখানা চিঠি লিখিতেছিল, এমন সময়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া অকস্মাৎ নিশাকর প্রবেশ করিল।

অপ্রত্যাশিতভাবে নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত এবং কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া দিবাকর বলিল, "কী রে নিশা। তুই যে হঠাৎ এলি? তোর বউদিদির খবর কী?"

কাছে আসিয়া হড় হড় করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া রুষ্টকণ্ঠে নিশাকর বলিল, "বউদিদির খবরে কী দরকার তোমার? বউদিদি আছে,—বেশ ভালোই আছে।"

শুনিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পূর্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "তবে তুই হঠাৎ এলি যে?"

তেমনি রুষ্টকণ্ঠে নিশাকর বলিল, "তোমাকে নোটিস দিতে এলাম।"

"নোটিস দিতে এলি?" দিবাকরের মুখে অল্প একটু হাসি দেখা দিল। বলিল, "তা বেশ করেছিস, নোটিশ দিতে এসেছিস। কিন্তু প্রণাম করলি নে যে আমাকে?"

মাথা নাড়া দিয়া নিশাকর বলিল, "প্রবৃত্তি হয় না।"

"ও, প্রবৃত্তি হয় না।" পুনরায় দিবাকরের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিল "তা না হোক, কিন্তু কিসের নোটিস দিতে এসেছিস শুনি?"

নিশাকর বলিল, "পার্টিশনের। টাকা-কড়ি, জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তি সব তুমি দু-ভাগ করে আলাদা করে দাও, তা যদি না দাও তা হ'লে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমাকে অ্যাটর্নির নোটিস দেওয়াব।"

বিস্মিত স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "বলিস কীরে নিশা! তুই আমাকে অ্যাটর্নির নোটিস দেওয়াবি? তোর বউদিদি তোকে না লক্ষ্মণ দেওর বলে? তা' হলে আমারও তো তুই লক্ষ্মণ ভাই। কই, ত্রেতাযুগের লক্ষ্মণ তার দাদার উপর অ্যাটর্নির নোটিস দিয়েছিল, এমন কথা তো এ পর্যন্ত শোনা যায় নি।"

"ত্রেতাযুগের রাম শিবানীকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল এমন কথাও শোনা যায় নি। শোন দাদা, শিবানীর সঙ্গে তোমার বিয়ে পণ্ড করে তবে আমি মনসাগাছা থেকে নড়ব।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া কষ্টে হাস্য দমন করিয়া দিবাকর বলিল, "কিন্তু ক'টা শিবানী তুই পণ্ড করবি নিশা? বাংলা দেশে দিবাকরের জন্যে শিবানীর অভাব আছে কিছু? কিন্তু সে যাক, এটাই বা কেমন করে পণ্ড করবি শুনি?"

"যেমন করে পারি। যদি দরকার হয় তার জন্যে দশ হাজার টাকা খরচ করব।"

"দশ হাজারের মধ্যে পাঁচ হাজার আমার কাছ থেকে নিস। কিন্তু ওকে

কাজ হবে না নিশা। কাজ যাতে হতে পারে সে কথা আমি তোর বউদিদিকে লিখেছি, কিন্তু—"

দিবাকরের কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া নিশাকর বলিল, "বউদিদিকে তুমি চিঠি লিখেছ?"

"লিখেছি।"

"কবে?"

"কাল। আজ সে চিঠি পেয়েছে। আমার মন বলছে, চিঠি পেয়ে সে আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে।"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া নিশাকর বলিল, "অত সোজা মনে করো না, ভারি শক্ত মেয়ে সে।"

নিশাকরের মন্তব্য শুনিয়া ঈষৎ চিন্তিত হইয়া দিবাকর বলিল, "কেন রে? তোর এখানে আসার কথায় বেশি কিছু আপত্তি করেছিল নাকি?"

"ক্ষেপেছ তুমি? আসা-না-আসা সে ভারি গ্রাহ্যই করে কি না, তা আবার আপত্তি করবে! আপত্তির একটা কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে নি। যদি করত, তা হলে হয়তো কতকটা সহজ মন নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু ক্ষমার আশা কী করে তুমি করছ, দাদা? শিবানীকে বিয়ে করবে তুমি, তার মধ্যে আবার ক্ষমা কোথায়?"

দিবাকর বলিল, "ওরে, না রে নিশা, না। শিবানীকে আমি বিয়ে করব না। শিবানী আমাদের সহোদরা বোন হলে তার প্রতি আমার মনের যা ভাব হতো, এ শিবানীর প্রতিও আমার ঠিক সেই ভাবই আছে। তবে কতকটা অমনোযোগ আর ভুল আচরণের ঘটনাচক্রে তোর বউদিদির মনে যে ধারণা হয়েছে, আমার মুখের কথায় শুধু বিশ্বাসের ওপর সে ধারণা যদি তার না যায়, তা হলেই বিপদ। মনের ভেতরকার এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কী দিতে পারি বল্ তো? সত্যি-সত্যিই মন তো আর চিরে-চুরে উল্টে-পাল্টে বার করে দেখাবার জিনিস নয়। তবে একটা প্রমাণ অবশ্য আছে, যার কথা আমি তাকে লিখেছি। কিন্তু এ কথাও লিখেছি যে, সে প্রমাণের সুযোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

অধীর স্বরে নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কী সে প্রমাণ?"

এক মুহূর্ত মনে মনে একটু ইতস্তত করিয়া দিবাকর বলিল, "শিবানীকে যদি আমাদের এ-বাড়ির বউ করে নিয়ে আসতে পারতাম, তা হলে তোর বউদিদি বিশ্বাস করতে বাধ্য হতো যে, শিবানীর সম্বন্ধে আমার মন একেবারে নির্মল। তা যদি না হতো তা হলে আর যাই করি না কেন, আমাদের বাড়ি তাকে কখনই নিয়ে আসতাম না—এ কথা সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করত।"

তেমনি অধীরভাবে নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কার বউ করে নিয়ে আসতে? আমার?"

নিশাকরের প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ চিন্তিত মুখে দিবাকর বলিল, "তা নয় তো আর কার, নিশা ?"

"ওরা আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হবে ?"

"কিন্তু শিবানী কালো মেয়ে—কেমন করে তোকে আমি—"

দিবাকরকে কথা শেষ করতে না দিয়া ঝঙ্কারের সহিত নিশাকর বলিল, "চুলোয় যাক তোমার কালো মেয়ে। ওরা বিয়ে দিতে রাজী হবে কি না সেই কথা বল না ?"

দিবাকর বলিল, "তাছাড়া, ইংরিজী লেখাপড়া সে কিছুই জানে না মোটে ফার্স্ট বুক পড়েছে।"

অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া নিশাকর বলিল, কী বিপদ দেখ দেখি, আসল কথা কিছুতে বলবে না, যত সব বাজে কথা—ওরা রাজী হবে কি-না, সেই কথাটা বললেই তো চুকে যায়।"

"রাজী হবে কি না কীরে ? তোকে পেলে বেঁচে যাবে।"

"তা হলে চল, এখনি ঠিক করে আসি।"

দিবাকর বলিল, 'শিবানী কালো মেয়ে। কিন্তু এ কথা তোকে বলতে পারি, একমাত্র তোর বউদিদি ছাড়া অত সুন্দরী মেয়ে এ তল্লাটে আর দ্বিতীয় নেই। শিবানী যদি আমাদের বাড়ি আসে তা হলে নিশ্চয় তোর বউদিদিতে আর শিবানীতে, কমল-হীরেতে আর নীলকান্তমণিতে আমাদের এ বাড়ি ঝলমল করতে থাকবে।"

নিশাকর বলিল, "ওসব কাব্য-কথা পরে করলেও চলবে, উপস্থিত চল তাড়াতাড়ি ঠিক করে আসি।" বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দিবাকর বলিল, "ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? সমস্ত রাত গাড়িতে এসেছিস। মুখ হাত-পা ধো, চা-টা খা, তারপর না-হয় যাওয়া যাবে।"

মাথা বাড়িয়া নিশাকর বলিল, "ক্ষেপেছ তুমি! এ কথা স্থির না করে তোমার বাড়িতে জলস্পর্শ করব আমি! নাও, ওঠ, দেরি করো না।" বলিয়া দিবাকরের হাত ধরিয়া টান দিল।

"তুই রাজী আছিস তো নিশা ?"

"আছি, আছি।"

"মন খুলে ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ' মন খুলে।"

অগত্যা দিবাকরকে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেই হইল।

নত হইয়া দিবাকরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর বলিল, "চল।"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "কী রে, অবশেষে প্রবৃত্তি হলো ?"

'হল হল। এখন তাড়াতাড়ি চল।' বলিয়া নিশাকর সিঁড়ির দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

দুই ভাইয়ে মিলিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহ হইতে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

চুয়াল্লিশ

সেই দিনই রাত্রের গাড়িতে দিবাকর, নিশাকর, ক্ষীরোদবাসিনী এবং শিবানী—চারজনেই মনের মধ্যে আশা এবং আনন্দের উদ্দীপনা বহন করিয়া কলিকাতা রওনা হইল।

সমাপ্ত

রাতজাগা

পরিচয়

অর্থনীতি এবং অঙ্কশাস্ত্রের একটা কঠিন পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে শক্তিনাথ কলিকাতার কাস্টম হাউসে একটা মোটা মাহিনার চাকরি লাভ করবার পর মাতা সৌদামিনী জিদ ধ'রে বসলেন যে, এর পরও বিবাহের প্রস্তাবে পুত্র অসম্মতি প্রকাশ করলে সত্যসত্যই তিনি রাগ করবেন।

একটু ইতস্তত ক'রে শক্তিনাথ স্মিতমুখে বললে, "বেশ তো মা, তোমার আশীর্বাদে যখন মোটা ভাত-কাপড়ের একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি, তখন তোমার অবাধ্য না হ'লে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। তোমার আদেশ পালন করব।"

ভাত-কাপড়ের যুক্তিটা একদিক থেকে বস্তুত কোনও সময়েই তেমন সারবান ছিল না, কারণ শক্তিনাথের পিতা যে-অর্থ এবং সম্পত্তি রেখে পরলোক গমন করেছিলেন তাতে শক্তিনাথের উপার্জনের অর্থ যোগ না হ'লেও শুধু মোটা ভাত-কাপড়ই বা কেন, মিহি ভাত-কাপড়ের সমস্যাও অবলীলাক্রমে সমাধান হ'তে পারত। কিন্তু সৌদামিনী সে কথা তুললে শক্তিনাথ উত্তর দিত, "সে কথা তো ঠিকই মা। কিন্তু ও টাকা তো আমার নয়, ও টাকা তোমার। বাবা সমস্ত সম্পত্তির ষোল আনাই তোমাকে উইল ক'রে দিয়ে গেছেন শুধু সেই জন্যেই নয়, উইল না ক'রে গেলেও বাবার টাকাতে ষোল-আনা অধিকার তোমারই থাকত, এই আমি বুঝি। বাবা মারা গেলে টাকা হবে আমার, আর তুমি আমার কাছে থেকে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন পাবে—আদালতের এ আইন আমার আইন নয়।"

এ কথার উত্তরে সৌদামিনী হয়তো বলতেন, "তা বেশ তো শক্তি, আমি দানপত্র ক'রে সমস্ত বিষয় তোকে লিখে দিচ্ছি, তুই নে। তা হ'লে তো তোর আর কোনও আপত্তি থাকবে না।"

উত্তরে শক্তিনাথ হাসিমুখে বলত, "তা হ'লে আপত্তি আমার চার গুণ বেড়ে যাবে মা। সুপুত্তুর না হই, কিন্তু বাবার আমি এমন কুপুত্তুর নই যে, যে-বিষয় তিনি উইল ক'রে তোমাকে দিয়ে গেছেন, ছলে-ছুতোয় দানপত্র লিখিয়ে নিয়ে তা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব। যে স্নেহের দান তোমার কাছ থেকে পাচ্ছি তার কাছে বিষয় তো তুচ্ছ। তা ছাড়া, তুমি জান তো মা, সাধু ব্যক্তিরা বিষয়কে বিষ ব'লে নিন্দে ক'রে গেছেন।" ব'লে শক্তিনাথ উচ্চহাস্য ক'রে উঠত।

মাতা বলতেন, "এ তোর অভিমানের কথা শক্তি!"

শক্তি বলত, "কখনই নয় মা। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারই ক'রে নিই যে, বাবার উপর আমার হয়তো কিছু অভিমান আছে, কিন্তু তোমার উপর যে এক বিন্দুও নেই তা একেবারে সত্যি। তা যদি থাকত তা হ'লে দিনের পর দিন এমন নিশ্চিন্ত মনে একজন আইবুড় মেয়ের মতো তোমার কাছ থেকে খোরপোশ

আদায় করতে পারতাম না। যতদিন না নিজে উপার্জন করতে পারছি ততদিন তোমার পয়সা খেতে আমার কোনও অপমান নেই মা, কিন্তু তাই ব'লে একটা দানপত্র করিয়ে নিয়ে তোমার পয়সা নিজের ইচ্ছামতো ভোগ ক'রে আত্মসম্মান চরিতার্থ করব, এমন হীন মাতৃগর্ভে আমার জন্ম হয় নি।"

পুত্রের এই সকল কথারই ভিতরে ভিতরে সৌদামিনী অভিমানের ভাষ্য পাঠ করতেন। শক্তিনাথকে তিনি চিনতেন এবং সেজন্য জানতেন যে, তাঁর উপর অভিমানের কোন কারণ না থাকলেও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর তার নিস্পৃহা চিরদিন বর্তমান থাকবে, এবং সেজন্য তাঁর নিজের হাত থেকেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক কপর্দকও কোনো দিনই সে গ্রহণ করবে না। এ কথা তিনি সেই দিনই বুঝেছিলেন যেদিন তাঁর স্বামী শক্তিনাথকে ডেকে বলেছিলেন—'শক্তি, আমার যা কিছু সম্পত্তি সমস্তই তোমার মার নামে উইল ক'রে দিয়ে গেলাম',—এবং উত্তরে শক্তিনাথ বলেছিল, 'এ বিষয়ে আমার একমাত্র প্রার্থনা বাবা, তোমার উইলে আমাকেও সাক্ষী ক'রে সই করিয়ে নাও। তোমার উইলে আমার আন্‌উইলিংনেস্ নেই—ওর মধ্যে এই প্রমাণটুকু আমার হাতের অক্ষরে লেখা থাকলে আমার মনে আর কোনও ক্ষোভই থাকবে না।'

কী কারণে শক্তির মতো অমন মেধাবী পুত্রকে বঞ্চিত ক'রে স্ত্রীর নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, কৌতূহলোদ্দীপক হ'লেও এ আখ্যায়িকার পক্ষে অবান্তর ব'লে সে কথার এইখানেই শেষ।

পুত্রের মুখে বিবাহে সম্মতির কথা শুনে সৌদামিনী আনন্দিত হ'য়ে বললেন, "তবে আমি শিবানীর সঙ্গে তোর বিয়ের পাকা কথা ক'য়ে ফেলি শক্তি। এই মাঘ মাসেই।"

শক্তিনাথ সবিস্ময়ে বললে, "শিবানী আবার কে মা ?"

সৌদামিনী বললেন, "ওমা, শিবানীকে একেবারে ভুলে গেলি ? ভবনাথ মুখুজ্জের মেয়ে—শিবানী। গেল বোশেখ মাসে শিলং যাবার পথে আমাদের বাড়িতে ঘণ্টা কয়েকের জন্যে কাটিয়ে গিয়েছিল। নন্দীহাটের ভবনাথ মুখুজ্জে, —বর্ধমানের উকিল।"

শক্তিনাথের মনে পড়ল। বললে, "মনে পড়েছে মা। অনেক দিনের কথা কি না, ভুলে গিয়েছিলাম।"

"অনেক দিনের কথা কী রে ? এই তো মাস কয়েকের কথা। কেন, শিবানীকে তো তোর ভালো লেগেছিল শক্তি ?"

ভালোকে ভালো লাগবে না কেন মা ? ভালোই লেগেছিল। কিন্তু তুমি সেখানে কোন রকম কথা দাও নি তো ?"

প্রশ্নের ভঙ্গির মধ্যে শিবানী সম্বন্ধে যে অকথিত আপত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল তা উপলব্ধি ক'রে সৌদামিনীর মুখের প্রসন্ন ভাব অন্তর্হিত হলো ; বললেন, "তোর মত না পেলে কথা দোব কোন্ সাহসে শক্তি ? কিন্তু তারা তাদের কথা দিয়ে ব'সে আছে তোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপেক্ষায় ।"

সৌদামিনীর কথা শুনে শক্তিনাথের মুখে বিহ্বলতার লক্ষণ দেখা দিলে ; কিন্তু পরক্ষণেই নিঃশব্দ সলজ্জ হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল ; বললে, "মা, আমি একটা অপরাধ করেছি, তোমাকে কিন্তু ক্ষমা করতে হবে ।"

সকৌতূহলে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই আবার কী অপরাধ করলি শক্তি ?" তারপর নির্বাক্ শক্তিনাথের লজ্জা-বিমূঢ় মুখ লক্ষ্য ক'রে সহসা বললেন, "ও ! তুই বুঝি কোথাও কথা দিয়েছিস তা হ'লে ?"

শক্তিনাথ বললে, "আমি কেন কথা দোব মা ? কথা তুমিই দেবে । তবে তোমার প্রতি আমার একান্ত প্রার্থনা ওইখানেই কথা দিয়ো ।"

এ কথা-দেওয়ার মূল্য যে কী, তা অনুভব করবার মতো চেতনার অভাব সৌদামিনীর ছিল না । মুখের ভাবের মধ্যে একটু কাঠিন্য দেখা দিল ; কুশাগ্র-সূক্ষ্ম একটা অভিমান, কোথায় কেমন ক'রে তার উৎপত্তি তা ঠিক বোঝা যায় না, মনের এক কোণে একটু বিঁধতে লাগল । বললেন, "ওখান কোন্খান তা তো আমি জানি নে শক্তি ।"

শক্তিনাথ বললে, "বরিশালের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ বিনোদ চাটুজ্জের মেয়ে ।"

"তোর সঙ্গে জানাশুনো হলো কোথায় ? কলকাতায় ?"

"হ্যাঁ ।"

"এখানে কী করে ? পড়ে ?"

"না, পড়ায় ।"

"পড়ায় ? কোথায় পড়ায় ? স্কুলে ?"

"কলেজে ।"

"কলেজে ? কী পাস করেছে ?"

"ইংরিজীতে এম্. এ. ।"

"বয়েস কত রে ? তোর চেয়ে ছোট তো ?"

মৃদু হেসে শক্তিনাথ বললে, "হ্যাঁ মা, ছোট । তবে খুব বেশি নয়, বছর দেড়েকের ছোট ।"

"মাইনে পায় কত ?"

"দু শো টাকা ।"

সৌদামিনী বললেন, "তা মন্দ কী ? তবে বিয়ের জন্যে তোর চাকরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবার কী দরকার ছিল শক্তি ? দুশো টাকাতে তোদের দুজনের এক রকম চ'লে যেতে পারত ।"

সৌদামিনীর কথা শুনে শক্তিনাথের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল ; বললে, "এমন

কথা তুমি রাগ ক'রেও আমাকে বলো না মা। তোমার অর্থে মানুষ হচ্ছি হ'লে তুমি কি আমাকে এমনি অমানুষ ভাবো যে স্ত্রীর অর্থেও আমি মানুষ হ'তে পারি?"

সৌদামিনী বললেন, "এ শাস্ত্র তুই কোথায় পেলি রে শক্তি যে, স্ত্রীর অর্থে মানুষ হ'লে অমানুষ হ'তে হয়? এত অপরাধ বেচারা স্ত্রী কখন করলে?"

শক্তিনাথ বললে, "তা জানি নে মা, কিন্তু তুমি রাজি আছ কি-না বল।"

মৃদু হেসে সৌদামিনী বললেন, "হিন্দীতে একটা কথা আছে যে, দুলহা দুলহিন রাজি তো কেয়া করেগা কাজী? তোরা দুজনে যখন রাজী তো আমি নারাজ কেন হব?"

ব্যগ্রকণ্ঠে শক্তিনাথ বললে, "মন খুলে বলতে হবে মা, তুমি রাজি কি-না। অভিমানের সুরে বললে চলবে না।"

পুত্রের কথায় সৌদামিনী হেসে ফেললেন; বললেন, "শোন কথা! অভিমানের সুর আবার কোথায় পেলি? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি রাজি।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটির নাম কী রে শক্তি?"

শক্তিনাথ বললে, "তমিস্রা। তমিস্রা চ্যাটার্জি।"

সৌদামিনী বললেন, "বেশ নাম। বেশ নতুন ধরনের।" মনে মনে বললেন, তমিস্রা তা বুঝতেই পেরেছি! এখন সংসারটিকে নিজের ছায়া দিয়ে একেবারে না ঢাকলে বাঁচি।

মার্চ মাসেই তমিস্রার সঙ্গে শক্তিনাথের বিবাহ হয়ে গেল। বধূ এলে সৌদামিনী তাকে সাদরে বরণ ক'রে নিলেন। মনের মধ্যে একটু যে উৎকণ্ঠা, এম্. এ পাস করা মাসিক দুই শত টাকা বেতন-গর্বিতা বধূর বিষয়ে একটু যে ত্রাস ছিল, তমিস্রার হাস্যপ্রফুল্ল সুন্দর মুখ দেখে অনেকখানিই তার লাঘব হলো। কাজকর্মের ফাঁকে এক সময় বধূকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ বউমা, বিয়ের জন্যে কলেজ থেকে কত দিনের ছুটি নিয়েছ?"

তমিস্রা বললে, "ছুটি তো নিই নি মা। বিয়েতে আপনার সম্মতি পাবার পর আর কলেজে যাই নি, রেজিগ্‌নেশন দিয়ে দিয়েছি।"

বিস্মিতকণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, "দু শো টাকার চাকরিটা একেবারে ছেড়ে দিলে বউমা?"

তমিস্রা স্মিতমুখে বললে, "চাকরিতে আর দরকার কী মা? এখন তো আপনাদের কাছে পাকা আশ্রয় পেয়েছি। এখন আপনাদের খাব, পরব।"

"কিন্তু বিয়ের আগেও তো তোমার অভাব ছিল না, তোমার বাবা তো মোটা মাইনের চাকরি করেন। তখন কেন চাকরি নিয়েছিলে?"

তেমনি হাসিমুখে তমিস্রা বললে, "বাপের বাড়ির আশ্রয় তো মেয়েদের

চিরকালের আশ্রয় নয় মা। শ্বশুরবাড়ির দুঃখ-কষ্ট গায়ে লাগে না, কিন্তু বাপের বাড়ির অনাদর অবহেলা সহ্য করা শক্ত। তাই চাকরিটা সহজে পেয়েছিলাম ব'লে ছাড়ি নি। কিন্তু পাকা আশ্রয় পাবার পর আর ছাড়তে দেরি করি নি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যায় করেছি কি মা ?"

অন্যায় তো দূরের কথা, চাকরি ছাড়ার কথা শুনে সৌদামিনী মনের একটা দিকে একটু নিঃশ্বাস ছেড়ে হালকা হয়েছিলেন। পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে যে পুত্রবধূও গাড়ি চ'ড়ে অর্থোপার্জন করতে ছুটবেন না, সংসারের এই সহজ মিষ্ট মূর্তি স্মরণ ক'রে তিনি মনে মনে বধূর নিকট একটু কৃতজ্ঞই হলেন। বললেন, "না, না, অন্যায় কেন ? তবে টাকাটাও তো নিতান্ত কম নয়,—হঠাৎ ছেড়ে দিলে,—তাই বলছি।"

তমিস্রা নম্রকণ্ঠে বললে, "তা ছাড়া আরও একটা কথা ভেবেছিলাম মা। আমার তো আর টাকার কোনো অভাব রইল না, কিন্তু এমন বিধবা অথবা অবিবাহিত স্ত্রীলোক আছেন যাঁদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, আমি চাকরি ছাড়লে তাঁদের মধ্যে একজন সেটা পেতে পারেন। পেয়েছেনও তেমনই একজন।"

মনে মনে বধূর কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে প্রসন্নমুখে সৌদামিনী বললেন, "ভালোই করেছ বউমা, আমি এতে খুশিই হয়েছি।"

কিন্তু এ সবই গেল বিবাহকালের কথা। উৎসবের দিনে সকলেই কথাবার্তা চালচলন এমন একটা পর্যায়ে চলে যে, সে সময়ে লোকের স্বরূপ ঠিক ধরা যায় না। উৎসবের বাঁশি যখন থামল, সংসার যখন তার নিত্যকার সহজ কর্মানুবর্তিতায় ফিরে এল, তখন তার মধ্যে সৌদামিনী তমিস্রার যে মূর্তি দেখতে পেলেন তাতে তাঁর মনের স্থৈর্য একটু বিচলিত হ'লো। মনে হ'লো, সংসারের পর্দায় হয়তো তাঁর সুরের সঙ্গে তমিস্রার সুর ঠিকমত ভিড়বে না,—হয়ত উভয়ের মধ্যে এমন একটু প্রভেদ বর্তমান থাকবে যাতে একটা বিবাদী কর্কশ শব্দই উৎপন্ন হবে।

এই রকমই মনে হয়, অথচ এর কম মনে করবার এমন কোনও প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায় না যা সহজে ধরা-ছোঁয়া যায়। সমস্তটাই যেন অনুমানের নীহারিকার মধ্যে অস্পষ্ট, কিন্তু অস্তিত্ব যে তার আছে তা চোখে দেখা না গেলেও মনে অনুভব করা যায়। তমিস্রার মুখে হাস্য, বাক্যে সংযম, আচরণে শ্রদ্ধা ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার যে সব সময়েই একটা স্বাধীন মত স্বাধীন সত্তা আছে তাও এই সবেরই মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তার অভিমত সৌদামিনীর অভিমতকে কখনও অতিক্রম করে না, কিন্তু সব সময়েই পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। কখনও কখনও তার মত সৌদামিনীর মতের মধ্যে নিমজ্জিত হয় ; কিন্তু তখনও তার

মধ্যে তমিস্রার ব্যক্তিত্বের অপরিচয় থাকে না, মনে হয় ইচ্ছা করেই সে নিজের মতকে অগ্রসর হ'তে দিলে না, পরাজিত করলে।

এর ফলে ক্রমশ যেন তমিস্রা সংসারের কর্মক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হ'তে লাগল এবং সৌদামিনী রত্নবেদিকার ধাপে উঠতে লাগলেন। সে রত্নবেদিকায় শ্রদ্ধা আছে, সেবা আছে, হয়তো খানিকটা ভালোবাসাও আছে,—কিন্তু এমন দুঃসহ কর্মহীনতা আছে যা আত্মাকে পীড়ন করে। রত্নবেদীর উপর নিয়মিতভাবে ফুল-বিল্বপত্র পড়ে, ভোগও চড়ে,—কিন্তু তার আয়োজনের স্থল নিচে, যেখানে কর্মের স্রোত প্রবাহিত। তমিস্রা বলে, 'তুমি তো এতদিন সংসারকে চালনা করলে মা, এবার আমাদের হাতের সেবা গ্রহণ কর।' কিন্তু কে চায় অন্তরের সঙ্গে সেই হাতের সেবা, যে-হাত কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে অবসর দিতে চায়। সৌদামিনীর মনে পুনরায় কুশাগ্রসূক্ষ্ম অভিমান দেখা দিল।

সাধারণ অবস্থায় হয়তো ঠিক এতটাই হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রের কথা একটু স্বতন্ত্র। স্বামীর সম্পত্তি উপলক্ষ্য ক'রে, শুধু পুত্রেরই নয়, সৌদামিনীর নিজের মনেও অভিমানের যন্ত্রটি ক্রমশ এমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল যে, সূক্ষ্ম অনুভূতিবিশিষ্ট ভূকম্পমান যন্ত্রের মতো সামান্য নাড়াতেও তার মধ্যে সাড়া প'ড়ে যেত। এমনই কী গুরুতর অপরাধ হয়েছে রে বাপু, যে মার হাত দিয়েও সে সম্পত্তির কণামাত্র গ্রহণ করা চলে না। পুত্র হ'য়ে আইবুড় মেয়ের মতো লালিত-পালিত হওয়া, সেই সম্পত্তির প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরাগ্যকে প্রকট ক'রে তোলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে হ'লো, পুত্রবধূও এসে সমস্ত অবগত হ'য়ে পুত্রের সুরেই সুর মেলাবার উপক্রম করছেন। চিরন্তনী পুত্রবধূর প্রতি চিরন্তনী শাশুড়ির এ অবচেতন ঈর্ষার কথা কি-না তা বলা যায় না, কিন্তু মনে হ'লো মার হাত থেকে লালনপালনটুকুও তিনি তুলে নিতে চান। পুত্রের প্রতি অভিমান, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ঘনীভূত হয়ে এল। মনে হ'লো, প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এখন মানে মানে স'রে পড়াই ভালো। আগেকার কালে এই কারণেই লোকে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যেত। পরে বনবাসের পরিবর্তে কাশীবাসের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। সৌদামিনী কাশী যাওয়াই স্থির করলেন, এবং সে বিষয়ে দ্বিধা এবং বিলম্ব করবেন না মনে মনে তাও স্থির ক'রে ফেললেন।

কথাটা শুনে শক্তিনাথ প্রথমে পরিহাস ব'লে উড়িয়ে দিলে, তারপর প্রবল ভাবে আপত্তি তুললে, তারপরে রাগারাগি করলে, সর্বশেষে অভিমান ক'রে চুপ হ'য়ে গেল।

তমিস্রা বললে, "মা, তুমি আমার ওপর রাগ ক'রে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ ?"

সৌদামিনী হাসিমুখে বললে, "তোমার ওপর রাগ করব কেন বউমা ? তুমি তো কোনও দোষই করো নি।"

তমিস্রা বললে, "জেনেশুনে কোনও দোষ করি নি ব'লেই তো মনে হয়। তা হ'লে অদৃষ্টেরই দোষ বলতে হবে। কিন্তু এতে আমার ভারি একটা দুর্নাম র'টে যাবে মা। সকলে বলবে, এমন বউ এল যে ছ মাসও শাশুড়ী টি'কতে পারলে না।"

সৌদামিনী বললেন, "যারা তোমাকে দেখেছে তারা কেউ সে কথা বলবে না বউমা। যারা দেখে নি তারা জানে সংসারের রীতি চিরদিনই এই হ'য়ে আসছে,—একজন আসে, আর আর-একজন চ'লে যায়। আজ বাড়ি ছেড়ে কাশী যাচ্ছি, আবার একদিন কাশী ছেড়েও আরও দূরে চ'লে যেতে হবে। সেদিন তো কোনোমতে ঠেকাতে পারবে না বউমা।"

শক্তিনাথ বললে, "একটা কাজ করা যাক মা, বাড়িটার মাঝখানে একটা পাঁচিল গাঁথিয়ে দেওয়া যাক। তুমি থাকো দক্ষিণ দিকের অংশে, আমরা থাকি উত্তর দিকে। টাকাকড়ি লোকজন সবই তো তোমার আছে, কোনও অসুবিধে হবে না।"

সৌদামিনী মনে মনে বললেন, চোখে দেখা যায় না ব'লে কি সে পাঁচিল পড়তে বাকি আছে! মুখে বললেন, "তুই রাগ করিস নে শক্তি, একদিন আমার মুখে তোকেই তো আগুন দিতে হবে বাবা। তাই যখন সহ্য করতে হবে তখন সামান্য কাশী যাওয়ার কথা শুনে এত অধীর হচ্ছিস কেন? চিরকালই কি ইহ নিয়ে থাকব? পরকালের পথটা কি একবারও খুঁজে দেখতে হবে না?"

শক্তিনাথ বললে, "কাশীতে গলি-ঘুঁজি এত বেশি যে, তার মধ্যে পরকালের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে ব'লে মনে হয় না।"

সৌদামিনী স্মিতমুখে বললেন, "বিশ্বেশ্বর দয়া করলে শক্তও হবে না শক্তি।"

শক্তিনাথ বললে, "কাশীধাম না হয় বিশ্বেশ্বরের রাজধানী হ'লো, তাই ব'লে কি কলকাতা পর্যন্তও তাঁর দয়া পৌঁছবে না? ভারতেশ্বর থাকেন সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে ইংল্যাণ্ডে, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর প্রভাব তো এখানে কিছু কম দেখি নে।"

শক্তিনাথের কথা শুনে সৌদামিনীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল; বললেন, "ভাগ্যে এই উদাহরণটা দিলি, তাই তোকে বোঝানো সহজ হবে। এখানে প্রভাব যদি সমানই হবে তা হ'লে তোর বাপ খলসেকুটি তালুকের মামলা এখানে হাইকোর্টে হেরে বিলেতে আপীল করলেন কেন, আর সেখানে আপীল জিতলেনই বা কেমন ক'রে? ও-কথা তোর ঠিক নয় শক্তি, মফস্বলের চেয়ে শহরের প্রভাব একটু বেশি আছেই বইকি—স্থান-মাহাত্ম্য মানতেই হবে। কিন্তু এ-সব বাজে কথা যাক্, তুই আমাকে কাশীবাস করবার ব্যবস্থা ক'রে দে বাবা, আমার পরকালের মঙ্গলে বাধা দিস নে। কাশী তো এখন আর আগেকার মতো চার মাসের পথ নয়—এক রাত্রির মামলা—মাঝে মাঝে গিয়ে আমাকে দেখে-শুনে আসিস।"

এইরূপ তর্ক-বিতর্কে আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শক্তিনাথ যখন দেখলে যে, সৌদামিনী কাশী যাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কিছুতেই সে সঙ্কল্প থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা যাবে না, তখন অগত্যা মাতার কাশীধাম যাতে সাধ্যমতো অসুবিধাজনক না হয় সে-বিষয়ে উদ্যোগী হ'লো। সাবেক আমলের সরকার বেণী ঘোষকে কাশী গিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন হাওয়াদার বাড়ি ভাড়া করবার জন্য আদেশ দিলে। বাড়ি ভাড়া হ'য়ে গেলে চুনকাম করিয়ে দরজা-জানলায় রঙ দিইয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার ক'রে সংবাদ দিলে সে সৌদামিনীকে কাশী পৌঁছে দিয়ে আসবে স্থির করলে। এ কথাও ব'লে দিলে যে, গৃহস্থালীর যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেন ক্রয় করা থাকে, যাতে পৌঁছে সৌদামিনীকে কোনওদিক দিয়ে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে না হয়।

অদূরেই সৌদামিনী দাঁড়িয়ে ছিলেন, পুত্রের কথা শুনে নিকটে এসে বললেন, "কতকগুলো অদরকারী জিনিসপত্র কিনে অনর্থক আমাকে বিব্রত করবেন না সরকার মশায়, আমি ফর্দ ক'রে দেবো ঠিক সেই মতো কিনবেন। আর দেখুন, খুব হাওয়াদার বাড়ি না হ'লেও আমি দম আটকে মরব না, কিন্তু দু বেলা হেঁটে হেঁটে যাতে মরতে না হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন, মন্দিরের যত কাছাকাছি হয় বাড়ি ভাড়া করবার চেষ্টা করবেন।"

সৌদামিনীর কথা শুনে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে শক্তিনাথ বললে, "তুমি সেখানে দু বেলা হেঁটে হেঁটে মন্দিরে যাবে না-কি মা?"

"না, তা কেন যাব? তুই সেখানে গিয়ে একটা চতুর্দোলা করিয়ে দিস, তাই চ'ড়ে মন্দিরে যাব।" —ব'লে সৌদামিনী হাসতে লাগলেন।

বেণীমাধব বললে, "আপনি নিশ্চিত থাকবেন মা, আমি সব দিকে দৃষ্টি রেখে বাড়ি করব—কোনও অসুবিধা হবে না।"

দু-তিন দিনের মধ্যে টাকাকড়ি নিয়ে বেণী ঘোষ কাশী রওনা হ'লো, এবং দিন দশেক পরে তার কাছ থেকে চিঠি এল যে, সেখানকার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ।

শুভদিন নির্ণয়ের নিষ্ঠার আতিশয্য শক্তিনাথের হঠাৎ এমন বেড়ে গেল যে, দিন পনেরোর পূর্বে ভালো যাত্রিক দিন কিছুতেই পাওয়া গেল না। যাওয়াই যখন হচ্ছে তখন কয়েকটা দিনের জন্য সৌদামিনী আর আপত্তি করলেন না,—মনে মনে নিজেও বোধ হয় একটু খুশিই হলেন।

কাশী যাত্রার তখন তিন দিন বিলম্ব আছে, হঠাৎ প্রাতঃকালে বরিশাল থেকে তমিস্রার একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের ভাই এসে হাজির,—নাম তার সুবিনয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল যে, সুবিনয়ের আকস্মিক আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য —সেই দিন বৈকালের গাড়িতেই তমিস্রাকে বরিশাল নিয়ে যাওয়া। এ কথাও

জানতে বাকি রইল না যে, এ ব্যবস্থা তমিস্রা নিজে বরিশালে চিঠি লিখে করিয়েছে।

তমিস্রাকে দেখতে পেয়ে সৌদামিনী বললেন, "এ কি কাণ্ড বউমা ?"

নিকটে এসে তমিস্রা বললে, "কী মা ?"

"তুমি না-কি আজকের গাড়িতে বরিশাল যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

"তিন দিন পরে আমি কাশী যাব, আর আজ তুমি বাড়ি ছেড়ে চললে বউমা ?"

মুখ একটু গম্ভীর ক'রে তমিস্রা বললে, "সেই জন্যেই তো যাচ্ছি মা।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, এ বাড়িতে আমি রইলাম আর তুমি চ'লে গেলে —এ অবস্থাটা আমি সহ্য করতে পারব না ; তাই তুমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে আমি চ'লে যাচ্ছি।"

"কিন্তু আমি চ'লে যাওয়ার পর আবার তো তুমি এ বাড়িতে আসবে বউমা ?

চক্ষু ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে তমিস্রা বললে, "ওমা, তা আবার আসব না ? নিশ্চয় আসব। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কেউ আমাকে দূরে রাখতে পারবে না মা, তোমার কাশীর বিশ্বনাথও না।"

কাশীর বিশ্বনাথের উপর পুত্র এবং পুত্রবধূর আক্রোশ লক্ষ্য ক'রে সৌদামিনীর মনের এক কোণে কৌতুকের অন্ত ছিল না,—মুখে অতি ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হলো। বললেন, "বোঝা গেল, কাশীর বিশ্বনাথ না হয় খুবই শক্তিহীন লোক, কিন্তু একটা কথা তো ভালো ক'রে তলিয়ে দেখ নি বউমা, —আমি চ'লে যাওয়ার পর যেদিন তুমি ফিরে আসবে, সেদিন হয়তো লোকে বলবে—এমন বউ যে, শাশুড়ী বিদেয় হ'লো, তারপর ঘরে এসে ঢুকল।"

তমিস্রা বললে, "তা হয়ত বলবে, কিন্তু এ কথা তো বলতে পারবে না যে, এমন বউ যে দাঁড়িয়ে থেকে শাশুড়ীকে বিদেয় করলে।"

সৌদামিনীর মুখে পুনরায় হাসি স্ফুরিত হ'লো, বললেন, "তুমি এম্. এ. পাস করা মেয়ে বউমা, তোমার সঙ্গে কি কথায় আমি পারি ?—হার স্বীকার করলাম।"

তমিস্রাকে একান্তে পেয়ে শক্তিনাথ বললে, "এ কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি তমিস্রা।"

তমিস্রা বললে, "এ কথার প্রতিবাদ করছি নে।"

"মা ভারি ক্ষুণ্ণ হবেন কিন্তু।"

"ক্ষুণ্ণ হবার যন্ত্র ভগবান শুধু তাঁর মনেই বসাননি, আমার মনেও বসিয়েছেন।"

স্মিতমুখে শক্তিনাথ বললে, "বাপের বাড়ি যাওয়া সেই কোভের নন্-ভায়োলেণ্ট প্রোটেস্টের একটা ডিমনস্ট্রেশন না কি ?"

তমিস্রা বললে, "তুমি ঠিকই বলেছ, এ আমার সত্যিই প্রোটেস্ট, কিন্তু ভারি ইনডিগ্‌ন্যাণ্ট প্রোটেস্ট।"

তমিস্রাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারা গেল না। সেই দিনেই সে বরিশাল চ'লে গেল। যাবার সময়ে গললগ্নবাস হ'য়ে শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে বললে, "অশিষ্ট মেয়ের অপরাধ নিয়ো না মা।"

পুত্রবধূর মস্তকে হস্তার্পণ ক'রে সহাস্যমুখে সৌদামিনী বললেন, "তুমি যখন নিষেধ করছ তখন না-হয় নোবো না।"

শিয়ালদহ স্টেশনে গাড়ি ছাড়বার পূর্বে শক্তিনাথ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কবে ফিরবে তমিস্রা ?"

তমিস্রা তেমনি মৃদুস্বরে বললে, "তোমার চিঠি পেলেই।"

"সুবিনয়ই নিয়ে আসবে, না, আমাকে যেতে হবে ?"

মৃদুস্মিত মুখে তমিস্রা বললে, "শ্বশুর-বাড়ির আদর-যত্নের জন্যে যদি লোভ হয়, তা হ'লে নিজেই যেয়ো,—নইলে সুবিনয়ই নিয়ে আসবে।"

কাশী যাবার দিন সৌদামিনী সকাল হ'তে সমস্ত দিনই কতকটা গম্ভীর হ'য়ে রইলেন। জলভারগুরু মেঘের মতো মন্থর গতিতে মাঝে মাঝে গৃহের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন,—সব সময়েই যে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে, তা নয়,—অধিকাংশ সময়েই উদাস আত্মবিস্মৃত চিত্তে। চোখের সামনে শক্তিনাথের উদ্যোগে কাশী যাবার জিনিসপত্র—সংখ্যা এবং আকারে অনাবশ্যক-ভাবে বেড়েই চলেছিল ; কিন্তু সেদিন সে বিষয়ে সামান্য মাত্র আপত্তি করবার সামর্থ্য পর্যন্ত যেন সৌদামিনীর ছিল না,—'যা করে করুক' 'যা হয় হোক' এইরূপ একটা নিস্পৃহ নিরাসক্তি মনকে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল।

সন্ধ্যার পর শক্তিনাথ দুটি ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই ক'রে মালপত্র স্টেশনে পাঠিয়ে দিলে। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে সৌদামিনীকে গিয়ে বললে, "মা, এবার আমাদের রওনা হবার সময় হয়েছে—আর দেরি করলে অসুবিধা হবে—„

দাস-দাসী-আত্মীয়-আশ্রিতের অশ্রু-বিলাপের মধ্যে বিদায়ের পালা শেষ করে সৌদামিনী মোটরে গিয়ে বসলেন। গাড়ি ছাড়তে মুখ বাড়িয়ে একবার দ্রুতপলায়মান গৃহের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। মনে হলো, হয়তো এই শেষ। বহু সুখ দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত স্বামীগৃহের সহিত হয়তো এইখানেই চিরদিনের মতো সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লো।

পরদিন বেলা দশটার সময়ে বেনারস ক্যান্টনমেণ্টে গাড়ি পৌঁছলে বেণী

সরকার দ্রুতপদে সৌদামিনীর কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলে।

যুক্তকরে প্রতিনমস্কার ক'রে সৌদামিনী বললেন, "কী সরকার মশায়, আপনার শরীর ভালো আছে তো?"

"আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি মা।"

"ঝি-চাকর ঠিক হয়েছে?"

"হয়েছে মা।"

শক্তিনাথ বললে, "আর রাঁধবার লোক? পদী পিসির সন্ধান পাওয়া গেছে?"

সৌদামিনী বললেন, "তুই আর বেশি জ্বালাস নে শক্তি। চিরকাল স্বপাক খেয়ে এসে কাশীতে এসে পদী পিসি।"

শক্তিনাথ বললে, "কিন্তু এখানে তোমাকে সাহায্য করবে কে মা?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সৌদামিনী প্ল্যাটফর্মে নেবে পড়লেন। দুজন কুলি জিনিসপত্র নামিয়ে দিলে বেণীমাধব বললে, "এই জিনিস তো মা? আর কিছু নেই তো?"

সৌদামিনী বললেন, "তা হ'লে আর দুঃখ ছিল কী? সতেরোটা জিনিস ব্রেকভ্যানে আছে।"

বেণীমাধব একটু চিন্তা ক'রে বললে, "সে-সব মাল ছাড়িয়ে গাড়িতে বোঝাই ক'রে নিয়ে যেতে তো সময় লাগবে মা। তার চেয়ে সঙ্গে যা জিনিসপত্র আছে তাইতে যদি এ বেলাটা কোনওরকমে চ'লে যায় তা হ'লে ও-বেলা আমি এসে মাল ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

সৌদামিনী বললেন, "সঙ্গে যা জিনিসপত্র আছে তাতে আমার মণিকর্ণিকার দিন পর্যন্ত চ'লে যাবে। ব্রেক্‌ভ্যানের সমস্ত জিনিস যদি এইখান থেকেই শক্তির সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যায় তাতেও আমার কিছু অসুবিধে হবে না। কিন্তু সে কথা যাক, গঙ্গাস্নান সেরে মন্দির দর্শন ক'রে এসে দু-মুঠো রেঁধে ফেলতে না পারলে শক্তির ভারি কষ্ট হবে—জিনিস থাক্, আপনি এখন চলুন।"

শক্তিনাথ বললে, "সেই কথাই ভালো, ও-বেলা না-হয় আমিও আপনার সঙ্গে আসব সরকার মশায়। কিন্তু আপনি গিয়ে এখনই পদী পিসির সন্ধান করুন। পদী পিসি নইলে মার—"

শক্তিনাথকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, "আরে, রেখে দে তোর পদী পিসির গল্প।" ব'লে ধাবমান কুলি দুজনের পিছনে দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন।

একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে সকলে অবিলম্বে রওনা হলেন। দশাশ্বমেধের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামলে সৌদামিনী বললেন, "এই বাড়ি না-কি সরকার মশায়?"

বেণী ঘোষ বললে, "হ্যাঁ মা, এই বাড়ি।"

"চমৎকার বাড়ি তো। কিন্তু মিছিমিছি এত বড় বাড়ি করেছেন কেন ?"

"খুব ছোট বাড়ি তো পরিচ্ছন্ন হয় না মা। তা ছাড়া দাদাবাবুরা মাঝে মাঝে প্রায়ই এসে থাকবেন তো, একটু বড় বাড়ি না হ'লে অসুবিধা হবে যে।"

ভিতরে প্রবেশ ক'রে সৌদামিনী বললেন, "খাসা বাড়ি করেছেন সরকার মশায়,—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।"

শক্তিনাথ বললে, "হাওয়াদারও আছে।"

সম্মতিসূচক প্রসন্নকণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, হাওয়াদারও আছে।"

রান্নাঘরের নিকট উপস্থিত হ'য়ে সৌদামিনী একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "ছ্যাক্‌ছোঁক্ ক'রে রান্নার শব্দ হচ্ছে, রাঁধছে কে সরকার মশায় ?"

বেণী ঘোষ মাথায় হাত বুলিয়ে গুঁইগাঁই করতে লাগল। স্পষ্ট করে কিছু বলে না।

বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, "আঃ। সেই পদী ঠাকুরঝিকে যোগাড় ক'রে এনেছেন। না, আমি আর পারি নে আপনাদের সঙ্গে। সে পেটরোগা মানুষ, নিজেকে সামলাতে পারে না—" তারপর হঠাৎ নিমেষের জন্য একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেয়ে বললেন, "না, এ তো পদী ঠাকুরঝি নয়। কে এ তবে ?"

পর-মুহূর্তেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে সেই স্ত্রীলোকটি বললে, "পদী ঠাকুরঝি নয় মা, এ তোমার অবাধ্য মেয়ে তমিস্রা।" বলে সৌদামিনীর পদধূলি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সৌদামিনী বিস্ময়ে ক্ষণকাল হতবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলেন ; বললেন, "এ কি কাণ্ড বউমা ? তুমি এখানে ?"

তমিস্রা বললে, "আমিও কাশীবাস করব স্থির করেছি মা, তুমি করবে বিশ্বনাথের সেবা, আর আমি করব তোমার সেবা। দেখি, কার বেশি পুণ্য হয়।"

"তোমার বেশি পুণ্য হবে বউমা। বিশ্বনাথের বিচারেও তোমার কাছে আমার হার হবে।" ব'লে সৌদামিনী বধূকে সবলে বক্ষের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বেণী ঘোষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "জিনিসপত্র আর স্টেশন থেকে এনে কাজ নেই সরকার মশায়। আজ রাত্রেই চলুন সকলে কলকাতা ফিরে যাই।" তারপর বধূকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে চিবুক চুম্বন ক'রে বললেন, "আমি তোমাকে চিনতে পারি নি বউমা।"

শক্তিনাথ বললে, "আমিও এতটা পারি নি মা।"

বেণী ঘোষ এগিয়ে এসে সোৎসাহে বললে, "পরশু দিন যখন বউমা এসে এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেন, আমি কিন্তু তখনই চিনতে পেরেছিলাম।"

হঠাৎ দেখা গেল—সকলেরই চক্ষে অশ্রু, শুধু তমিস্রার মুখে হাসি।

শক্তিনাথ বললে, "দশ দিন ছুটি যখন নিয়ে এসেছি তখন আজই কলকাতা না ফিরে এ অঞ্চলের কয়েকটা তীর্থ দর্শন ক'রে ফেরা যাক্।"

এ প্রস্তাবে সকলেই খুশি হলো, সকলের চেয়ে বোধ হয় তমিস্রা বেশি।

জীবন্ত-প্রেত

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। তিন চার দিন হলো শীতটা আবার নূতন এক চোট চেপে পড়েছে। গতরাত্রি থেকে হঠাৎ আকাশভরা এক রাশ হাল্কা মেঘ এসে উপস্থিত, তদুপরি তীব্র কন্‌কনে পশ্চিমা হাওয়া। সুতরাং মোটের উপর ব্যাপারটা কীরূপ গুরু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়।

অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন্‌স্ জজ রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় বেলা নটার সময়ে প্রাতর্ভ্রমণ এবং দুই-এক ঘরে মামুলি খোঁজ-খবর সমাপন ক'রে দানাপুরের রেল-পল্লীর একটি পরিচ্ছন্ন বাংলোয় প্রবেশ করলেন। তারপর গৃহ-সম্মুখের প্রশস্ত বারান্দায় উপস্থিত হ'য়ে লাঠি ও গাত্রবস্ত্রটা টেবিলের উপর ফেলে একটা ঈজি-চেয়ারে উপবেশন ক'রে ডাক দিলেন, "দাদু! দাদাভাই!"

আহ্বান পেয়ে গৃহের ভিতর হ'তে সাত-আট বৎসরের একটি গৌরবর্ণ বালক বেরিয়ে এসে বললে, "কী দাদাভাই? চা?"

সহাস্যমুখে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে প্রসন্নকুমার বললেন, "হ্যাঁ ভাই, চা।"

এ প্রশ্ন এবং উত্তর উভয়ই এক হিসাবে নিরর্থক। কারণ, প্রত্যহই এই সময়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে প্রসন্নকুমার বেশ বড় এক পেয়ালা তপ্ত চা পান করেন। পুত্রবধূ সুবর্ণার ব্যবস্থায় প্রাতর্ভ্রমণ যাওয়ার সময় তাঁকে মিষ্টান্নাদির সহিত চায়ের পরিবর্তে হয় এক বাটি ঘন দুধ কিংবা পূর্বরাত্রিতে প্রস্তুত ক্ষীর অথবা পায়েস খেয়ে যেতে হয়। শ্বশুরের শারীরিক পুষ্টিসাধনের দিক দিয়ে চায়ের প্রতি সুবর্ণার কিছুমাত্র আস্থা নেই। তার মতে ও বস্তুটা শুধু শীত ভোগ ক'রে আসার পর একটা দেহ-উত্তেজক জলীয় পদার্থরূপেই ব্যবহার করা চলে!

খবরের কাগজওয়ালার কাছ থেকে দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্রখানা প্রসন্নকুমার পথেই সংগ্রহ ক'রেছিলেন। ঈজি-চেয়ারের হাতলের উপর পা দুটি লম্বা ক'রে মেলে দিয়ে তিনি সংবাদপত্রের মধ্যে মনোনিবেশ করলেন। চীনাদের প্রতি পাশবিক অত্যাচারের জন্য জাপানের বিরুদ্ধে মেজাজটা সবেমাত্র উষ্ণ হ'য়ে উঠছে, এমন সময়ে চায়ের পেয়ালা হস্তে সুবর্ণা প্রবেশ করল।

"বাবা!"

চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রেখে প্রসন্নকুমার সুবর্ণার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা গ্রহণ করলেন, তারপর এক চুমুক চা পান ক'রে সুবর্ণার দিকে চেয়ে বললেন, "বউমা, সন্তোষ কবে আসবে? শনিবারে, না, রবিবারে?"

মৃদুস্বরে সুবর্ণা বললে, "বোধ হয় রবিবারে।"

শুনে প্রসন্নকুমার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, "রবিবারে? তা হ'লে দেখছি, এ সপ্তাহেও আমার কানপুর যাওয়া হ'লো না।"

সুবর্ণা বললে, "আপনাকে বোধ হয় কানপুর যেতে হবে না বাবা।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রসন্নকুমার বললেন, "যেতে হবে না? কেন বল তো? সন্তোষ মিন্টুকে নিয়ে আসবে না কি?"

"বোধ হয়।"

প্রসন্নকুমারের মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল; বললেন, "সে নিয়ে এলে তো বাঁচি। যা ঠাণ্ডা পড়েছে, বাড়ি ছেড়ে এক পা নড়তে ইচ্ছে করে না।"

সন্তোষ সুবর্ণার স্বামী, অর্থাৎ প্রসন্নকুমারের পুত্র। ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলে সে অফিসার গ্রেডে চাকরি করে। সম্প্রতি ট্যুরে বাহির হয়েছে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে সুবর্ণা বললে, "আর একটু চা নিয়ে আসব বাবা?"

প্রসন্নকুমার বললেন, "না, আর দরকার নেই। সুধীরকে দিয়ে গোটা কয়েক লবঙ্গ পাঠিয়ে দিও।"

সুধীর সেই পূর্বোক্ত বালক—সন্তোষের একমাত্র সন্তান।

সুধীর যখন লবঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন ডাকপিয়ন চিঠি নিয়ে এসেছে। তিন-চারখানা চিঠির মধ্যে একখানা ছিল সুবর্ণার। সেই চিঠিখানা সুধীরের হাতে দিয়ে প্রসন্নকুমার বললেন, "এটা তোমার মাকে দাওগে তো ভাই।" তার পর দুরন্ত হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলেন।

চিঠি নিয়ে সুধীর দ্রুতবেগে উধাও হ'লো, কিন্তু তিন-চার মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "দাদাভাই, চিঠি প'ড়ে মা মাটিতে শুয়ে কাঁদছে।"

ব্যস্ত হ'য়ে প্রসন্নকুমার উঠে দাঁড়ালেন। "কাঁদছেন? কেন, কী হয়েছে? কার চিঠি?" তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সত্যই তাই, ভূমিতলে শয়ন ক'রে সুবর্ণা উচ্ছ্বসিত হয়ে রোদন করছে; নিকটে ব'সে প্রসন্নকুমারের বিধবা ভগিনী বিরজা সুবর্ণার দেহে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন,—অদূরে পোস্টকার্ডখানা প'ড়ে রয়েছে।

চিন্তাকুল কণ্ঠে প্রসন্নকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে বউমা? কী হয়েছে, বিরজা?"

পোস্টকার্ডখানা তুলে নিয়ে প্রসন্নকুমারের হাতে দিয়ে বিরজা বললেন, "বউমার বাবা হঠাৎ মারা গেছেন।"

প্রসন্নকুমার চমকে উঠলেন, "সে কি সর্বনাশের কথা। কী হয়েছিল? কবে মারা গেছেন?"

বিরজা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। কারণ, প্রসন্নকুমার ততক্ষণে চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি চশমাটা বাইরের ঘরে ফেলে এসেছিলেন, তাই হাতটা আগিয়ে দিয়ে পোস্টকার্ডখানা চক্ষু হ'তে যতটা সম্ভব দূরে রেখে পড়তে লাগলেন।

চিঠি লিখেছে, বৈবাহিক শম্ভুনাথের বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী সরসীলাল,—দূরসম্পর্কিত আত্মীয়তার গণনায় সে শম্ভুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। সংক্ষিপ্ত চিঠি। প্রথমেই লিখেছে, "কয়েকদিন হইতে হার্টের প্যালপিটেশনটা বাড়িয়া শম্ভুকাকা মহাশয় বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। তদুপরি একটা সামান্য কারণে রাগ এবং বকাবকি করিয়া কাল রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। এ কারণ আমাদের মানসিক অবস্থার কথা বুঝিতেই পারিতেছ। তোমার জ্ঞাতার্থে লিখিলাম।" তারপর যে সংবাদ অবগত হওয়ার জন্য সুবর্ণা চিঠি লিখেছিল তার উত্তর, এবং তৎপরে মামুলি প্রথা অনুসারে চিঠির সমাপ্তি।

চিঠিখানা সুবর্ণার নিকটে স্থাপন ক'রে দুঃখবিগলিত কণ্ঠে প্রসন্নকুমার বললেন, "চিঠি যখন পাঠালাম, তখন তার মধ্যে যে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ ভরা আছে তা তো স্বপ্নেও মনে করি নি। মাঝে মাঝে বেহাই মশায়ের হার্টের প্যাল্‌পিটেশন হয় তাই জানতাম; কিন্তু তাঁর ব্লাডপ্রেশারের গোলযোগও ছিল নাকি বউমা ?"

ক্রন্দননিরুদ্ধ কণ্ঠে সুবর্ণা বললে, "বোধ হয় একটু ছিল।"

প্রসন্নকুমার বললেন, "বোধ হয় না, নিশ্চয়ই ছিল। এ ব্লাডপ্রেশারেরই কাণ্ড। ভারি বিশ্রী জিনিস, কখন যে হঠাৎ সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠে, তা আগে থেকে একটুও বোঝা যায় না। তার ওপর রাগারাগি বকাবকি করেছিলেন,—তাতে তো প্রেশার এমনিই খানিকটা বেড়ে যায়।"

বিরজা বললেন, "সন্ন্যাস রোগের ধরনই ওই, একেবারে চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। মেজ-জেঠামশায়ের কথা মনে পড়ে না দাদা ?—বেলা বারোটার সময়ে বকাবকি করতে করতে মাথা ঘুরে পড়লেন, তার পরে দুটোর মধ্যে সব শেষ হ'য়ে গেল। বেহাই মশায়েরও যে সন্ন্যাস রোগ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

বৈবাহিকের অতি আকস্মিক মৃত্যুর জন্য প্রসন্নকুমার গভীর দুঃখ এবং সমবেদনা প্রকাশ করলেন, তৎপরে মানব-জীবনের অসারতার কথা উল্লেখ ক'রে সুবর্ণাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বললেন, "মানুষের পক্ষে নশ্বর দেহটা কিছুই নয়,—অবিনশ্বর যে আত্মা তাই তার আসল জিনিস। বেহাই মশায়ের সেই আত্মার যাতে কল্যাণ হয়, তুমি তাঁর সন্তান, তোমার এখন ধৈর্য ধ'রে সেই কর্তব্য পালন করাই উচিত। কাল তোমার সেই কর্তব্য করবার দিন। শোক করবার সময় কোথায় বউমা ?"

বিরজা বললেন, "বাবা যে দিন মারা গেলেন, সেই রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম, বাবা আমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন—তুই কান্নাকাটি করিস নে বিরো, আমি ছেলেদের আগে তোর হাতেই জল পাব। তুই ধৈর্য ধর।"

প্রসন্নকুমার বললেন, "আহা, সত্যই তো। 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' হ'য়ে তিনি রয়েছেন, তোমার দ্বারাই প্রথম তাঁর সদ্‌গতি হবে। সময় অত্যন্ত অল্প; কিন্তু এরই মধ্যে আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, যাতে কাজটি

ক'রে তুমি মনের মধ্যে তৃপ্তি পেতে পার। শোক করবার অনেক সময় রইল বউমা, কিন্তু কাজ করবার সময় বেশি নেই। তুমি ধৈর্য ধর।"

যুক্তি-বিচারের প্রভাবে সুবর্ণাকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হ'লো।

পরদিন চতুর্থী-কৃত্য। প্রসন্নকুমার কর্মপটু ব্যক্তি, অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেন। পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্তে দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার দিলেন পুরোহিতের উপর, এবং স্বয়ং প্রত্যেক বাড়িতে উপস্থিত হ'য়ে দানাপুরের পরিচিত সকল বাঙালীকেই পরদিন সায়াহ্নে ভোজনের জন্ম নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন। মধ্যাহ্নে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থাও করিলেন। পাটনা শহরেও কোন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হ'লো।

সংবাদ পাওয়ার পর পরিচিত স্ত্রীলোকেরা দলে দলে সুবর্ণার সহিত দেখা করতে উপস্থিত হলেন। সকলেরই মুখে এক কথা, "আহা, কী চমৎকার লোকই না শম্ভুবাবু ছিলেন। এই পূজোর আগেও তো এখানে এসেছিলেন। যেমন মুনিঋষির মতো চেহারা, তেমনই অমায়িক স্বভাব। কী শরীর। কী বর্ণ। কী দাড়ি।"

সুবর্ণার শোকের উচ্ছ্বসিত বেগ ক্রমশ অনেকখানি কেটে গেছে, কিন্তু সান্ত্বনাকারিণীদের সঙ্গে কথা কইতে গেলে চোখের জল কিছুতেই বাধা মানে না। কী কাণ্ডই না হঠাৎ হ'য়ে গেল। এমন কাল ব্যাধি এসে গ্রাস করলে যে, শেষ-মুহূর্তে একবার কাছে গিয়ে যে দাঁড়াবে, তার পর্যন্ত সময় পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যাকালে অনেকগুলি ভদ্রলোক প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করতে এলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই আন্তরিক দুঃখিত। কারণ, সকলেরই সহিত শম্ভুনাথ পরিচিত ছিলেন। তিনি বহুবার দানাপুরে জামাতাগৃহে বেড়াতে এসেছেন, এবং প্রত্যেকবারই তথায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত ক'রে গেছেন। শম্ভুনাথ রীতিমতো ধনশালী ছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্যের উত্তাপ তাঁর কিছুমাত্র ছিল না; বরং স্বভাবত তিনি ছিলেন সঙ্গপ্রিয়, সদালাপী এবং কৌতুক-পরায়ণ ব্যক্তি। দাবার আড্ডায়, গান-বাজনার আসরে, আলোচনা-সভায়—সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি ছিল। দূর হ'তে লোকে শম্ভুনাথের প্রাণখোলা উচ্চ হাস্য শুনতে পেয়ে তাঁর সঙ্গলোভে খুশি হ'য়ে উঠত।

মানব-জীবনের ভয়াবহ অনিশ্চিয়তা, ইহলোক এবং পরলোকের অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রভৃতি সময়োচিত জটিল বিষয়াদির আলোচনার পর যখন সমবেদনা-সভা ভঙ্গ হলো, তখন রাত্রি আটটা বাজে। প্রস্থানোদ্যত ভদ্রলোকদিগকে প্রসন্নকুমার সনির্বন্ধে বললেন, "অনুগ্রহ ক'রে কাল সন্ধ্যার সময় আপনারা নিশ্চয় আসবেন। আপনাদের তিনি ভালোবাসতেন, আপনারা এসে আহারাদি করলে বউমা তৃপ্তি পাবেন।"

প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল—সকলেই আসবেন।

পরদিন যথাবিধি চতুর্থী-কৃত্য সমাপন হওয়ার পর মধ্যাহ্নে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো হ'লো, এবং তারপর চলল রাত্রে জন চল্লিশ বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাবার আয়োজন।

তিন জন ব্রাহ্মণ রন্ধন করছিল, এবং প্রসন্নকুমার অদূরে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে স্বয়ং তদারক করছিলেন। সুবর্ণা উপস্থিত হ'য়ে বললে, "বাবা, অনেকক্ষণ এখানে ব'সে আছেন, কষ্ট হচ্ছে। ঘরে চলুন, চা খাওয়ার সময় হয়েছে।"

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল, রন্ধনকার্যও সমাপ্তপ্রায়, শরীরও একটু পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল। প্রসন্নকুমার বাইরের হল্-ঘরে গিয়ে একটা ঈজি-চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিলেন।

অনতিবিলম্বে চা নিয়ে সুবর্ণা প্রবেশ করলে। সুবর্ণার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা গ্রহণ ক'রে প্রসন্নকুমার বললেন, "কাজটা তোমার মনের মত হ'লো তো বউমা?"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে সুবর্ণা বললে, "আপনার সুব্যবস্থায় খুব ভালোই তো হয়েছে বাবা।"

"তা হ'লে মনের মধ্যে একটু শান্তি পেয়েছ তো?"

সুবর্ণার চোখ দিয়ে দুই বিন্দু অশ্রু ঝ'রে পড়ল; সে মৃদুস্বরে বললে, "তা পেয়েছি।"

"তা হ'লেই হলো। তা হলে তাঁরও মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল, তোমার সংসারেও মঙ্গল। বাপ-মা চিরকাল কারও থাকে না বউমা, তবে শেষ সময়টায় দেখতে পেলে না—এই দুঃখই তোমার র'য়ে গেল।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে সুবর্ণা ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে।

আকাশটা খুব মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে এসেছিল। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করলে, বায়ুর প্রকোপও বেড়ে উঠল।

পশ্চিমা ভৃত্য কপুরী জিজ্ঞাসা করলে, বারান্দার দিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবে কি-না।

জলো হাওয়ার ঝাপটা মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর প্রবেশ করছিল। প্রসন্নকুমার বললেন, "এখন তো লোকেদের আসতে বিলম্ব আছে, এখন না হয় বন্ধ ক'রে দে, পরে খুলে দিলেই হবে।"

শুধু সার্সিটা বন্ধ ক'রে কপুরী খিল লাগিয়ে দিলে, তার পর প্রসন্নকুমারের কাছে এসে যথানিয়মে পা টিপতে বসল।

সুধীর নিকটেই কোথায় ছিল, পূর্বদিন থেকে মৃত্যু এবং শোকের এই অজ্ঞাতপূর্ব অভিজ্ঞতায় তার মনটা নানা দিক দিয়ে চিন্তাপীড়িত হ'য়ে ছিল।

প্রসন্নকুমারকে একটু নিশ্চিন্ত অবস্থায় পেয়ে কাছে এসে সে ডাক দিলে, "দাদু।"

সুধীরের কাঁধে হাত রেখে স্নেহপূর্ণকণ্ঠে প্রসন্নকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "কী দাদাভাই?"

"দাদামশাই এখন কোথায় আছে?"

"দাদামশায়? তোমার দাদামশায় এখন স্বর্গে আছেন।"

মনে মনে এক মুহূর্ত কী চিন্তা ক'রে সুধীর বললে, "সগ্গো থেকে এখানে আসতে পারে?"

এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না, বারান্দার দিকের দরজার সার্সিতে টোকা মারার শব্দ পাওয়া গেল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে, বারান্দার আলো তখনও জ্বালা হয় নি, সেই আলো-অন্ধকারের অস্পষ্টতায় সার্সির উপর একটা ছায়াপাত হয়েছে। সম্ভবত কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি একটু আগেই এসেছেন মনে ক'রে প্রসন্নকুমার কপূরীকে দরজাটা খুলে দিতে আদেশ করলেন। কপূরী দরজার হুড়কাটা একটুখানি খুলেই আবার তখনই চট্ ক'রে লাগিয়ে দিলে, তারপর আর একবার ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে "রাম। রাম। সত্যানাশ হুয়া।" ব'লে সত্রাসে কয়েক পা পিছিয়ে এল।

সুধীরও কপূরীর পিছনে পিছনে গিয়েছিল। কপূরীর ভয়চকিত ভাব দেখে বুঝতে না পেরে কৌতূহলী হ'য়ে দরজার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা নির্ণয় করবার চেষ্টা করলে, তারপর ক্ষণকাল নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে "উ্রে বাবা রে। সগ্গো থেকে দাদামশাই এসেছে।" বলে উঠি-তো-পড়ি ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির ভিতর ছুটে পালিয়ে গেল।

"ব্যাপার কী।" ব'লে প্রসন্নকুমার তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর সভীতিকৌতূহলে সার্সির কাছাকাছি গিয়ে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রেই দু-পা পিছিয়ে এলেন।

আলো-অন্ধকারের আবছায়ায় সার্সির উপরে যে একরাশ কাঁচা-পাকা দাড়ির সমাবেশ হয়েছিল তা যে বৈবাহিক শম্ভুনাথের, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। অস্পষ্ট মুখাবয়বের মধ্যে সমুজ্জ্বল চক্ষুর ভিতর ব্যগ্র বিচিত্র দৃষ্টি। কথার শব্দও একটু একটু শুনা যাচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টির চড়বড়ানি এবং কাচের বাধা অতিক্রম ক'রে এতই ক্ষীণ হ'য়ে আসছিল যে, অনুনাসিক কি-না তা ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না।

সার্সির উপর সমানে আঙুলের ঠকঠকানি চলছিল। প্রসন্নকুমার দ্বিধা-পীড়িত মনে একবার হুড়কার উপর হস্তার্পণ করলেন, তারপর কী মনে ক'রে হুড়কাটা ভালো ক'রে টিপে দিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। অনিচ্ছাক্রমেও তাঁর

দেহে কাঁটা দিয়ে উঠছিল, এবং প্রচণ্ড শীতের দিনেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল।

গোলযোগ শুনে দ্রুতপদে সুবর্ণা এসে উপস্থিত হলো এবং তাড়াতাড়ি সার্সির কাছে গিয়ে ভালো ক'রে একবার দেখেই "বাবা এসেছ!" ব'লে ফট্ ক'রে দরজা খুলে দিলে।

"কেমন আছ বাবা?"

সশরীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন শম্ভুনাথ। এবং সুবর্ণা ভিন্ন আর সকলেই এক-আধ পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

শম্ভুনাথের পদধূলি গ্রহণ ক'রে ব্যগ্রকণ্ঠে সুবর্ণা বললে, "কেমন আছ বল না বাবা?"

বিস্ময়চকিত শম্ভুনাথের মুখে কথা ফুটল; বললেন, "সে কথা পরে বলছি, কিন্তু তোমাদের কি ভূতে পেয়েছে সুবর্ণা?"

উত্তর দিলেন প্রসন্নকুমার; বললেন, "না পেয়ে থাকলেই তো বাঁচি। কিন্তু কিছুক্ষণ ধ'রে সেই আশঙ্কাই হয়েছিল।"

সবিস্ময়ে শম্ভুনাথ বললেন, "কী রকম?"

শম্ভুনাথের সহজ আকৃতি দেখে এবং স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে প্রসন্নকুমার বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যু-সংবাদের মধ্যে নিশ্চয় একটা কিছু গোলযোগ আছে। তিনি বললেন, "বসুন, একবার ভালো ক'রে অনুভূতির দ্বারা পরীক্ষা ক'রে দেখি, তারপর বলছি।" ব'লে সজোরে দুই বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে শম্ভুনাথকে চেপে ধ'রে বললেন, "নাঃ—কঠিন, উষ্ণ, জীবন্ত। 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' নয়। অতএব আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত হন।" ব'লে তিনি শম্ভুনাথের দুই বাহু ধ'রে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে দিলেন।

শম্ভুনাথের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি বিহ্বল নেত্রে ক্ষণকাল প্রসন্নকুমারের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর স্খলিতকণ্ঠে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন দেখি বেই মশাই?"

সংক্ষেপে প্রসন্নকুমার সমস্ত কথাটা ব'লে গেলেন—মায় আসন্ন ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা পর্যন্ত।

শুনে শম্ভুনাথ বিস্মিত নেত্রে বললেন, "কই, দেখি সরসীর চিঠি—আমার মৃত্যুর কথা কি সে লিখেছে।"

পাশের ঘর থেকে পোস্টকার্ডখানা এনে সুবর্ণা শম্ভুনাথের হাতে দিল। নিবিষ্ট ভাবে পোস্টকার্ডখানা পড়তে পড়তে হঠাৎ এক সময়ে শম্ভুনাথ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। বললেন, "এ যে দেখছি 'আজ মর গিয়া'র দ্বিতীয় কাহিনী হ'লো! সে লিখেছে, কাল রাত্রে হঠাৎ তিনি মারা গিয়াছেন, আর তোমরা

সকলে পড়েছ মারা গিয়াছেন।' হার্টের প্যাল্‌পিটেশন রাগারাগি বকাবকি— এই সব উপসর্গের সঙ্গদোষে 'আরা' অতি সহজেই মারা হ'য়ে গেছে। তা ছাড়া জড়ানো লেখার জন্যে 'আরা'টা অনেকটা 'মারা'র মতো দেখাচ্ছে বটে।" ব'লে তিনি পুনরায় উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন—তাঁর সেই পেটেন্ট হাসি, যা দানাপুরে সর্বজনের পরিচিত।

অপ্রতিভ প্রসন্নকুমার স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি সত্যিসত্যিই আরা গেছলেন না-কি বেই মশায় ?"

শম্ভুনাথ বললেন, "সেইখান থেকেই তো এখন আসছি। অপর্ণার কাছে দিন তিনেক ছিলাম।"

অপর্ণা শম্ভুনাথের কনিষ্ঠা কন্যা।

হাস্য কৌতুক এবং আনন্দের একটা প্রবল প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু শুধু তাই নয়, দেখা গেল অদূরে অশ্রু এবং রোদনেরও একটা পালা সমানে তাল রেখে চলেছে। একটা চেয়ারে ব'সে আনন্দে সুবর্ণা ফ্যাঁস ফ্যাঁস ক'রে অশ্রু মোচন করছে।

সুবর্ণার নিকটে উপস্থিত হ'য়ে তার মাথায় হাত রেখে শম্ভুনাথ বললেন, "কাঁদছিস্ কেন সুবর্ণা, ভালোই ত করলি। আগেভাগেই সেরে রাখলি। পিতৃকার্যের আগাম কারবার আমিও নিজের চোখেই দেখে গেলাম। এমন কি তোর ব্রাহ্মণভোজনের একটা পাতে শরিক হ'তে পারব।" ব'লে পুনরায় হাসতে লাগলেন।

কৌতুকপ্রিয় শম্ভুনাথের মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা খেয়ালের উদয় হ'ল ; বললেন, "দেখুন বেই মশায়, এমন চমৎকার প্রহসনটার যবনিকা এখানেই শেষ করলে চলবে না—এর জের ব্রাহ্মণভোজন পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যেতে হবে।" ব'লে নিজের অভিসন্ধির কথাটা সংক্ষেপে প্রকাশ ক'রে বললেন।

ফন্দিটা সকলেরই নিকট অতিশয় কৌতুকপ্রদ ব'লে মনে হ'লো। যারা শম্ভুনাথের আগমনের কথা জানতে পেরেছিল, সকলকেই সে কথাটা একান্তভাবে গোপন রাখবার জন্যে ব'লে দেওয়া হ'লো। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান-আপ্যায়নের জন্য প্রসন্নকুমার বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে বসলেন। গরম এককাপ চা এবং ব্রাহ্মণভোজনের জন্য প্রস্তুত দু-চারখানা কড়াইশুঁটির কচুরির দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে শম্ভুনাথ অভিনয়ের জন্য প্রবৃত্ত হলেন।

বাড়ির ভিতরে একটা দীর্ঘ দালানে নিমন্ত্রিতদের জন্য দুই সারি পাতা সাজানো হয়েছে, সেই দালানের এক প্রান্তে একটা চৌকোণা টেবিল স্থাপিত করা হ'লো। একটি বেশ বড় বাঁধানো ছবি থেকে ছবি এবং পিছনের পীজবোর্ড খুলে ফেলে শুধু ফ্রেম এবং কাচ হাতে নিয়ে নিজের সম্মুখে স্থাপিত ক'রে শম্ভুনাথ এমনভাবে

টেবিলের উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলেন, যাতে তাঁর মুখ এবং চক্ষুর খানিকটা অংশ ফ্রেমের ভিতর দিয়ে দেখা যায় অর্থাৎ তাঁকে যেন দূর থেকে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি ব'লে ভুল করা চলে। তারপর ফুলের তোড়া, ফুলের মালা এবং রেশমী বস্ত্রাদি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা এমন ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হ'লো যাতে শম্ভুনাথের দেহের অপ্রয়োজনীয় কোনও অংশই দৃষ্টিগোচর রইল না। অথচ ফ্রেমের ভিতরকার অংশকে ছবি ব'লে ভ্রম করবার কারণ প্রবলতর হ'য়ে উঠল। কেউ যাতে নিকটে গিয়ে ভালো ক'রে পরীক্ষা করবার সুযোগ না পায় সেই জন্য সম্মুখে ভূমিতলে পূজার তৈজস-পত্রাদি স্থাপন ক'রে বাধার সৃষ্টি করা হলো। উপরন্তু দূর হ'তেও যাতে ভালো ক'রে লক্ষ্য করা না যায়, সেজন্য নকল ছবির পিছন দিকে একটা অতিশয় উজ্জ্বল আলো প্রভা বিকীর্ণ ক'রে রইল। মোটের উপর সতর্ক দর্শকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে প্রতারিত করবার জন্য যে পরিমাণ কৌশল অবলম্বন করা হ'লো, তার মধ্যে গলদ বিশেষ কিছুই রইল না।

ইতিমধ্যে বাইরের ঘরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। প্রসন্নকুমার যখন তাঁদের ভিতরে নিয়ে এসে পাতে বসালেন, তখন শম্ভুনাথের দিকটা ধুনার ধোঁয়ার অন্ধকার। আসন গ্রহণ করবার পূর্বে পাছে কেউ ভালো ক'রে ছবি দেখবার জন্য নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়, সেই জন্য এই ফন্দি।

ভোজন আরম্ভ হওয়ার দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ধোঁয়া পরিষ্কার হ'য়ে গেল। তখন প্রসন্নকুমার শম্ভুনাথের আলেখ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন, বললেন, "মাত্র পাঁচ-সাত দিন হ'ল বেই মশায়ের এই ব্রোমাইট এনলার্জমেণ্ট-খানি কলকাতা থেকে এসেছে। এরই মধ্যে এমন শোচনীয় কারণে যে এখানি ব্যবহার করতে হবে, তা স্বপ্নেও কেউ মনে করে নি।"

ফোটো দেখে সকলেই অবাক। ছবি ত নয়, যেন সাক্ষাৎ মূর্তি!

রামবাবু বললেন, "চমৎকার করেছে তো। মনে হচ্ছে, ঠিক যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।"

বিপিনবাবু বললেন, "আর গায়ের রঙ দেখেছেন? ঠিক যেন মানুষের গা। কালার্ বোমাইড নাকি রায় বাহাদুর?"

স্মিতমুখে মাথা নেড়ে প্রসন্নকুমার বললেন, কালার্ বোমাইড। আপনার দেখছি এ সব জিনিস জানা আছে।"

পরম আপ্যায়িত হ'য়ে মৃদু হেসে বিপিনবাবু বললেন, "হে-হে। তা একটু-আধটু আছে বইকি। বছরে অন্তত চার-পাঁচ বার কলকাতায় যাই তো, এ সব আর্টের সঙ্গে একটু টাচ আছে।"

প্রসন্নকুমার বললেন, "একটু নয়, বিলক্ষণ আছে।"

হরলালবাবু বললেন "ঐ জোর আলোটা পিছন দিকে না দিয়ে সামনের দিকে দিলে আরও স্পষ্ট দেখা যেত।"

প্রসন্নকুমার বললেন, "তাতে আমাদের পক্ষে হয়তো ভালই হ'তো, কিন্তু

আধুনিক যুগের তরুণ রসিকদের পক্ষে নয়। আজকালকার দিনে রসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতা একটা মারাত্মক দোষ। সব হওয়া চাই একটু ঝাপসা ঝাপসা, একটু আউট অব ফোকাস্—নইলে সফ্‌ট্‌ এফেক্ট পাওয়া যাবে না, হ'য়ে যাবে হার্ড। এসব কথা বিপিনবাবু সবই জানেন। জিজ্ঞাসা করুন না ওঁকে।"

জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হ'লো না, প্রশংসা প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতায় বিপিনবাবু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন; বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আজকালকার আর্টিস্টরা ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের গুরুত্ব খুব বুঝেছেন। তাই এসব ধরনের এফেক্ট সৃষ্ট করতে পারেন। ও আলো ঠিকই দেওয়া হয়েছে।"

তারিণীবাবু বললেন, "আচ্ছা, চুলগুলো আর দাড়িটা যেন একটু উঁচু উঁচু ঠেকছে, ফল্‌স্‌ চুল লাগানো হয়েছে নাকি?"

তারিণীবাবুর মন্তব্য শুনে মিস্টার কারকরমা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন; বললেন, "এ কি আপনার হংস-দময়ন্তী যে, ফল্‌স্‌ চুল লাগাবে? জিনিসটা বড় আর্টিস্টের তৈরি তা বুঝতে পারছেন না?—একেবারে ট্রু টু লাইফ।"

নিজের নির্বুদ্ধিতাসূচক প্রশ্নের জন্য অপ্রতিভ হ'য়ে তারিণীবাবু বললেন, "না, তাই বলছি। সত্যিই জিনিসটা ভালো হয়েছে।

আলোচনাটা ক্রমশ আহারের প্রতি নিবিষ্টতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু ক্ষুধার চাহিদা যখন অনেকটা হ্রাস হ'য়ে এসেছে, তখন আবার কেউ কেউ শম্ভুনাথের ছবির প্রতি মনোযোগী হ'লেন।

ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় বিপিনবাবু চমকে উঠলেন। মনে হ'ল, শম্ভুনাথের মুখের ভিতর থেকে জিভটা একটু-খানি বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে গেল। ভ্রান্তি না কি? মাথাটা একবার ঝেড়ে নিলেন, চোখ দুটো যথাসম্ভব পরিষ্কার করলেন, তারপর আড়ে আড়ে আর একবার তাকিয়ে দেখেই হাতের লুচির টুকরাখানা পাতের উপর সজোরে নিক্ষেপ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে বসলেন। আবার জিভ ভিতরে ঢুকে গেল। এ কি কাণ্ড। মাথা খারাপ হ'লো না-কি। অথবা তার চেয়েও গুরুতর আর-কিছু।

প্রসন্নকুমার বিপিনবাবুর অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন; বললেন, "বিপিনবাবু, এরই মধ্যে হাত গোটালেন কেন? খান।"

স্খলিতকণ্ঠে বিপিনবাবু বললেন, "আজ্ঞে, খাচ্ছি, কিন্তু—"

"না, না, এরই মধ্যে 'কিন্তু' করলে চলবে না, এখন তো অনেক জিনিসই বাকি রয়েছে।"

প্রসন্নকুমারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার কারকরমার দিকে গভীর খাদ স্বরের একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনা গেল। দেখা গেল, পাতের দিকে মস্তক অবনত ক'রে মিস্টার কারকরমাই সেই শব্দ করছেন।

"কী হলো, কী হ'লো, মিস্টার কারফরমা ?" ব'লে প্রসন্নকুমার ছুটে আসতে মিস্টার কারফরমা কিছুই বললেন না, তদবস্থ থেকেই শুধু কম্পিত হস্তের তর্জনীর দ্বারা শম্ভুনাথের দিকে দেখিয়ে দিলেন। সকলে সবিস্ময়ে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখা গেল, কপ্ ক'রে শম্ভুনাথের ছবির মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল। সুতরাং কিছুক্ষণ থেকে সেই মুখ যে হাঁ ক'রে ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সমাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট চাঞ্চল্য জাগ্রত হ'য়ে উঠল। বিপিনবাবু তখন আসনের উপর দাঁড়িয়ে উঠলেন।

যুক্তির এবং বিচারবুদ্ধির পরিচালনার দ্বারা ভয় হ'তে মুক্তি পাওয়ার চেয়ে বিমূঢ় হ'য়ে ভয় পেতে থাকা ঢের সহজ। সুতরাই ঘরসুদ্ধ লোক নির্বিবাদে একটা উৎকট আতঙ্কে আচ্ছন্ন হ'য়ে রইল।

দলের মধ্যে একজন স্পিরিচুয়ালিস্ট ছিলেন। তিনি সভীতিকণ্ঠে বললেন, "ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না। ছবির মধ্যে ভর হয়েছে।" তার পর কম্পিত পদে দাঁড়িয়ে উঠে শম্ভুনাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে অতিদ্রুত গতিতে হস্ত চালনা করতে লাগলেন।

"শম্ভুনাথবাবু।"

আহ্বানের উত্তরে একটা অনুচ্চ কিন্তু গভীর গোঁ শব্দ শোনা গেল। সেটা শম্ভুনাথ না কারফরমা করলেন, তা ঠিক বোঝা গেল না।

ঘন ঘন হস্তচালনা করতে করতে স্পিরিচুয়ালিস্ট বললেন, "শম্ভুনাথবাবু, আমার দিকে তাকান।"

সকলে সভয়ে দেখলে তীব্র প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে শম্ভুনাথ স্পিরিচুয়ালিস্টের দিকে কটমটিয়ে দৃষ্টিপাত ক'রে আছেন। চক্ষুর ভিতর যেন অগ্নিকাণ্ড চলেছে!

"আচ্ছা, হয়েছে এবার বিপিনবাবুর দিকে তাকান।"

বিপিনবাবু উত্তেজনার তাগিদে পুনরায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, অসঙ্গত প্রস্তাব শুনে টপ ক'রে ব'সে পড়লেন।

এবার কিন্তু স্পিরিচুয়ালিস্টের অনুরোধ রক্ষিত হ'লো না, তৎপরিবর্তে সমস্ত দালানটা বিদীর্ণ ক'রে একটা বিকট অট্টহাস্য উত্থিত হ'ল,—এ শম্ভুনাথেরই বহু পরিচিত হাস্য, কিন্তু পারলৌকিক সংযোগ হেতু অতিশয় কর্কশ।

তারপর যে কাণ্ডটা ঘটল তা বর্ণনার বস্তু নয়, কল্পনার ব্যাপার। স্পিরিচুয়ালিস্ট চোখ বুজে-বোঁ ক'রে ঘুরে গিয়ে সবলে বিপিনবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। কারফরমা ব'সে ব'সেই হস্তপদের সাহায্যে বাইরের ঘরের দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। বাকি সকলে কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। গেলাস গেল উল্টে, আসন গেল গুটিয়ে, পাতা গেল চটকে। সকলে একসঙ্গে বাইরের ঘরের দিকে ধাবিত হলেন। কারও কারও মনে সন্দেহের ছায়াপাত যে হয় নি তা নয়, কিন্তু সর্বাগ্রে পৈতৃক প্রাণটাকে নিরাপদ করার তাগিদ এত বেশী যে, মীমাংসার জন্য কেহ অপেক্ষা করলে না।

ব্যাপারটা যে এমন গুরু গতি নেবে, প্রসন্নকুমার তা পূর্বে ঠিক বুঝতে পারেন নি। "কিছু ভয় নেই, কিছু ভয় নেই। আপনারা বসুন, আপনারা বসুন।" ব'লে তিনি চীৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু তখন কে কার আশ্বাসে কর্ণপাত করে। সকলে গুঁতোগুঁতি করতে করতে বাইরের ঘরে এসে উপস্থিত। তারপর হুড়কার কাছে ঠেলাঠেলি।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শম্ভুনাথ খিড়কির দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে একেবারে কম্পাউণ্ডের প্রান্তে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শঙ্কাকুল জনতা যখন কোনও প্রকারে বাইরের ঘরের দরজা খুলে কম্পাউণ্ডের উপর নেবে প'ড়ে গেটের উদ্দেশ্যে ধাবিত হ'লো, তখন গেটের নিকট আবার একটা উচ্চহাস্য শুনা গেল। এবার কিন্তু বিকট নয়—কতকটা মোলায়েম। তথাপি ভয়চকিত বিপর্যস্ত জনসমূহ রাশ-টানা ঘোড়ার মতো মুহূর্তের মধ্যে গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তখন দূর থেকে হাত তুলে উচ্চকণ্ঠে শম্ভুনাথ বললেন, "মশায়রা অনুগ্রহ ক'রে শুনুন। আমি ভূত নই, ভবিষ্যৎ নই,—আমি আপনাদেরই মতো বর্তমান। অর্থাৎ রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আপনাদেরই মতো বেঁচে আছি। যে চমৎকার প্রহসনের শেষ অংশটা আপনারা করলেন, তার প্রথম অংশটা শুনলে খুশি হ'য়ে বাড়ি যাবেন। আপাতত সকলে বাইরের ঘরে বসবেন চলুন।"

সকলকে আশ্বস্ত করতে পাঁচ মিনিট গেল। তারপর প্রসন্নকুমারের বর্ণিত কাহিনী শুনে একটা প্রচণ্ড হাসির রোল উঠল।

ততক্ষণে আবার নূতন ক'রে পাতা হয়েছে। শম্ভুনাথ করজোড়ে সকলকে বললেন, "শ্রাদ্ধের ভোজটা তো ভালো ক'রে খাওয়া হয় নি, এবার পুনর্জন্মের ভোজটা অনুগ্রহ ক'রে খাবেন চলুন।"

আনন্দের আতিশয্যে একজনও আপত্তি করলেন না। এবার অবশ্য ব্রাহ্মণভোজনের পঙক্তির মধ্যে প্রসন্নকুমার ও শম্ভুনাথ দুই বৈবাহিকের দুখানা পাত বেশি পড়ল।

দামোদরের বৈতরণী পার

শ্রাবণ মাস। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে। প্রথম ঘণ্টায় আমার ক্লাস ছিল না। বেলা সাড়ে এগারোটার সময়ে কলেজে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, সহসা এক অচিন্তিত কাণ্ড ঘটেছে। ইতিহাসের অধ্যাপক গৌরমোহনবাবু যথারীতি অধ্যাপকদের বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ ক'রে চেয়ারে উপবেশনের পর দু-চার বার আড়ামোড়া ভেঙে টেবিলের উপর দুই বাহুর মধ্যে

সেই-যে মাথা গোঁজেন, বহু ডাকাডাকি আর ঠেলাঠেলিতেও সে মাথা কিছুতেই উঁচু হয় নি। ব্যস্ত হ'য়ে প্রিন্সিপাল তখন দুজন ডাক্তারকে ফোন করেন। ডাক্তাররা এসে গৌরমোহনবাবুকে পরীক্ষা ক'রে যে কথা বলেন তাতে অবশ্য মাথা উঁচু হবার কথা নয়, কারণ উক্ত কার্য করবার জন্য যে প্রাণশক্তির প্রয়োজন গৌরমোহনের দেহের মধ্যে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। গৌরমোহনবাবুর মৃত্যু ঘটেছে।

ইত্যবসরে মৃত অধ্যাপকের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে পড়েছেন, শ্মশান-যাত্রার ব্যাবস্থাদি চলেছে, এবং প্রিন্সিপাল একটি জরুরী শোকসভা আহূত ক'রে মৃত অধ্যাপকের প্রতি সম্মানার্থে সেদিন তো কলেজ বন্ধ করেছেনই, পরদিনও ছুটি দিয়েছেন। শবদেহকে শ্মশান পর্যন্ত অনুসরণ করবার জন্য ছাত্রদিগকে অনুরোধও করেছেন।

সেদিন শুক্রবার, পরদিন ছুটি এবং তৎপরদিন রবিবার। সুতরাং মোটের উপর আড়াই দিন ছুটি দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া, শুক্রবার থেকেই রেলে উইক্-এণ্ড টিকিট পাওয়া যায়। এত বুঝে-সুঝে সব দিক বিবেচনা ক'রে গত হওয়ার জন্য মনে মনে বিগতপ্রাণ অধ্যাপককে ধন্যবাদ দিয়ে এবং শ্মশানের পথে শবদেহকে অনুসরণ করতে না পারার জন্য দেহবিমুক্ত আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে মেসের দিকে দ্রুতপদে ধাবিত হলাম। মেসে পৌঁছে বইগুলো সশব্দে তক্তাপোশের উপর ফেলে একখানা ধুতি, একটা জামা, টর্চ আর মনিব্যাগটা নিয়ে একেবারে সোজা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে টিকিট কিনে আসাম মেলের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলাম। পথে খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে একটা স্টেশনে আসাম মেল পরিত্যাগ ক'রে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধ'রে আমাদের গ্রামে যাবার স্টেশনে উপনীত হব। সেখান হ'তে মাইল তিনেক দূরে একটা নদী, এবং নদী উত্তীর্ণ হ'লেই গ্রাম।

অকস্মাৎ অজানিত গৃহাগমনের দ্বারা আত্মীয়-পরিজনকে চমৎকৃত ক'রে দেবার একটা আনন্দ তো ছিলই, তাছাড়া বিশেষ ক'রে এমন একটা অন্য ব্যাপার ছিল যার মধ্যে শুধু আনন্দই নয়, প্রচুর উত্তেজনার কারণও বর্তমান ছিল। দিন দুই হ'লো বাড়ি থেকে যে চিঠি এসেছে তা থেকে জানতে পেরেছি, বিমলা আমাদেরই গ্রামে তার মাসীর বাড়ি বেড়াতে এসেছে, এবং সম্ভবত মাস খানেক সেখানে থাকবে। কয়েক মাস পূর্বে এক শুভহিবুক যোগের লগ্নে বিমলা আমার জীবন-সঙ্গিনী হয়েছে। আমি বাড়ি গেলে অবিলম্বেই যে বিমলাকে গৃহে আনা হবে আত্মীয়বর্গের এরূপ সুবিবেচনার প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল।

গ্রামে যাবার ক্ষুদ্র স্টেশনটিতে যখন গাড়ি থেকে অবতরণ করলাম, তখন ঠিক সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। বৃষ্টি পড়ছে না, কিন্তু সমস্ত আকাশ ধূসর মেঘে

আচ্ছন্ন। সামান্ত স্টেশন, তার উপর ঝড়-বৃষ্টির দিন, মাত্র পাঁচ-ছয় জন আরোহী গাড়ি থেকে নামল, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও আমাদের গ্রামের দিকে যাবে না। স্টেশনে গাড়ি একখানিও নেই, থাকলেও মাইল দুয়েকের বেশি সে পথে গাড়ি যায় না। শেষ মাইল খানেক পথ তরু-গুল্ম-আকীর্ণ প্রান্তর ভেদ ক'রে পায়ে হেঁটেই শেষ করতে হয়।

স্টেশন-মাস্টারের সহিত আমার পরিচয় ছিল। আমাকে দেখে সে বললে, "বিনয়বাবু যে হঠাৎ এ সময়ে? বাড়ি যাচ্ছেন না-কি?"

প্রসঙ্গটা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বললাম, "যাচ্ছি।"

"সঙ্গী-টঙ্গি আলো-টালো আছে তো?"

"সঙ্গী তো দেখছি নে, টর্চ আছে।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে স্টেশন-মাস্টার বললে, "এই ঝড়-বাদলার দিনে রাত সামনে ক'রে এতখানি পথ একলা যাওয়া তো আমার ভালো ঠেকছে না। তার চেয়ে কাল সকালে যাবেন, আজ রাতটা আমার এখানে কাটান না? সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে প'ড়ে প'ড়ে গল্প-গুজব করা যাবে। মেয়েরা তো এখন বাপের বাড়িতে।"

অল্প দিন হ'লো মেয়েদের অর্থাৎ স্ত্রীকে (গৌরবে বহুবচন) পিত্রালয়ে পাঠিয়ে স্টেশন-মাস্টার বিরহ-বেদনায় দিন যাপন করছে, সুতরাং তার সঙ্গলিপ্স মন আমাকে পেয়ে লোভাতুর হ'য়ে উঠেছে।

প্রস্তাবটা প্রথম মুখে নিতান্ত মন্দ ঠেকল না, কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন মনে হ'লো যে এতখানি পথ এত উৎসাহের সহিত এসে মাত্র তিন মাইলের জন্ত স্টেশন মাস্টারের সহিত অসার কথোপকথনে রাত্রি যাপন করতে হবে এবং এই তিন মাইল পথ কোন প্রকারে অতিক্রম করতে পারলে আজ রাত্রেই বিমলার সঙ্গলাভ হয়তো দুর্লভ না-ও হতে পারে, তখন সজোরে মাথা নেড়ে বললাম, "নাঃ, চ'লেই যাই। ভয় করলেই ভয়,—বুঝছেন কি না? হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেলে তিন মাইল পথ আর কতক্ষণ?"

হন্ হন্ ক'রে দু মাইল পথ অবশ্য এক রকমে কেটে গেল, কিন্তু সদর-রাস্তা ছেড়ে মাঠে প'ড়েই হলো বিপদ। রাত্রি বৃদ্ধির সহিত অন্ধকার বৃদ্ধিহেতু পথচিহ্ন সব সময়ে স্পষ্ট দেখা যায় না; জল-কাদার উপর প'ড়ে টর্চের আলো অনেকখানিই ম'জে যায়, ভালো খোলতাই হয় না; পায়ের তলায় মৃত্তিকা যৎপরোনাস্তি পিচ্ছিল ব'লে ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে চলতে হয়; দুই দিকে পথের ধারে সর্ সর্ ক'রে কী সব স'রে যায়। মনে মনে আবৃত্তি করি—ওঁ আস্তিকস্ত মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা জরৎকারু পত্নী মনসা দেবি নমোঽস্তুতে। নিকটেই একদল শিয়াল অকস্মাৎ সজোরে ডেকে ওঠে; দূরে বন-বাদাড় বিদীর্ণ

ক'রে একটা গোলাকার জন্তু অতি দ্রুতবেগে ছুটে চ'লে যায়,—বর্ষাকাল, চারিদিক জলে ভেসে গেছে, এ সময়ে বন্য বরাহের আমদানি আশ্চর্য নয়।

কিন্তু এ-সকল তো গেল বাস্তব জগতের সমূলক আশঙ্কার কথা ;—এ সকল হ'তে উদ্ধারের সম্ভাবনা এবং উপায় নিশ্চয় থাকতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে যদি অবাস্তব জগতের অমূলক আশঙ্কা যোগ দেয় তা হ'লেই সর্বনাশ। উদ্যোগ, আয়োজন, সমারোহ ক'রে শবদেহ নিয়ে যেতে কিছু বিলম্ব হ'য়েই থাকবে— এতক্ষণ হয়তো নিমতলার ঘাটে গৌরমোহনবাবুর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হ'য়ে এল। হঠাৎ যদি খেয়ালবশে তাঁর অশরীরী আত্মা চিতাক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে একটা বায়বীয় দেহ ধারণ ক'রে আমার পাশে উপস্থিত হ'য়ে ধীরে ধীরে বলে, 'বাবা বিনয়, তুমি ইতিহাসে একটু কাঁচা আছ, ভালো ক'রে পাস করতে যদি চাও তাহলে ঐ বিষয়টিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ো', তা হ'লেই তো গোলযোগ!

শুধু গ্রামেই নয়, কলিকাতাতেও সাহসী ব'লে আমার বিশেষ একটু খ্যাতি আছে। কিন্তু সে খ্যাতি আর বুঝি রক্ষা পায় না, পথের কাদার উপরই সশব্দে ভেঙে পড়ে! দক্ষিণে ও বামে অপাঙ্গে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য দীর্ঘতর ক'রে দিলাম। 'আস্তিকস্য মুনের্মাতা'র প্রতি আবেদন-নিবেদন আপনা-আপনি বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, মনের মধ্যে সন্ত্রস্ত চিত্তে অজ্ঞাতসারে কখন জপ আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে—ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে, রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ। যা হোক, দুঃখ-বিপত্তিরও শেষ আছে। শেষ পর্যন্ত কোনও রকমে নদীর তীরে উপনীত হলাম।

উপনীত তো হলাম, কিন্তু নদী উত্তীর্ণ হই কী ক'রে? রজনীর অস্পষ্ট আলোকে যতদূর দেখা যায় খেয়াঘাটে জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মাঝির ক্ষুদ্র কুটিরটা অন্ধকারাবৃত। খেয়া নৌকাখানা ঘাটে বাঁধা রয়েছে বটে, কিন্তু তার উপর একজনও আরোহী নেই। হু-হু ক'রে একটা হাল্কা জলো হাওয়া বইছে, তার মধ্যে চাপা কান্নার মতো এমন একটা অনির্দেশ্য হুঙ্কার, যা প্রাণের মধ্যে অস্বস্তিজনক বিহ্বলতার সঞ্চার করে।

উচ্চ কণ্ঠে ডাকলাম, "দামোদর! দামোদর মাঝি আছ?"

কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, গোটা দুই কুকুর আর্তস্বরে ডাক দিয়ে উঠল।

কী বিপদ! সমস্ত রাত্রি এই জনহীন খেয়াঘাটে একাকী কাটাতে হবে নাকি? তিন মাইল পথ প্রত্যাবর্তন ক'রে স্টেশনে ফিরে যাওয়াও তো অসম্ভব। স্টেশন-মাস্টার কর্তৃক নিবেদিত ধ্রুব আশ্রয়টি পরিত্যাগ ক'রে আসার জন্য মনের মধ্যে সুগভীর পরিতাপ উপস্থিত হ'লো।

পুনরায় প্রাণপণ জোরে ডাক দিলাম, "মাঝি! দামোদর মাঝি! দামোদর মাঝি আছ?"

বহুদূরে ক্ষীণ কী একটা শব্দ যেন শোনা গেল ; মনুষ্যকণ্ঠস্বরও হ'তে পারে, চলমান বায়ুর মর্মরধ্বনি হওয়াও আশ্চর্য নয়। তারপর সহসা কী যেন একটা অনুভূতি বোধ করে পিছন ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আমার পশ্চাতে দীর্ঘাকৃতি এক মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে। আর্তকণ্ঠ হ'তে নির্গত হলো, "কে? কে তুমি?"

"আজ্ঞে, বিনুবাবু, আমি দামোদর। চলুন, আপনাকে পার ক'রে দিয়ে আসি।"

দামোদর! বাঁচা গেল। আশ্বস্ত হ'য়ে বললাম, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে দামোদর? ডেকে ডেকে হয়রান যে।"

দামোদর বললে, "বিপদের কথা আর বলেন কেন বিনুবাবু। ওই হোথা পাকুড়গাছতলায় ব'সে ছিনু। আমার কি আর আসবার কথা। তবে নাকি আপনি ছেলেমানুষ, রেতের বেলা ভয় পেয়ে ডাকাডাকি লাগিয়ে দিলেন—মায়া হ'লো তাই চ'লে এনু। হাজার বার তো পার করেছি, আর একবার না হয় পার ক'রেই দিই। নিন, চলুন, ঝপ ক'রে রেখে আসি আপনাকে। আমাকে আবার অনেক দূর যেতে হবে।"

খেয়া নৌকার দিকে অগ্রসর হ'য়ে বললাম, "এই ঝড় বাদলার রাতে অনেক দূরে আবার কোথায় যাবে দামোদর?"

দামোদর বললে, "ও-কথা ছাড় দেন বিনুবাবু। ডাক পড়লে কি আর রক্ষে আছে? যেতেই হবে।"

কথাটির সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারলাম না। নৌকায় উঠে বসলাম, তারপর দড়ি খুলে নৌকা ঠেলে দিয়ে দামোদরও লাফিয়ে উঠে পড়ল। ঠিক আর-পার না হ'লেও গ্রাম বেশি দূরেও নয়, পার হ'তে মাত্র দশ-বারো মিনিট সময় লাগে। খানিকটা পথ নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে এসে সহসা এক সময়ে দামোদর বললে, "বৈতরণীর কোনও খোঁজ রাখেন বিনুবাবু?"

বললাম, "কোন্ বৈতরণী?"

"ঐ যে গো, যে বৈতরণী পার হ'য়ে যমের বাড়ি যেতে হয়।"

দামোদরের কথা শুনে হেসে ফেললাম, বললাম, "যমের বাড়ি যাবার এখনও একটু দেরী থাকতে পারে মনে ক'রে বৈতরণীর খোঁজ এ পর্যন্ত করি নি।"

শিউরে উঠে দামোদর বললে, "আহা ষাট্ ষাট্। সে কথা বলছি নে। তোমরা পণ্ডিত মানুষ, শাস্তোর-টাস্তোর পড়েছ, তাই জিজ্ঞেস করছি।" তারপর এক মুহূর্ত নীরব থেকে কতকটা নিজের মনেই বলতে লাগল, "শুনেছি টগ-বগ ক'রে ফুটছে, রক্তবর্ণা রঙ, পচা মাংস আর হাড় গিজগিজ করছে। কিন্তু সে যাই হোক, ঠিক পার হ'য়ে যাব। জল-ঝড়-তুফান-বৃষ্টির মধ্যে লাখো লোককে পার করলাম, আর নিজে একটা বৈতরণী নদী পার হ'তে পারব না। তা যদি

না পারি তো দামোদর মাঝির মিত্যুই ভালো।" ব'লে খল্ খল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, "এই দেখো মান্ষের ভুলের তামাসা! ম'রে গিয়েও আবার বলছি মিত্যুই ভালো।"

অবাক হ'য়ে দামোদরের কথা শুনছিলাম, শেষাংশ শুনে বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না; বললাম, কী যা-তা বকছ দামোদর? ম'রে গিয়ে আবার মিত্যু—ও সব কী বলছ?"

একটুখানি হেসে দামোদর বললে, "ঠিকই বলছি বিহুবাবু, যা-তা বলছি নে। আজ সাঝের বেলা আমার মিত্যু ঘটেছে। এই যে দেহো দেখচো, এ ছায়া-দেহো, এতে পদাখো নেই। একটা ঢিল ছুঁড়ে মারো, সাঁ করে দেহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে যাবে। তবে যদি বল, দাঁড় বাইচি কী ক'রে? তা ছায়া-দেহোতে শক্তি বিস্তর। এই দেখ না, কেমন সাঁ সাঁ ক'রে বেয়ে চলেছি কিন্তু এক বিন্দু ঘাম নেই।" তারপর দামোদর পুনরায় উচ্চস্বরে হেসে উঠল; বললে, "কী গেরো রে বাবা! ভুলের কাণ্ড দেখ! দেহোতে এক রত্তি মাংসই যখন নেই, তখন ঘাম বেরোবে কোথা থেকে?"

দামোদরের হয়ত ঘাম বেরোয় নি, কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। মানলামই না-হয় সে প্রেত নয়; কিন্তু মাঝ-নদীতে টেনে নিয়ে এসে এ রকম অদ্ভুত কথাবার্তা—এ তো সহজ লোকেরও নয়। চিরদিন সে স্বল্পভাষী ভালোমানুষ—আজ তার এ কি হ'লো? প্রেত যদি নাই হ'য়ে থাকে, তাহ'লে হয় পাগল হয়েছে, নয় মাতাল; অর্থাৎ হয় উন্মাদ, নয় উন্মত্ত। জলের উপর এ রকম লোকের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে ব'সে থাকা তো একেবারেই নিরাপদ নয়। এখন ভালোয় ভালোয় ডাঙায় পা ফেলতে পারলে বাঁচি।

আমায় মৌন দেখে দামোদরের মনে হ'লো, আমি তার কথায় হয়তো সন্দেহপর হয়েছি। বললে, "আপনি যদি পিত্যয় না যান বিহুবাবু, চলুন তা হ'লে নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে যাই, দেখবেন পাকুড়গাছতলায় আমার দেহোটা নীল্‌চে মেরে প'ড়ে আছে। উঃ, কী সর্বোনেসে সাপই রে বাবা! একেবারে জাত শঙ্খচূড়! ফোঁ ক'রে মারলে ছোবল, আর সমস্ত দেহোর মধ্যে যেন সাত শো বিদ্যুতের শিখে খেলে গেল! তারপর সে কী জ্বলুনি বিহুবাবু, সমস্ত শরীরে যেন জলবিছুটি ঘ'ষে দিয়েছে। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়, মিনিট পাঁচেক পরেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দামোদরের দেহোর শিয়রে বসলাম। কেদার আর বিশে গেছে সাপের রোঝা গণশাকে ডাকতে। গণশা তো গণশা, গণশার বাপ স্বয়ং শিব এলেও এখন আর কিছু হচ্ছে না। তা ছাড়া দেহো-কারাগার থেকে একবার যখন বেরোতে পেরেছি আর কি সেঁদোতে আছে? কী বলুন বিহুবাবু?"

কী যে বলব তা তো জানি নে,—মানুষের সঙ্গে, না, প্রেতের সঙ্গে কথা

কচ্ছি তাই যখন ঠিক জানি নে। তথাপি যথাসাধ্য সাহস সঞ্চয় ক'রে স্খলিত কণ্ঠে বললাম, "তুমি যে কথা বললে তা লাখ কথার এক কথা, ওর ওপর আর কথা নেই।" প্রেতই হোক আর প্রমত্তই হোক প্রসন্ন হবে মনে ক'রে এ কথা বললাম।

ঘাট সমীপবর্তী হয়েছিল, নৌকা তটে লাগতেই ডাঙার উপর লাফিয়ে পড়লাম। মৃত্তিকার স্পর্শ পেয়ে সে যে কী আশ্বাস, কী আনন্দ, তা অনুমান করাই ভালো। ইচ্ছা হলো গৃহের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিই, কিন্তু পারানির পয়সা? দামোদরের দিকে ফিরে বললাম, "দামোদর, তোমার পারানির পয়সা নাও।"

দামোদর বললে, "ও থাক্ বিনুবাবু, পরে যা হয় হবে, আপনি এখন বাড়ি যান।"

গৃহে পৌঁছানোর পর সহসা আমাকে দেখে একটা হর্ষধ্বনি উঠল বটে, কিন্তু আমি যখন আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলতে আরম্ভ করলাম তখন অপরিসীম বিস্ময়ে এবং কৌতূহলের মধ্যে সে হর্ষধ্বনি নিমেষের মধ্যে লুপ্ত হ'লো। গল্প শেষ হ'লে কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে অবিশ্বাস, কেউ বললে— পরিশ্রান্ত হ'য়ে নৌকার উপর ঘুমিয়ে প'ড়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কেউ বা বললে— গৌরমোহনবাবুর মৃত্যুজনিত মনের মধ্যে বিভ্রম উপস্থিত হয়েছিল। আমি বললাম, "দেখ, দামোদর যদি পাগল অথবা মাতাল না হ'য়ে থাকে তা হ'লে ব্যাপারটা যে নিতান্ত সহজ নয়, এ কথা আমি নিশ্চয় ক'রে বললাম। স্বপ্ন আর বিভ্রম—ও-সব বাজে কথা সিকেয় তুলে রাখো।"

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব দু-চার জন ছিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য অবিলম্বে একটা দল গঠিত হ'য়ে উঠল। অবশ্য আমিও তাতে যোগ দিলাম।

ঘাটে উপনীত হ'য়ে দেখা গেল, দামোদরের নৌকা ঘাটে বাঁধা রয়েছে, কিন্তু দামোদর কোথাও নেই। দলের মধ্যে দুজন নৌকা চালনায় পটু ছিল, তারা কালবিলম্ব না ক'রে নৌকার দড়ি খুলে ছেড়ে দিলে। আমরা লাফালাফি ক'রে নৌকায় উঠে পড়লাম। নদী উত্তীর্ণ হ'য়ে পরপারে গিয়ে দেখা গেল, অদূরে পাকুড়গাছের তলায় গোটা তিন-চার হ্যারিকেন লণ্ঠন এবং সেই আলোর মধ্যে ইতস্তত-সঞ্চরমান কয়েকটা মনুষ্যমূর্তি। দ্রুতপদে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে আমরা দেখলাম, দামোদরের দীর্ঘদেহ ভূমির উপর শয়ান, সাপের রোজা এসে যথাসাধ্য চেষ্টার পর নিষ্ফল হ'য়ে অল্পক্ষণ হলো প্রস্থান করেছে, অগত্যা দামোদরের শবদেহের সংকারের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। শুনলাম, ঠিক সন্ধ্যার পূর্বে সর্পাঘাতে দামোদরের মৃত্যু ঘটেছে।

অল্পক্ষণ তথায় অবস্থানের পর গ্রামে যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দামোদরের ভূত হওয়ার কাহিনী রাষ্ট্র

হ'য়ে সমস্ত গ্রামবাসীর মনে একটা গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, তার উপর তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন সে আতঙ্ক দারুণ দুশ্চিন্তায় পরিণত হ'ল। কখন যে কোন্ বাড়িতে সহসা উপস্থিত হ'য়ে দামোদর বৈতরণী পার হওয়ার প্রসঙ্গ আরম্ভ ক'রে দেবে, সে কথা মনে ক'রে সকলে একেবারে সিঁটিয়ে রইল।

রাত্রি বারোটার সময়ে আমার এক সহৃদয়া বউদিদি বিমলাকে আমার ঘরে দিয়ে গেলেন। যাবার সময়ে আমার কানে কানে ব'লে গেলেন, "ভূতের ভয়ে কিছুতেই বাড়ি থেকে রাত্রে আসতে চায় না। অনেক চেষ্টা ক'রে আনতে হয়েছে। ছেলেমানুষ, তুমি যেন দামোদরের গল্প-উল্প ব'লে ভয় দেখিয়ো না।" এ কথার উত্তরে আমি কিছু বললাম না, শুধু নিঃশব্দে একটু হাস্য করলাম।

হুড়কো লাগিয়ে ফিরে দেখি, আঁচল থেকে কী খুলে বিমলা আমার খাটের চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে, তারপর তাড়াতাড়ি একটা কী কাগজ আমার বালিশের তলায় গুঁজে রাখলে। কী ছড়ালে জানতে প্রবল কৌতূহল হওয়ায় ভূমি থেকে দু-চারটে তুলে দেখি, শ্বেতসরষে। কাগজটা বার ক'রে দেখি, তাতে লেখা রয়েছে—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥
ওঁ বেতালশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্বে নারসিংহেন তাড়িতাঃ॥

সর্বনাশ! এ যে একেবারে পুরাদস্তুর ভূতাপসারণের ব্যবস্থা! বিমলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "এ সব ব্যবস্থা কার জন্যে বিমলা? শুধু দামোদরের কথা মনে ক'রে, না, আমার বিষয়েও সন্দেহ ক'রে?"

সভীতিকাতর কণ্ঠে বিমলা বললে, "ও-সব কথা বলতে নেই।"

আচ্ছা, বলব না না-হয়; কিন্তু কার বলতে নেই—আমার, না, বিমলার—তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

উট-রোগ

প্রায় হাজার বৎসর আগেকার কথা। তখন প্রতিহার-বংশের পতনের ফলে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। সেই খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা সূর্যপাল খুব পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠে সাম্রাজ্য গঠন এবং প্রতিহার-বংশের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবার দিকে মন দিয়েছেন, এমন সময়ে সূর্যপালের শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দিলে।

ব্যাধি যে ঠিক কী, তা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। দক্ষিণ পায়ের একটা শিরা টন্‌টন্‌ ঝন্‌ঝন্‌ করে, বুক ধড়ফড় ক'রে, আর বাম চক্ষুটা থেকে থেকে জবাফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে। রাজবৈদ্যগণের মধ্যে কেউ বললেন—বাতব্যাধি, কেউ বললেন—হৃদ্‌রোগ, কেউ বা বললেন—মস্তিষ্কের পীড়া। উপসর্গ তেমন কিছু সাংঘাতিক নয়, কিন্তু মহারাজা দিন দিন বলহীন এবং কৃশ হ'য়ে পড়তে লাগলেন। মুখ বিস্বাদ, মেজাজ খিটখিটে, আহারে রুচি নেই, আমোদ-প্রমোদে মন সাড়া দেয় না।

রাজবৈদ্যগণ একটা পরামর্শ-সভা ক'রে স্থির করলেন যে, এ ব্যাধি আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদিত কোন ব্যাধি নয়; এ নিশ্চয় এমন একটা চোরা ব্যাধি যার উৎপত্তি-স্থল শরীরের বিশেষ কোন গুপ্ত প্রদেশে নিহিত। নিদানশাস্ত্র মথিত ক'রে যখন তার কোন হদিশ পাওয়া গেল না, তখন তাঁরা রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'লো না। মূলে কুঠারাঘাত না ক'রে শুধু শাখাচ্ছেদন করলে কি মহীরুহের বিনাশ সাধন করা যায়? রোগ বেড়েই চলল, মহারাজা সূর্যপাল ক্রমশ নির্জীব হ'য়ে পড়তে লাগলেন।

স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় মহারাণী চন্দ্রশীলা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজার আরোগ্য কামনায় তিনি কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কত যাগ-যজ্ঞ, কত গ্রহপূজা করালেন; মাদুলি এবং কবচে, নীলায় এবং পলায় মহারাজার কণ্ঠ ও বাহু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল; তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক—কিছুই বাদ গেল না; কিন্তু রোগ বিন্দুমাত্র উপশমের দিকে না গিয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। মনে হ'লো, দেবতাও বুঝি সূর্য্যপালের প্রতি বিরূপ।

রাজবৈদ্যগণের সকল চেষ্টা যখন বিফল হ'লো, তখন রাজ্যের অপরাপর খ্যাতনামা চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হ'লো। কিন্তু কেউই রাজাকে বিন্দুমাত্র সুস্থ করতে সমর্থ হলেন না; শুধু অর্থব্যয় এবং কালক্ষেপই সার হ'লো। সকলেই রাজার জীবনের বিষয়ে হতাশ হলেন; রাজা নিজেও বুঝলেন, তাঁর প্রাণপ্রদীপ নির্বাপিত হ'তে আর বেশি বিলম্ব নেই।

দুর্বল শরীরে সূর্যপাল চিকিৎসার তাড়নায় অস্থির হয়েছিলেন। অরিষ্ট, রসায়ন, তৈল, পাচন, বটিকা আর চূর্ণের উৎপীড়ন মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে কষ্টকর হ'য়ে উঠেছিল। রাজা মনে মনে একটা সঙ্কল্প ক'রে তাঁর প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

বল্লভাচার্য উপস্থিত হ'লে রাজা বললেন, "মন্ত্রীমশায়, আজ থেকে আমি সকল চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দিলাম। বৈদ্যরা একেবারে অকর্মণ্য বাজে লোক, বিদ্যে বুদ্ধি কারও কিছু নেই। সহজ রোগ হ'লে তারা হয়তো সময়ে সারাতে পারে, কিন্তু কঠিন রোগের তারা কেউ নয়। শুধু আমার রাজ্যে নয়, আপনি রাজ্যে-রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিন, যে-বৈদ্য আমাকে রোগমুক্ত করতে পারবে তাকে লক্ষ

স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব, কিন্তু চিকিৎসারম্ভের তিন মাসের মধ্যে রোগ সারাতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে। এ শর্তে যদি কেউ আসে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে একজন যথার্থ শক্তিশালী চিকিৎসক। ঘোষণাপত্রে সবিস্তারে আমার রোগ-লক্ষণ বর্ণনা করবেন, যাতে যারা আসবে প্রস্তুত হ'য়েই যেন আসতে পারে।"

রাজার কথা শুনে বল্লভাচার্য অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে বললেন, "মহারাজ, এ কিন্তু বস্তুত চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেওয়াই হ'লো। কারণ অতি বড় ক্ষমতাশালী চিকিৎসকও প্রাণদণ্ডের ভয়ে আপনার চিকিৎসা করতে সাহস করবে না।"

রাজা তখন মরিয়া হয়েছেন; বললেন, "তা না করুক। এ রোগে আমার মৃত্যু অনিবার্য তা তো বুঝতেই পারছি,—দলন-মলন আর অরিষ্ট-রসায়নের হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রে কয়েক দিন একটু শান্তি ভোগ ক'রে মরতে চাই।"

এ সঙ্কল্প থেকে রাজাকে নিরস্ত করবার জন্যে বল্লভাচার্য, মহারাণী চন্দ্রশীলা, অমাত্যবর্গ, এমন কি রাজগুরু পর্যন্ত অনেক অনুরোধ-উপরোধ সাধ্য-সাধনা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হলো না। রাজা একেবারে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

অগত্যা বল্লভাচার্য চতুর্দিকে ঘোষণাপত্র জারি করলেন। উত্তরে গান্ধার, কাশ্মীর; পশ্চিমে সিন্ধুদেশ; দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, মহাকোশল, চালুক্য রাজ্য; পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, চম্পা রাজ্য—কোন দেশই বাদ পড়ল না। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট লোভনীয় পুরস্কার বটে, কিন্তু জীবনও তো তার চেয়ে কম লোভনীয় বস্তু নয়! বড় বড় চিকিৎসক পরাভূত হয়েছেন শুনে কোন চিকিৎসকই সূর্যপালের চিকিৎসা করতে অগ্রসর হন না। এইরূপে বিনা চিকিৎসায় প্রায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত হ'লো। রাজার জীবনীশক্তি আরও ক্ষীণ হ'য়ে এল।

সেই সময়ে মহারাজা সূর্যপালের রাজধানী সিংহগড় থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে চৈতসা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে অতিশয় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করত। অভাবের নিদারুণ তাড়নায় তাদের জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণের বিদ্যার দৌড় খুব বেশি ছিল না, কিন্তু কূটবুদ্ধিতে তার সমকক্ষ ব্যক্তি পাওয়া সত্যই কঠিন ছিল। সূর্যপালের চিকিৎসার পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ সেই ব্রাহ্মণ দম্পতিরও শ্রুতিগোচর হ'লো।

ব্রাহ্মণের নাম দেবরাজ উপাধ্যায়। কয়েক দিন নিরবসর চিন্তার পর হঠাৎ একদিন দেবরাজ তার স্ত্রীকে বললে, "ব্রাহ্মণী, তুমি কিছুদিন ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কোনও রকমে সংসার চালাও, আমি সিংহগড়ে চললাম মহারাজা সূর্যপালের ঘোষিত এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে।"

দেবরাজের কথা শুনে তার স্ত্রী বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "ও মা, সে কি কথা গো! কত বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ হার মেনে গেল মহারাজের রোগ সারাতে, আর তুমি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জানো না, তুমি চললে মহারাজকে সারিয়ে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে?"

দেবরাজ বললে, "বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ যখন হার মেনে গেছে তখন বুঝতেই পারছ—এ রোগ শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় সারবার নয়। অর্থের এই নিদারুণ অভাব আর সহ্য হয় না ব্রাহ্মণী, ভাগ্য পরীক্ষা করতে চললাম। অর্থ পাই তো হাসতে হাসতে ঘরে ফিরব, নইলে এ ঘৃণিত জীবন শেষ হওয়াই ভালো।"

ব্রাহ্মণী অনেক বোঝালে, অনেক কান্নাকাটি করলে ; বললে, "ওগো, এ তো তুমি আত্মহত্যাই করতে চলেছ।" কিন্তু দেবরাজ কোনও কথাই শুনলে না, একটি কঙ্কালসার মৃতকল্প টাট্টু ঘোড়া সংগ্রহ ক'রে তার পিঠে চ'ড়ে সিংহগড় অভিমুখে যাত্রা করলে।

পথে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে করতে চতুর্থ দিন দিবা তৃতীয় প্রহরকালে দেবরাজ সিংহ-গড়ের পশ্চিম তোরণ অতিক্রম ক'রে রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই মাজা-ভাঙা বিয়েতাজা বিচিত্র অশ্ব, এবং তদুপরি রুক্ষকেশ ধূলিধূসর বিচিত্রতর অশ্বারোহীর অপূর্ব সমাবেশ দেখে পথচারী নাগরিকগণের কৌতুক এবং কৌতূহলের অন্ত রইল না। দেখতে দেখতে দেবরাজের পিছনে জনতা জ'মে গেল। সকলেই প্রশ্ন করে—কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে, কার বাড়িতে অতিথি হবে? বিস্ময়াহত জনমণ্ডলীর কৌতূহল নিবারণের কোন প্রকার চেষ্টা না ক'রে দেবরাজ গম্ভীর বদনে সোজা রাজপ্রাসাদের অভিমুখে অশ্ব চালনা ক'রে চলল। এর পূর্বে সে দু-তিন বার সিংহগড়ে এসেছে—রাজপ্রাসাদের পথ তার অজানা নয়।

প্রাসাদের সিংহদ্বারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। প্রবেশোদ্যত দেবরাজের পথরোধ ক'রে আরক্ত নেত্রে কর্কশ কণ্ঠে সে বললে, "কোথা যাও?"

অকুতোভয়ে দেবরাজ বললে, রাজপুরীতে।"

"কার কাছে?"

"মহারাজার কাছে।"

সরোষে প্রহরী তর্জন ক'রে উঠল, "স্পর্ধা তো তোমার কম নয় দেখছি! একটা কানাকড়ির ভিখিরী, তুমি মহারাজার কাছে যাবে?—পালাও এখান থেকে, নইলে এখনই তোমাকে বন্দী করব।"

অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের কোটরপ্রবিষ্ট দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, "বন্দী করবে, না, শেষ পর্যন্ত এই কানাকড়ির ভিখিরীকে বন্দনা করবে, তা ঠিক বলা যায় না। আমি মহাচণ্ডশ্মশাননিবাসী হ্রীং-ক্রেট আখ্যাত তান্ত্রিক দেবরাজ উপাধ্যায়। ভৈরবীচক্র থেকে উঠে সোজা এসেছিলাম মহারাজকে রোগমুক্ত করতে। ঔষধ-প্রয়োগের আজ প্রশস্ত দিন ছিল, কিন্তু তুমি প্রতিবন্ধক হ'য়ে আমার গতিরোধ করলে। তুমি রাজদ্রোহী, রাজমৃত্যুকামী। তোমার বিরুদ্ধে রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত ক'রে তোমার কর্মচ্যুতির পর

তোমার স্থলে উত্তমসিংকে প্রতিষ্ঠিত করাব। আপাতত ফিরে চললাম।" ব'লে দেবরাজ লাগাম টেনে অশ্বের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

'কানাকড়ির ভিখিরী'র অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার অকস্মাৎ একটা উৎকট জটিলতায় পরিণত হওয়ায় প্রহরী একেবারে হকচকিয়ে গেল। মহারাজার চিকিৎসার প্রতিবন্ধক হওয়ার গুরু অপরাধের বিরুদ্ধে দেবরাজ কর্তৃক রাজসমীপে অভিযোগ আনা এবং পরিণামে তার কর্মচ্যুতি ও অজানা অচেনা উত্তমসিংহের নিয়োগ—সমস্ত ব্যাপারটাকে ষোল আনা সন্দেহ অথবা উপেক্ষা করবার মতো তার মনের জোর রইল না। ওদিকে এক-পা এক-পা ক'রে দেবরাজ ফিরে চলেছে; দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে তাকে সন্ধান ক'রে বার করা কঠিন হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প্রহরী ছুটে গিয়ে দেবরাজের ঘোড়ার লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে এসে, কী বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে, বললে, "শোন। উত্তমসিং কে?"

অবলীলার সহিত দেবরাজ বললে, "মধ্যমসিংয়ের বড় ভাই।"

বিস্মিত হ'য়ে প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, "মধ্যমসিং আবার কে?"

দেবরাজ বললে, "উত্তমসিংয়ের ছোট ভাই।"

সমস্যা কিছুমাত্র মন্দীভূত হলো না। এক মুহূর্ত চিন্তার পর প্রহরীর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, মান-মর্যাদা লজ্জা-সঙ্কোচের অনুরোধে অন্ন-বস্ত্রের পাকা ব্যবস্থাকে সংশয়াপন্ন করার মতো নির্বুদ্ধিতা আর নেই। তা ছাড়া, তান্ত্রিকদের প্রতি মনে মনে তার উৎকট ভীতি ছিল; সুতরাং দেবরাজের প্ররোচনায় রাজাদেশে তার কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কাও যে মনের মধ্যে উদিত হয় নি তা নয়। মস্তক হ'তে শিরস্ত্রাণ উন্মোচিত ক'রে দেবরাজের সম্মুখে রেখে যুক্তকরে সে বললে, "উত্তমসিং-মধ্যমসিংদের আমি জানি নে। কিন্তু আপনি আমাকে অধমসিং ব'লে জানবেন। আমি আপনাকে বুঝতে পারি নি প্রভু। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।"

দেবরাজ ধূর্ত ব্যক্তি; কোথায় কোন্ জিনিস শেষ এবং কোন্ জিনিস আরম্ভ করা উচিত তা সে বিলক্ষণ বোঝে; বললে, "তবে আমাকে মহারাজার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

প্রহরী বললে, "মহারাজার কাছে আপনাকে পাঠাবার অধিকার আমার নেই। প্রধান মন্ত্রীমশায় এখন রাজপ্রাসাদে মন্ত্রণাগারে আছেন, আমি আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা করবেন।"

দেবরাজ বললে, "বেশ, তাই দাও।"

অদূরে একজন টহলদার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাকে ডেকে প্রহরী সব কথা বুঝিয়ে ব'লে তার সঙ্গে দেবরাজকে প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্যের নিকট পাঠিয়ে দিলে।

একজন তান্ত্রিক চিকিৎসক রাজার চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হয়েছে—টহলদারের মুখে অবগত হ'য়ে সকৌতূহলে বল্লভাচার্য তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের আকৃতি দেখে কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

দেবরাজকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বল্লভাচার্য বললেন, "আপনি মহারাজার রোগ সারাবেন ?"

দেবরাজ অসংকোচে বললে, "হ্যাঁ, সারাব বইকি।"

বল্লভাচার্য বললেন, "কিন্তু না সারাতে পারলে কি তার ফল তা জানেন তো ?"

দেবরাজ বললে, "সব জানি মন্ত্রীমশায়, এই দীর্ঘ পথ এত কষ্ট ক'রে নিজের জীবন দিতে আসি নি, পরের জীবন দিতেই এসেছি। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, এখান থেকে আমি অর্থোপার্জন ক'রেই যাব, প্রাণ দিয়ে যাব না।"

বল্লভাচার্য বললে, "ভগবানের অনুগ্রহে আপনি যেন এখান থেকে অর্থোপার্জন ক'রেই যান।"

দেবরাজ বললে, "কারুর অনুগ্রহের দরকার নেই মন্ত্রীমশায়, সে কার্য আমি নিজের বিদ্যেবুদ্ধির জোরেই ক'রে যাব।"

আরও ক্ষণকাল দেবরাজের সহিত আলাপ-আলোচনা ক'রে বল্লভাচার্য রাজসমীপে উপস্থিত হলেন।

এতদিন পরে একজন চিকিৎসক চিকিৎসা করবার জন্য উদ্যত হয়েছে শুনে রাজা উৎফুল্ল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "শর্তের কথা জানে তো ?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সম্পূর্ণ জানে। মহারাজকে সারাতে পারবে, সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কী জাতি ?"

বল্লভাচার্য বললেন, "ব্রাহ্মণ। তান্ত্রিক।"

বল্লভাচার্যের কথায় উৎফুল্ল হ'য়ে রাজা বললেন, "তান্ত্রিক ? তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ওষুধ দেবে না-কি ?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সেই রকমই তো বলে।"

রাজা বললেন, "সে কথা ভালো। ভেষজ-শক্তির সঙ্গে মন্ত্র-শক্তির যোগ হ'লে উপকার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।"

বল্লভাচার্য বললেন, "উপকার হ'লে তো আমরা বেঁচে যাই মহারাজ, কিন্তু তার চেহারা দেখলে একটুও শ্রদ্ধা হয় না।"

রাজা বললেন, "তা হোক। তান্ত্রিকদের চেহারা দেখতে ভালো হয় না। ডাকান তাকে এখনই আমার কাছে।"

তথাপি দেবরাজ এলে তার মূর্তি দেখে রাজার উৎসাহ অনেকটা ক'মে গেল; বললেন, "আমাকে তুমি সারাতে পারবে ?"

দেবরাজ বললেন, "নিশ্চয় পারব।"

রাজা বললেন, "তিন মাসের মধ্যে?"

রাজার প্রতি তর্জনী আস্ফালিত ক'রে দেবরাজ বললে, "তিন মাস বলছেন কি মহারাজ! তিন দিনে আপনাকে সারিয়ে দোব।"

রাজা বললেন, "তুমি পাগল।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, এ পর্যন্ত যাঁরা আপনার চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন?"

রাজা বললেন, "না, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন না।"

করজোড়ে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, অপরাধ মার্জনা করবেন,—সুস্থ মস্তিষ্কের লোকেরা যখন কোন সুবিধেই করতে পারে নি, তখন পাগলকেই একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন না। আর, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন যে ব্যক্তির মহাচণ্ড শ্মশানে কুম্ভক যোগের দ্বারা শিববিন্দুর চতুর্দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কাটে, সে পাগল নয় তো কি? আমি আপনার কাছে প্রাণ দিতে আসি নি মহারাজ। মহাচণ্ড শ্মশানে উৎকটভৈরবের যে মন্দিরগুহা নির্মাণ করব, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে তার অর্থ সংগ্রহ করতে। আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে ব'লে রাখছি, আজ থেকে চার দিনের দিন এই পাগলের হাতে গুনে গুনে এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা আপনাকে দিতে হবে।"

উৎসাহিত হ'য়ে রাজা বললেন, "তা যদি হয় তো এক লক্ষ নয়, দু' লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দোব; কিন্তু তা যদি না হয়, তা হ'লে—"

সূর্যপালকে শেষ করবার অবসর না দিয়ে দেবরাজ বললে, "এ বিষয়ে আর 'কিন্তু' নেই মহারাজ, একেবারে নিশ্চয়। আজ সন্ধ্যাবেলা আমি ওষুধ নিয়ে আসব আর সেই সময়ে ঔষধ সেবনের নিয়ম আপনাকে ব'লে দোব। আপাততঃ, আপনার রাশি কী আমাকে বলুন।"

সূর্যপাল বললেন, "সিংহ রাশি।"

দেবরাজ বললে, "আর মহারাণীর?"

সূর্যপাল বললেন' "বৃষ রাশি।"

নিজের বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, আপনি দক্ষিণ চক্ষু বন্ধ ক'রে বাম চক্ষু দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে একটু তাকিয়ে থাকুন।"

সূর্যপাল তাই-ই করলেন। কী করেন, তান্ত্রিক চিকিৎসকের হয়তো কোন মন্ত্র-প্রক্রিয়াই বা হবে।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে দেবরাজ বললে, "এবার ঠিক উল্টো—আপনি দক্ষিণ, আমি বাম।"

সূর্যপাল বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন।

দেবরাজ বললে, "হয়েছে, এবার দুই চোখ খুলুন। কোন ভয় নেই মহারাজ,

তিন দিনেই আপনাকে সুস্থ ক'রে দোব। , তবে রোগ-শান্তির পর 'ভুইস্ত দানং রবিনন্দনস্তু' করতে হবে।"

সকৌতূহলে রাজা বললেন, "সে কি?"

দেবরাজ বললে, "সে অতি সামান্য ব্যাপার, যথাকালে জানতে পারবেন। এখন আমি চললাম, সন্ধ্যার সময়ে আসব।"।

রাজা বললেন, "ঔষধ-সেবনের নিয়ম পালনের কথা বলছিলে, নিয়ম খুব কঠিন না-কি?"

দেবরাজ বললে, "আজ্ঞে না মহারাজ, অতি সহজ নিয়ম, শুনলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু কঠিনই হোক আর সহজই হোক, নিয়ম পালন না করলে ওষুধে উপকার হবে কেন বলুন?"

রাজা বললেন, "সে তো সত্যি কথা। তোমার কোন চিন্তা নেই, নিয়ম পালন আমার দ্বারা বর্ণে বর্ণে হবে।"

প্রসন্নমুখে দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হ'লো। বিশেষতঃ এই চিকিৎসায় যখন আমারও জীবন-মরণের কথা জড়িত।"

রাজা বললেন, সত্যিই তো।" তার পর বল্লভাচার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে আহার এবং বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

"যে আজ্ঞে" ব'লে দেবরাজকে নিয়ে বল্লভাচার্য প্রস্থান করলেন।

সন্ধ্যার পর রাজ-অন্তঃপুরে রাজা ও রাণী দেবরাজেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময় একজন পরিচারিকা এসে সংবাদ দিলে—দেবরাজ এসেছে।

রাজা বললেন, "নিয়ে এস এখানে।"

একটু পরেই পরিচারিকার সহিত দেবরাজ প্রবেশ করলে। হাতে তার স্বর্ণ পাত্রে ঈষৎ লালচে রঙের খানিকটা তরল পদার্থ। বলা বাহুল্য, স্বর্ণ পাত্রটি রাজভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত, এবং পাত্রের ঔষধ সাধারণ লালরঙ-মিশ্রিত খাঁটি জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দেবরাজকে দেখে রাজা ও রাণী আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। মহারাণী চন্দ্রশীলা ভক্তিভরে দেবরাজকে প্রণাম করলেন।

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে দেবরাজ বললে, "জয় হোক্ মহারাণী মহারাজার!" তার পর স্বর্ণ পাত্রটি চন্দ্রশীলার হাতে দিয়ে বললে, "মহারাজ, আপনার ওষুধ এনেছি।"

রাজা বললেন, "ওষুধ খাবার নিয়ম কী বলুন?"

দেবরাজ বললে, "আজ থেকে ঔষধ-সেবনের তিন রাত্রি আপনি মহারাণীকে আপনার দক্ষিণ পাশে নিয়ে এক পালঙ্কে পূর্ব শিয়রে শয়ন করবেন। এই পাত্রটি সমস্ত রাত পালঙ্কের ঈশান কোণে রাখা থাকবে। প্রত্যূষে উঠে মহারাণী বাসি

কাপড়ে আপনার হাতে ওষুধ দেবেন। আপনিও বাসি কাপড়ে পূর্বমুখে ব'সে সমস্ত ওষুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। দিনের মধ্যে একবার মাত্র ওষুধ খাওয়া। আবার কাল সন্ধ্যায় যে ওষুধ দিয়ে যাব, পরশু প্রত্যুষে তা খাবেন।"

রাজা বললেন, "মাত্র এই? আর কোন নিয়ম নেই?"

দেবরাজ বললে, "আর একটি মাত্র নিয়ম আছে। নিদিধ্যাসনে দেখা গেল, আপনার এ ব্যাধির মধ্যে উষ্ট্রিকা দোষ আছে,—ওষুধ খাবার সময় আপনি কদাচ উট মনে করবেন না। উট মনে করলে উপকার তো হবেই না, উল্টে অপকার হবে। উট মনে পড়লে সেদিন আর ওষুধ খাবেন না।"

সকৌতূহলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "উট কী?"

দেবরাজ বললে, "এই—জন্তু উট। হাতী, ঘোড়া, উট—বলে না? সেই উট। লম্বা গলা, পিঠে কুঁজ।"

রাজা বললেন, "অত ক'রে বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। আমার নিজের উটশালাতেই তো হাজারো উট আছে।" তার পর এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা ক'রে বললেন, "না, না, উট মনে করব কেন? উট মনে করবার কী কারণ আছে!"

দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হবে। তা হ'লে তিন দিনে আরাম। তা যদি না হয় তা হ'লে আমি নিজে গিয়ে শূলে চ'ড়ে বসব মহারাজ।"

দেবরাজের কথা শুনে রাজা ও রাণী উভয়েই খুব সন্তুষ্ট হলেন। আরোগ্য-লাভ সম্বন্ধে তাঁদের মনের মধ্যে প্রবল আশা দেখা দিলে।

পরদিন প্রত্যুষে ঈশান কোণ থেকে ঔষধের পাত্রটি নিয়ে মহারাণী চন্দ্রশীলা সযত্নে স্বামীর হাতে দিলেন। পূর্বদিকে মুখ ক'রে সূর্যপাল প্রস্তুত হ'য়েই ব'সে ছিলেন, ইষ্টদেবতা স্মরণ ক'রে ঔষধ পান করতে গিয়ে পাত্রটা মুখে ঠেকিয়েই ভূমির উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন।

উৎকণ্ঠিত স্বরে চন্দ্রশীলা বললেন, "কী হলো? খেলেন না কেন মহারাজ?"

অপ্রতিভ মুখে সূর্যপাল বললেন, "উট মনে প'ড়ে গেল।"

শুনে রাণী শিউরে উঠলেন; বললেন, "আগে থেকেই মনে পড়ছিল, না, খেতে গিয়ে মনে পড়ল?"

রাজা বললেন, "খেতে গিয়ে মনে পড়ল।"

নিঃশব্দে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রাণী বললেন, "কী আর করবেন বলুন, এক দিন পেছিয়ে গেল। কাল আর মনে করবেন না।"

মনে মনে কী ভাবতে ভাবতে রাজা বললেন, "না, তা আর করব না।"

সন্ধ্যাবেলা ওষুধ দিতে এসে সব কথা শুনে দেবরাজ মুখ গম্ভীর করলে। বললে, "মহারাজ, এত ক'রে যে কথাটা নিষেধ ক'রে দিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই ক'রে বসলেন?"

অপ্রতিভ হ'য়ে সূর্যপাল বললেন, "কী করি বল? ইচ্ছে ক'রে করেছি কি? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল।"

দেবরাজ বললে, "তার আগেই টপ্ ক'রে খেয়ে ফেললে তো হ'তো।"

অন্যমনস্কভাবে রাজা বললেন, "কাল না-হয় তাই করব।" তার পর মনে মনে ক্ষণকাল কী চিন্তা ক'রে বললেন, "দেখ দেবরাজ, এ নিয়মটা তুমি যদি আমাকে না জানাতে তা হ'লে এমনি-এমনিই পালন হ'য়ে যেত। জানিয়েই অসুবিধেয় ফেলেছ।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেবরাজ বললে, "বলেন কি মহারাজ! এর উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে. না জানিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারি কি? হঠাৎ যদি আপনি উটের কথা মনে ক'রে ফেলেন, তা হ'লে?"

রাজা মৃদু ভাবে আপত্তি করলেন; বললেন "না, না, হঠাৎ উটের কথাই বা মনে করতে যাব কেন?"

দেবরাজ বললেন, "এই যে আপনি বললেন, আপনার উটশালায় হাজারো উট আছে?"

রাজা বললেন, "কী গেরো! শুধু কি আমার উটশালাই আছে। হাতীশালা নেই? ঘোড়াশালা নেই?"

দেবরাজ বললে, "কিন্তু মহারাজ, উটশালাও তো আছে।"

রাজা আর তর্ক করলেন না—পরদিন নিয়ম পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

পরদিনও কিন্তু একই ব্যাপার ঘটল, মুখে ঠেকিয়েই ঔষধের পাত্র নামিয়ে রাখতে হ'লো, উট মনে পড়ায় ঔষধ খাওয়া চলল না। তৎপরদিন থেকে ঔষধের পাত্র স্পর্শ করাও চলল না, আগে থেকেই উটের কথা মনে পড়তে থাকে।

মহারাণী চন্দ্রশীলা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। ওষুধ খাবার সময় যাতে উটের কথা রাজার মনে না পড়ে সে-জন্য তিনি রাজাকে নানা প্রকারে অন্যমনস্ক করতে চেষ্টা করেন; মিথ্যা ক'রে বলেন, "মহারাজ, আপনার হাতীশালায় আজ লছমনদাসের ভারি অসুখ, এক কুটো ডাল-পালা মুখে দেয় নি আর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে খালি শুঁড় নাড়ছে।"

লছমনদাস রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হস্তী। কিন্তু শাক দিয়ে কখনও মাছ ঢাকা চলে? লছমনদাসের দীর্ঘ আন্দোলিত শুঁড় রাজার মনে চুনভিনাথের লম্বা গলা রূপে উঁচু হ'য়ে দেখা দেয়,—রাজা ধীরে ধীরে অ-সেবিত ঔষধের পাত্র ভূমিতলে নামিয়ে রাখেন। চুনভিনাথ রাজার সবচেয়ে আদরের উট—খাস আরব দেশ থেকে বহু যত্নে এবং বহু অর্থ-ব্যয়ে সংগ্রহ করা।

মহারাণী চন্দ্রশীলার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। মনে মনে বলেন,

'তোমার অপরাধ কী মহারাজ। আমার নিজেরই মন ক্রমশঃ এক উটশালায় পরিণত হয়েছে।'

এমনই ভাবে মাসাধিক কাল গত হ'লো। সূর্যপালের পেটে এক বিন্দু ঔষধ প্রবেশ করল না, ওদিকে রাজার-হালে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারে দেবরাজের শরীর দিন দিন কান্তিমান হ'য়ে উঠেছে। ঔষধ দিতে এসে দেবরাজ গজ গজ করে; বলে, "মহারাজ, মনে করেছিলাম দিন চারেকে কার্য শেষ ক'রে বাড়ি ফিরব, কিন্তু আপনি এমনই ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছেন যে, দেখতে দেখতে এক মাস হ'য়ে গেল। ও-দিকে বাড়িতে কত প্রয়োজনীয় কাজ পণ্ড হচ্ছে।"

রাজা কিছু বলেন না, বেকায়দায় প'ড়ে গেছেন, মনের আক্রোশ মনের মধ্যে চেপে চুপ ক'রে থাকেন।

আর দিন পনের পরে কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে। বল্লভাচার্যকে আর দেবরাজকে রাজা ডাকিয়ে পাঠালেন।

উভয়ে উপস্থিত হ'লে দেবরাজের প্রতি সক্রোধ নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে রাজা বললেন, "দেবরাজ, তুমি একটি বিষম ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, জোচ্চোর।"

কাঁচুমাচু মুখে করজোড়ে দেবরাজ বললে, "কেন মহারাজ?"

কঠোর কণ্ঠে রাজা বললেন, আবার চালাকি করছ? কেন, তা জানো না।"

দেবরাজ কোন কথা বললে না, করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আমার আগেকার রোগ সেরে গেছে, তার বিন্দু-বিসর্গও আর নেই। কিন্তু তার জায়গায় নতুন যে রোগ সৃষ্ট হয়েছে, তার জন্যে পাগল হ'য়ে যাবার মতো হয়েছি। আগেকার রোগ এর চেয়ে ভালো ছিল। তার শেষ ছিল মৃত্যুতে, কিন্তু এ রোগে বেঁচে থেকে দিবারাত্র মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি।"

রাজার কাতরোক্তি শুনে দেবরাজের হাসি পেয়েছিল। অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে সে বললে, "কী রোগ মহারাজ?"

রাজা সজোরে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "হারামজাদা, আবার ন্যাকামি করছ! উট-রোগ তা তুমি জানো না?"

শুনে মন্ত্রী বল্লভাচার্য চমকে উঠলেন; বললেন, "বলেন কি মহারাজ! উট-রোগ?"

রাজা বললেন, "হ্যাঁ, উট-রোগ। ওই নচ্ছারটা একটা আস্ত উট আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছে। ঘুমিয়ে পর্যন্ত নিস্তার নেই, স্বপ্ন দেখি উটের। ঘুম ভাঙলে মনে হয়, উট। উট ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। জেগে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ মনের মধ্যে উট খট্‌খট্ ক'রে বেড়িয়ে বেড়ায়।" তারপর দেবরাজের দিকে আরক্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "বার কর্ এ উট আমার মনের ভিতর থেকে, নইলে তোকে শূলে চড়িয়ে, আগুনে পুড়িয়ে মারব।

মনের অপরিসীম উল্লাস অতি কষ্টে মনের মধ্যে দমন ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, প্রথম দিনেই তো বলেছিলাম যে নিদিধ্যাসনে দেখা গিয়েছিল আপনার রোগে উষ্ট্রিকা দোষ—"

দেবরাজকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজা চিৎকার ক'রে উঠলেন, "চোপ রও পাষণ্ড! ফের যদি উষ্ট্রিকা দোষের কথা উচ্চারণ করছে, এক্ষুণি দু খণ্ড করব তোমাকে।" ব'লে কোষ থেকে অসি নিষ্কাসিত করলেন।

দেবরাজ দেখলে, আর বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই। করজোড়ে বললে, "দোহাই মহারাজ! দয়া ক'রে ও-কার্যটি করবেন না। প্রাণটা দেহে বর্তমান থাকলে উটের যা-হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারব, কিন্তু না থাকলে উটকে কোন মতেই বার করতে পারব না। এর অতি সহজ প্রতিকার আছে, অভয় দেন তো নিবেদন করি।"

রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কী?"

দেবরাজ বললে, "আপনার পায়ের শির তো আর টন্‌টন্ করে না?"

রাজা বললেন, "না।"

"বুক ধড়ফড় করে না?"

"না।"

"চোখ লাল হয় না?"

"না।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, তা হ'লে তো আপনার আসল রোগ একেবারে সেরে গিয়েছে। আপনার প্রতিশ্রুত দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমাকে বিদায় করুন, তা হ'লে আপনার মন থেকে বেরিয়ে এসে উটও আমার পিছনে পিছনে খট্‌খট্ করতে করতে চ'লে যাবে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে রাজা বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। মন্ত্রীমশায়, এই শয়তানটাকে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে লাথি মেরে বিদায় করুন।"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এর এক ফোঁটা ওষুধ আপনার পেটে গেল না, আর দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা একে দিতে বলছেন?"

রাজা বললেন, "এই সর্বনেশে লোককে আর একদিনও আমাদের রাজ্যে রাখবেন না। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে শেষ পর্যন্ত ও আপনার মনে হাতী ঢুকিয়ে ছাড়বে। তখন চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওকে বিদায় করতে হবে।"

এই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক কথা শোনবার পর মন্ত্রী আর দ্বিরুক্তি করলেন না, দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

সেই বিপুল বহুমূল্য অর্থ ষোলখানা মজবুত বোরায় পুরে আটটা ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী রক্ষীর দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে প্রফুল্লমুখে দেবরাজ নিজের সেই রাজা-ভাঙা ঘোড়ার উপর সমাসীন হ'য়ে চৈতসা অভিমুখে

যাত্রা করলে। বলা বাহুল্য, রাজবাড়ির পুষ্টিকর দানা-পানির গুণে দেবরাজের সেই বিয়ে-ভাজা ঘোড়াও অনেকটা বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

রাত্রে মহারাণী চন্দ্রশীলা পূর্বের মত রাজার বাম পার্শ্বে শয়ন করলেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর সূর্যপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, কাল রাত্রে আপনার সুনিদ্রা হয়েছিল তো?"

প্রসন্নমুখে রাজা বললেন, "হাঁ, সমস্ত রাত।"

"স্বপ্ন দেখেছিলেন?"

"দেখেছিলাম।"

সভয়ে মহারাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের স্বপ্ন?"

সহাস্যমুখে রাজা বললেন, "উটের স্বপ্ন একেবারেই নয়; শুধু তোমার স্বপ্ন।"

সূর্যপালের কথা শুনে লজ্জায় এবং আনন্দে মহারাণীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। মনে মনে ভাবলেন, উটটা তা হ'লে সত্য সত্যই দেবরাজের সহিত প্রস্থান করেছে।

[প্রচলিত প্রাচীন কাহিনীর ছায়াবলম্বনে]

বর্ষা-দিনের কাব্য

বেলা তখন তিনটা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে রঘুনাথ ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে। সাড়ে চারটার সময় ভবানীপুরে এক বন্ধুর গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ। পথে অন্য একটা কাজ সেরে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হ'তে হবে।

ভাদ্র মাস। বর্ষাটা এ বৎসর পিছন দিকেই প্রবল হ'য়ে নেবেছে। বাড়ি থেকে বাহির হবার পূর্বেই পূর্বদিকের আকাশে জল-ভরা ঘন মেঘ দেখা দিয়েছিল। অবিলম্বে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখে রঘুনাথের মাতা জোর ক'রে রঘুনাথের হাতে একটি ছাতা দিয়েছিলেন। কারণ, আধুনিক কালের অধিকতম তরুণদের মতো রঘুনাথেরও সুতীব্র ছাতা-বিদ্বেষ ছিল; রৌদ্র এবং বৃষ্টির অসুবিধা অপেক্ষা ছাতা বহন ক'রে বেড়ানোর দুঃখকে সে অনেক বেশি পীড়াদায়ক ব'লে মনে করে। তা ছাড়া, তুচ্ছ সুখ-সুবিধার জন্য একটা জটিল এবং অপুরুষোচিত যন্ত্রের দ্বারা নিজের দেহকে বিড়ম্বিত ক'রে বেড়ালে দুঃখ-সুখ-নিরপেক্ষ সুদৃপ্ত তারুণ্যের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করা হয় ব'লে তার ধারণা। ছাতা নিতে সে যথেষ্ট আপত্তি করেছিল, কিন্তু জননীর অনুরোধ শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারে নি।

তাই কি ছোটখাট ছাতা? ছাব্বিশ ইঞ্চি তো বটেই, হয়তো আটাশ ইঞ্চিই বা হবে। মেঘ এবং ছাতাকে মনে মনে অভিসম্পাত দিতে দিতে রঘুনাথ ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে উপস্থিত হলো।

ক্ষণকাল পরে অদূরে একটা ট্রাম দেখা দিলে—শ্যামবাজার থেকে আসছে। কিন্তু ট্রাম-স্টপে থামবার কিছু পূর্বেই চড়চড় ক'রে বৃষ্টি এসে পড়ল। অগত্যা রঘুনাথকে ছাতা খুলতে হলো। উঃ! কি টাউস ছাতা! চারজন লোককে আশ্রয় দিতে পারে এত বড়!

ট্রাম যখন রঘুনাথের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। পথে রঘুনাথ ভিন্ন দ্বিতীয় কোনও আরোহী ছিল না। ছাতা বন্ধ ক'রে ট্রামে উঠতে গেলে জামা-কাপড় একেবারে ভিজে যাবে, তাই সে স্থির করলে ফুটবোর্ডে উঠে দাঁড়িয়ে তারপর ছাতা বন্ধ করবে। ট্রামের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে কিন্তু সে ট্রামে উঠতে পারলে না,—ঠিক তার সম্মুখে আঠারো-উনিশ বছরের একটি তরুণী মেয়ে বাঁ হাতে চার-পাঁচখানা বই আর খাতা নিয়ে ট্রাম থেকে টপ ক'রে নেবে পড়ল; তারপর পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হবার অসুবিধার জন্যই হোক, অথবা আত্মরক্ষার অবুঝ প্রবৃত্তি বশতঃই হোক, একেবারে সোজা রঘুনাথের ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক পরিণতির জন্য রঘুনাথ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; কী করা উচিত হঠাৎ স্থির করতে না পেরে মেয়েটির ডান হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বিকল্পতার সহিত ভিজতে লাগল।

ছাতা হাতে নিয়ে চকিত হ'য়ে মেয়েটি বললে, "এ কী!"

পাশ থেকে মুখ নিচু ক'রে মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে দেখে রঘুনাথ বললে, "ছাতা নিশ্চয়ই।"

"না, তা বলছি নে—"

"যা বলছেন ফুটপাথে উঠে বলুন, মোটর আসছে।"

হর্ন দিতে দিতে সবেগে একটা বৃহৎ ট্যাক্সি একেবারে নিকটে এসে পড়েছিল, ঘটনা-বিহ্বলতা বশতঃ উভয়েই সময়মতো তেমন খেয়াল করে নি। তা ছাড়া, মেয়েটির মনোযোগের বোধ হয় ষোল আনাই বৃষ্টি, রঘুনাথ এবং রঘুনাথের সুবৃহৎ ছাতার মধ্যেই নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল। সজোরে মেয়েটির বাম বাহু চেপে ধ'রে হিড়হিড় করে রঘুনাথ তাকে ফুটপাথে টেনে আনলে, এবং পর-মুহূর্তেই জল ছিটোতে ছিটোতে সেই বৃহৎ মোটরখানা হুস ক'রে বেরিয়ে গেল।

রঘুনাথ বললে, "মাফ করবেন, অমন ক'রে আপনাকে টেনে আনা ভিন্ন উপায় ছিল না।"

এই কথার উত্তরে মেয়েটির মুখ দিয়ে ভদ্রতার কোনও বাণী নির্গত হলো

না। মাফ করবার মতো কোনও অপরাধ হয় নি, সে কথা বললে না; ধন্যবাদ তো জানালই না;—কাঁদো-কাঁদো স্বরে বিরক্তিবিরূপ মুখে বললে, "মাগো, কী বিপদেই পড়লুম।"

আপত্তিব্যঞ্জক ভঙ্গিতে রঘুনাথ বললে, "পড়লুম বলছেন কেন? বলা উচিত পড়েছিলাম। বিপদ তো কেটে গেল। সত্যিই মোটরটা একটা মস্ত বড় বিপদের মতো প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়ছিল।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, "কিন্তু, আমাকে বিপদ মনে করছেন না তো আপনি?"

মনে করছে না—সে কথা ইঙ্গিতেও ব্যক্ত না ক'রে মেয়েটি ব্যগ্রভাবে রাস্তার দুই দিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "এমন ক'রে কী দেখছেন?"

"খালি রিকৃশ।"

"বৃষ্টির সময়ে খালি রিকৃশ সহজে পাবেন না।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মেয়েটি বললে, "ট্রাম তো চ'লে গেল, আপনি গেলেন না কেন?"

রঘুনাথ বললে, "আপনি নাবার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ডাক্টার ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম ছেড়ে দিলে। যে-রকম অবলীলার সঙ্গে আপনি আমার ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়লেন তাতে হয়তো সে মনে করেছিল, আমি আপনার জন্যই ছাতা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।"

মেয়েটি কোনও মতেই অস্বীকার করতে পারলে না যে, যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল তাতে ওরূপ মনে করা কণ্ডাক্টারের পক্ষে অসমীচীন নয়। কিন্তু অপর এক দিক দিয়ে আপত্তি করতে সে ছাড়লে না; বললে, "গাড়ির দরজার সামনে অত বড় ছাতা খুলে দাঁড়িয়ে থাকলে না ঢুকে কী করি! তার উপর টপ ক'রে আপনি ছাতাটা আমার হাতে দিয়ে দিলেন!" ঈষৎ বিরক্তিব্যঞ্জক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, কেন দিয়ে দিলেন বলুন তো?"

চিন্তিত মুখে রঘুনাথ বললে, "বোধ হয়, আপনি নিয়ে নেবেন মনে ক'রে।"

রঘুনাথের উত্তর শুনে মেয়েটি চুপ ক'রে গেল, এ কৈফিয়তের কোনও প্রতিবাদ সহসা সে খুঁজে পেলে না; কারণ, নিয়ে যে সে নিয়েছে তার প্রমাণ তার আপন হাতেই অবস্থান করছে। মনে মনে বললে, ভাববার-চিন্তাবার সময় না দিয়ে অমন ক'রে হাতে ধরিয়ে দিলে না নিয়ে কী যে করা যায় তা তো জানি নে।

মেয়েটির কৃতজ্ঞতাবর্জিত অকোমল ভাব উপলব্ধি ক'রে মনে মনে পুলকিতই হ'য়ে রঘুনাথ বললে, জীবনে কোনও দিন ছাতা ব্যবহার করি নি, আজ প্রথম ব্যবহার ক'রেই ভারি বিপদে প'ড়ে গেছি। ছাতা না থাকলে আমি পথ থেকে ভিজতে ভিজতে ট্রামে উঠতাম, আপনিও পথে নেমে ভিজতে ভিজতে বাড়ি যেতেন—সে দেখছি এক রকম ভালোই হ'তো।—এই হতভাগা ছাতার দ্বারা

আমার সঙ্গে আপনাকে জড়িত ক'রে একটা বিশ্রী গোলযোগের সৃষ্টি করেছি। এ যেন ঠিক জাতও গেল, অথচ পেটও ভরল না।"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "তার মানে?"

"তার মানে, নিজেও ভিজলাম, আপনাকেও বিরক্ত করলাম।" ব'লে রঘুনাথ হেসে উঠল।

এ ব্যাখ্যার ভাষায় কতকটা শান্ত হ'য়ে মেয়েটি আর কিছু বললে না, শুধু ক্ষণিকের জন্য অপাঙ্গে রঘুনাথের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

শ্যামবাজারের দিক থেকে আর একটি ট্রাম দেখা দিয়েছিল। মেয়েটি বললে, "ট্রাম আসছে, এই নিন আপনার ছাতা।" ব'লে ছাতাটা রঘুনাথের দিকে এগিয়ে ধরলে।

মেয়েটির দিকে ছাতাটা ঠেলে দিয়ে রঘুনাথ বললে, "দেখুন, মিছি-মিছি ছেলেমানুষি করবেন না। আমি ছাতা নিলে কার উপকার হবে বলুন তো? আমি তো ভিজে গিয়েইছি, উপরন্তু আপনিও ভিজে যাবেন, বইখাতাগুলোও নষ্ট হবে। এই ভিজে কাপড়ে আমার এখন ভবানীপুরে গিয়েও কোনও লাভ হবে না। তার চেয়ে চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি ফিরে যাই। যে রকম চেপে বৃষ্টি এল তাতে এখনই রাস্তায় এমন জল জ'মে যাবে যে, অবশেষে জুতো হাতে ক'রে পথ চলতে হবে।"

মেয়েটি বললে, "একটা রিক্শ আসছে, দেখি খালি কি-না।"

রঘুনাথ বললে, "রিক্শয় তো পর্দা ফেলা রয়েছে।"

"বৃষ্টির সময়ে খালি রিক্শতেও পর্দা ফেলে রাখে।"

কথাটা সত্য, সুতরাং রিক্শটা কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'লো। কিন্তু কাছে এলে দেখা গেল, সেটা খালি নয়, লোক আছে।

রঘুনাথ বললে, "দেখলেন তো লোক রয়েছে। এখন দশ-বারোখানা রিক্শ তো দেখলেন, কোনওটাই খালি নয়। আপনি ভয় পাবেন না, অসংকোচে আমার সঙ্গে চলুন। আমি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারব যে, রিক্শওয়ালার চেয়ে আমি মন্দ লোক নই।"

রঘুনাথের এ কথায় মেয়েটি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বললে, "না, না, আপনি এ-সব কথা বলছেন কেন? এখান থেকে আমার বাড়ি পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। আপনি আর কত কষ্ট করবেন।"

আসল কথা, একজন অপরিচিত যুবকের সহিত তার ছাতা মাথায় দিয়ে গৃহে উপস্থিত হওয়া মেয়েটির একেবারেই মনঃপূত হচ্ছিল না।

রঘুনাথ বললে, "কষ্ট আর আর আনন্দের হিসেব নিজের নিজের বাড়ি পৌঁছে করলেই হবে। আপাততঃ কোন্ দিকে আপনার বাড়ি বলুন তো?"

পশ্চিম দিকে হস্ত প্রসারিত ক'রে মেয়েটি বললে, "নতুন রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে ডান হাতি একটা গলির মধ্যে।"

"আসুন, ঠিক আমার পিছনে পিছনে আসুন।" ব'লে রঘুনাথ ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। মেয়েটিও ছাতা মাথায় দিয়ে রঘুনাথকে অনুসরণ ক'রে চলল।

একটি অপরিচিতা সুন্দরী তরুণীকে নিজের ছাতা দিয়ে, নিজে ভিজতে ভিজতে অগ্রগামী হ'য়ে পথ চলা—বর্ষা-দিনের এই অনাস্বাদিত-পূর্ব কাব্য-সংঘটন—রঘুনাথের মনে এক বিচিত্র আনন্দের সঞ্চার করছিল।

অপর দিকের ফুটপাথে উঠে দ্রুতগতিশীল ট্রাম, বাস ও মোটরের আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে বললে, "পথের ও-দিক পর্যন্ত এই ছাতাটার ওপর একটা বিশ্রী রকম বিরক্তিতে মন বিষিয়ে ছিল। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, ছাতাটা এনে ভালোই হয়েছে, উপকারে লাগল।"

রঘুনাথের পিছনে অবস্থান ক'রে মেয়েটির একটু সাহস হয়েছিল; বললে "উপকারে তো লাগল আমার।"

"সেই জন্যেই তো বলছি, এনে ভালো হয়েছে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মেয়েটি বললে, "এই রকম ভিজতে ভিজতে আপনি বরাবর যাবেন?"

প্রশস্ত ফুটপাথ, বৃষ্টির জন্য জনবিরল। একটু পেছিয়ে এসে মেয়েটির পাশাপাশি হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "উপায় কী বলুন? আমাদের দুজনের তো এক ছাতার মধ্যে স্থান হ'তে পারে না। জানেন তো, আপনাদের পক্ষে আমরা অস্পৃশ্য প্রাণী।" ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

মেয়েটি সত্য সত্যই অপ্রতিভ হ'লো। এ কথার পর ছাতার মধ্যে রঘুনাথকে আহ্বান না করলে তার উক্তিকে সপ্রমাণ করাই হয়।

মেয়েটির বিমূঢ় অবস্থা বুঝতে পেরে রঘুনাথ তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলে। বুক-পকেট থেকে একটা রেশমের মনিব্যাগ বার ক'রে বললে, "আপনি বরং আপাততঃ এই ভিজে মনিব্যাগটা আপনার হাতে রাখুন—ছাতা যখন নেব তখন এটাও নেব অখন। মনিব্যাগটা ভিজে হয়তো তত ক্ষতি হয় নি, কিন্তু ভেতরের কাগজের টাকাগুলো বেশি ভিজে গেলে সত্যিই কিছু ক্ষতি হবে।" ব'লে ব্যাগটা মেয়েটির দিকে প্রসারিত ক'রে ধরলে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাগটা নিতে হলো; কারণ এই যৎসামান্য উপকারটুকু করার বিরুদ্ধে আপত্তি করবার মতো তেমন গুরুতর কোনও যুক্তি হঠাৎ দেখানো গেল না।

চলতে চলতে রঘুনাথ বললে, "আপনি কী পড়েন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

মেয়েটি বললে, "আই. এস-সি।"

"কোন্ ইয়ার ?"

'সেকেণ্ড ইয়ার।"

"কোন্ কলেজে ?"

মেয়েটি কলেজের নামও বললে।

কলেজের নাম শোনার পর মেয়েটির নাম জানতে রঘুনাথের আগ্রহ হলো; বললে, "কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করি।"

রঘুনাথের এই অসঙ্গত কৌতূহলের জন্যে মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। না-হয় তুমি জোর ক'রে খানিকটা উপকারই করছ, তাই ব'লে এমন ক'রে সেটা ষোল আনা পুষিয়ে নেওয়া নিতান্তই সুরুচি-বিরুদ্ধ। তবুও প্রশ্নটা তত বেশি অবৈধ নয় ব'লে বললে, "আমার নাম বসুদা।"

"বসুদা ? বসুদা কী ?"

বিরক্ত হ'য়ে মেয়েটি বললে, "বসুদা মুখোপাধ্যায়।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে কতকটা যেন নিজমনেরই রঘুনাথ বলতে লাগল, "বসুদা! বসুদা মুখোপাধ্যায়! ভারি মিষ্টি নাম! যেমন চেহারা মিষ্টি তেমনই নাম মিষ্টি, যেমন নাম মিষ্টি তেমনই চেহারা মিষ্টি।"

ওদিকে পাশে চলতে চলতে রঘুনাথের ধৃষ্টতা দেখে ক্রোধে ও অপমানে বসুদা আরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। কী ব'লে রঘুনাথকে তিরস্কৃত করবে তা ঠিক করতে পাচ্ছিল না ব'লেই বোধ করি সে চুপ ক'রেছিল।

চলতে চলতে হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্নিগ্ধকণ্ঠে রঘুনাথ ডাকলে, "বসুদা।"

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বসুদা বললে, "কী বলছেন ?"

তেমনই স্নিগ্ধকণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে বসুদা, তা হ'লে আমি ষোল আনা রাজি আছি।"

"কিসে রাজি আছেন ?"

"তোমাকে বিয়ে করতে।"

বসুদার দুই চক্ষু ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, "এই রকম করে অপমান করবার জন্যেই তা হলে আপনি আমাকে সদর-রাস্তা থেকে নির্জন রাস্তায় টেনে এনেছেন ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বললে, "কী সুন্দর তুমি বসুদা! স্নিগ্ধ মূর্তিতেও তুমি যেমন সুন্দর, দীপ্ত মূর্তিতেও তুমি তেমনই সুন্দর! বিধাতার তুমি অপূর্ব সৃষ্টি।"

ঘৃণাতিক্ত কণ্ঠে বসুদা বললে, "ছি! ছি! আপনার লজ্জা করে না? রিক্শওয়ালাদের সঙ্গে আপনি তুলনা করছিলেন, কিন্তু রিক্শওয়ালারা আপনার চেয়ে ঢের ভদ্র, কোনও রিক্শওয়ালাই আপনার মতো কদর্য কথা কয় না।"

বসুদার তীব্র তিরস্কার শুনে রঘুনাথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল; বললে, "তুমি

ভুল করছ বসুদা। রিক্‌শওয়ালারা তো আর রঘুনাথ নয়, কিসের তাগিদে তারা এমন অদ্ভুত কথা বলবে বলো? তোমাকে বসুদা মুখোপাধ্যায় ব'লে জানতে পারলে তারা কি আমার মতো এই রকম বিস্ময়ে আনন্দে পাগল হয়ে ওঠে? কখনই ওঠে না। বসুদা মুখোপাধ্যায় না হয়ে তুমি যদি কোন এক উর্মিলা চাটুজ্জে অথবা প্রমীলা গাঙ্গুলী হতে, তা হলে দেখতে আমি রিক্‌শওয়ালাদের চেয়ে কত বেশি ভদ্র হতাম।"

রঘুনাথের কথা শুনে প্রচণ্ড কৌতূহলে বসুদা রঘুনাথের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল।

বসুদার বিস্ময়াহত মুখের নির্বাক প্রশ্ন নির্ভুলভাবে পাঠ ক'রে রঘুনাথ সহাস্যমুখে বললে, "হ্যাঁ,—সত্যিই তাই। আমি রঘুনাথ বাঁড়ুজ্জে। না দেখে না শুনে তোমাকে অবহেলা করার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু আগে তো জানতাম না যে তুমি এমন—"

কিন্তু কার সাধ্য সে-সব কথা শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে! দেখা গেল, কখন বসুদা ছাতা মাথায় ক'রে পিছন ফিরে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র এক পার্কের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছে।

"বসুদা! বসু!"

বসুদা নিস্তব্ধ।

এই বসুদার পিতামাতা রঘুনাথের হস্তে বসুদাকে সমর্পণ করবার জন্য সুদীর্ঘ কাল ধ'রে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। রঘুনাথের বিধবা মাতারও এ বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, কিন্তু রঘুনাথের ধনুর্ভঙ্গ পণ বিলাত হ'তে লেখাপড়া শেষ না ক'রে এসে বিবাহ করবে না। তাই এ পর্যন্ত বসুদাকে দেখবার সকল প্রকার অনুরোধ উপরোধ সে অতিক্রম ক'রে এসেছে। যে সম্পদ নিজের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করবার কোনও সংকল্প নেই, তাকে যাচাই করবার জন্য তার বিপণিতে উপস্থিত হওয়া একেবারে অর্থহীন। আজ কিন্তু প্রকৃতির এবং দৈবশক্তির ষড়যন্ত্রে বৃষ্টিধারার মধ্যে তাদের দেখা—একছত্রে তলে তাদের সংযোগ।

রঘুনাথ ধনকুবের স্বর্গীয় হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে দীপ্তিমান ছাত্র; গণিতশাস্ত্রে রেকর্ড মার্ক অধিকার ক'রে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে মুখে তার নাম; বিবাহ প্রস্তাবের পর থেকে বসুদা মনে-প্রাণে সেই নাম জপ করে।

ঠিক জপ করার কথা জানা না থাকলেও যে বসুদাও আগ্রহের সহিত তাকে কামনা করে, সে কথা রঘুনাথ বসুদার আত্মীয়বর্গের আগ্রহের প্রবলতা হ'তে সহজেই অনুমান করত। সুতরাং পরিচয় পাওয়ার পূর্বে অজানা অচেনা তরুণীকে অবলম্বন ক'রে যে নিষ্কাম এবং নিঃসত্ব কাব্যটুকু জন্মগ্রহণ করেছিল, পরিচয়

পাওয়ার পর আর তা সেরূপ রইল না। তখন সেই নৈর্ব্যক্তিক কাব্য-পরিস্থিতির কেন্দ্রে বসুদা তার সমস্ত সত্তা নিয়ে দেখা দিলে। সুনিশ্চিত বিবাহের দ্বারা যে অপরাধকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করা চলবে, সে অপরাধ অপরাধই নয়। সুতরাং এই দৈবাগত অচিন্তিতপূর্ব সৌভাগ্যকে একটু নিবিড়তার সহিত উপভোগ করবার পক্ষে কোনও নৈতিক বাধা আছে ব'লে রঘুনাথ মনে করলে না।

বৃষ্টি অল্প একটু ক'মে এসেছিল। পিছন দিক হ'তে রঘুনাথ বললে, "আগে কে জানত বসুদা, এমন অদ্ভুত ভাবে দেখা দিয়ে, শুধু আমার ছাতার মধ্যেই নয়, একেবারে সোজা আমার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করবে।"

এ কথারও কোন উত্তর না দিয়ে বসুদা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

আকস্মিক বিস্ময় এবং সংকোচজনিত বসুদার এই ত্বরপনেয় জড়তা দূরীভূত করবার জন্য রঘুনাথের মনে এক দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হ'লো। কণ্ঠের স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে নিয়ে সে বললে, "এমনভাবে তোমার দাঁড়িয়ে থাকা ভালো হচ্ছে না কিন্তু বসুদা। পথে হয়তো তেমন লোক নেই, কিন্তু জানলায় জানলায় উৎসুক চোখেরও অভাব নেই। তারা নিশ্চয় মনে করছে, আমি তোমার কাছে এমন-একটা প্রস্তাব করেছি, যার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে ভয় পাচ্ছ।"

কী সর্বনাশ! চকিত হ'য়ে উঠে বসুদা সম্মুখে বাড়িগুলোর উপর একবার ত্বরিত দৃষ্টি বুলিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হ'লো।

পিছনে চলতে চলতে রঘুনাথ ডাকলে, "বসুদা।"

বসুদা দাঁড়ালে না; শুধু গতি ঈষৎ মন্দ ক'রে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে।

রঘুনাথ বললে, "ও-রকম ক'রে তুমি আমার সামনে সামনে ছুটে চললে, লোকে আমাকে দুর্বৃত্ত ব'লে সন্দেহ করবে,—তুমি যে আমার পরমাত্মীয়, সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। দাঁড়াও।"

বসুদা গতি রোধ ক'রে দাঁড়াল।

মুহূর্তের মধ্যে বসুদার পাশে উপস্থিত হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "আস্তে চল বসুদা। তোমাদের বাড়ির দেড় হাত পথ তো শেষ হ'য়ে এল, তার ওপর ছুটোছুটি ক'রে আজকের এই বর্ষা-দিনের অপূর্ব কাব্যটুকুর অতি অল্প আয়ু আরও অল্প ক'রে দিয়ো না। লক্ষ্মীটি, আস্তে আস্তে চল।"

বসুদা ধীরে ধীরে রঘুনাথের পাশে পাশে চলতে লাগল।

রঘুনাথ বললে, "বাড়ি গিয়ে তোমার মাকে আজ ব'লো বসুদা—রঘুনাথ বলেছে, বসুদাকে গৃহলক্ষ্মী না ক'রে কোনও সরস্বতীরই কৃপালাভের লোভে সে গৃহত্যাগ করবে না।"

অপাঙ্গে বসুদা রঘুনাথের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে; সে দৃষ্টির মধ্যে এখন আর পূর্বের কটুতা নেই, এখন তথায় লজ্জা এবং হর্ষের অপরূপ জড়াজড়ি।

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললে, "এবার তো বসু তোমার ছাতার মধ্যে আমাকে

আশ্রয় দিতে পারো ?"

ইতস্ততঃ তাকিয়ে দেখে আহ্বানসূচক অল্প একটু মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে আরক্ত মুখে বসুদা বললে, "আসুন।"

রঘুনাথ হাসতে লাগল ; ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, "না, না, তার আর কাজ নেই। তোমার মন ভিজেছে এই যথেষ্ট, তোমার কাপড় ভেজাতে আর চাই নে।"

তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বলতে লাগল, "দুঃখ নেই বসুদা। ভবিষ্যতে এই ছাতার তলায় বহুবার আমরা মিলিত হব। আকাশ জুড়ে মেঘ ঘনিয়ে এসে যখন বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করবে, তখন মাঝে মাঝে আমরা দুজনে এই ছাতার নিচে পাশাপাশি হ'য়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। এই ছাতা আমাদের মিলিত করেছে বসুদা,—আমাদের মিলনের প্রতীক এই ছাতাকে আমরা চিরদিন যত্নে আদরে রাখব।"

পর-মুহূর্তেই সহসা দাঁড়িয়ে প'ড়ে রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বসুদা বললে, "এইটে আমাদের গলি।"

কিন্তু গলির প্রবেশ-পথে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জুড়ে এমন একটু জল জমেছিল যে, বসুদার পক্ষে সেটা ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জলের মধ্যে কোথাও একটু জাগা জমি অথবা ইট-পাথর আছে কি-না যার উপর জুতো রেখে পেরিয়ে যাওয়া যায়—সে বোধ হয় তাই লক্ষ্য করছিল, এমন সময় কানের কাছে মুখ এনে রঘুনাথ বললে, "কিছু যদি মনে না কর তো একটা কথা বলি।"

সামনের দিকেই মুখ সোজা ক'রে রেখে মৃদুস্বরে বসুদা বললে, "কী ?"

"দু হাতে তোমাকে তুলে ধ'রে টপ ক'রে পার ক'রে দিই।"

প্রস্তাব শুনে আরক্ত মুখে রঘুনাথের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বসুদা খলবলিয়ে জলের মধ্যে নেমে পড়ল। যা ভীষণ লোক, কিছুই অসম্ভব নয়! ম্যাথেম্যাটিক্সে রেকর্ড নম্বর পেলে কী হয়, কাজে-কর্মে কথায়-বার্তায় দারুণ বেহিসেবী!

এক লম্ফে জল পেরিয়ে বসুদার পাশে উপনীত হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "লজ্জার জন্যে আমাদের অনেক ভালো জিনিস থেকে বঞ্চিত হ'তে হয় বসুদা। আমি যদি আজ আমি না হ'য়ে তুমি হতাম, তা হ'লে কখনই এই অত্যন্ত আদরের প্রস্তাবে অসম্মত হতাম না।

এ কথাও যথেষ্ট বেহিসাবী কথা, সুতরাং বসুদা এ কথারও কোনও উত্তর দিলে না।

গলির মধ্যে খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে বাঁ দিকে বসুদাদের বাড়ি। সদর-দরজার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে দুই ধাপ সিঁড়ির উপর উঠে বসুদা রঘুনাথের দিকে ফিরে দাঁড়ালে ; তারপর ছাতাটা রঘুনাথের হাতে দিয়ে সলজ্জ মুখে বললে, "আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।"

বিস্মিত কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, ক্ষমা করব? কেন? অন্য কোনও লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির হ'য়ে গেছে না-কি?"

মাথা নাড়া দিয়ে বসুদা বললে, "সে কথা বলছিনে। আপনাকে আজ যে-সব অন্যায় কথা বলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

বসুদার কথা শুনে রঘুনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠল; বললে, এখন কি তা হ'লে রিক্‌শওয়ালাদের চেয়ে আমাকে কিছু ভদ্র ব'লে মনে হচ্ছে?"

"আমাকে ক্ষমা করুন।" বসুদার কণ্ঠস্বরে সুগভীর অনুতাপের করুণতা।

রঘুনাথ বললে, "না, না, বসুদা, তোমাকে ক্ষমা করবার কোনও কথাই উঠতে পারে না। যে-সব কথাকে তুমি অন্যায় কথা বলছে, সেই সব কথাই আমার জীবনে চিরদিনের মতো অমূল্য সম্পদ হ'য়ে রইল। সেই সব কথা শুনেই তোমাকে অমন অদ্ভুত মেয়ে মনে হয়েছিল। এখন অনুতাপ হচ্ছে, কেন অত শীঘ্র নিজের পরিচয় দিলাম! কেন আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করলাম না! তোমার কঠিন বাক্য কত যে মিষ্ট তার কোনও ধারণা নেই তোমার। তুমি এমনই অদ্ভুত গোলাপ যে, তোমার কাঁটার আঘাতেও আনন্দ আছে।"

তরুণ প্রেমের এই অপরূপ প্রাণ-ঢালা সোহাগ-ভাষণ বসুদার প্রণয়চকিত হৃদয়কে এক অপূর্ব সঙ্গীতে উদ্বেল ক'রে তুললে। সে সঙ্গীতের যথার্থ ভাষা, 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি, সব সমর্পিয়া প্রাণ-মন দিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।' কিন্তু মুখ ফুটে কে সে কথা ভাষায় প্রকাশ ক'রে বলে!

বসুদা বললে, "আমার একটা কথা আছে।"

"কী বল?"

"এখানে আপনার পরিচয় দেবেন না।"

বিস্মিত কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "পরিচয় দোব না? কোনও দিন না?"

"না, আজ দেবেন না; এখন দেবেন না।"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললে, "এখন তো এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি, সুতরাং আজকের ভয় তোমার নেই। কিন্তু কাল সকালে মাকে নিয়ে তোমার দরবারে হাজির হব। তুমি তো এখনও স্পষ্ট ক'রে তোমার সম্মতি জানাও নি বসুদা। কী বলো? কাল আসব তো?"

আরক্ত মুখে মৃদুস্বরে বসুদা বললে, "আসবেন।" তারপর পিছন ফিরে দরজায় দু-চার বার ধাক্কা দিলে।

ভিতরে নিকটেই একজন চাকর কাজ করছিল, তাড়াতাড়ি এসে দোর খুললে।

"আচ্ছা, এবার তা হ'লে চললাম।" ব'লে রঘুনাথ দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে রঘুনাথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সকৃতজ্ঞ মনের সমস্ত মাধুরী দিয়ে মনে মনে রঘুনাথকে বন্দিত ক'রে পুলকিত-চিত্তে বসুদা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে দোর লাগিয়ে দিলে।

গৃহে প্রবেশ ক'রেই বাঁ দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে

বসুদার জননী সত্যবতী নেমে আসছিলেন। বসুদাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে, দোর লাগিয়ে দিলি, সে ছেলেটি কোথায় ?"

ঈষৎ বিমূঢ়ভাবে বসুদা বললে, "কে ?

সত্যবতী বললেন, "ওপর থেকে জানলা দিয়ে দেখলাম একটি ছেলে নিজের ছাতা তোকে দিয়ে ভিজতে ভিজতে তোর পাশে পাশে আসছিল, তার কথা বলছি।"

বসুদা বললে, "তিনি বাড়ি চ'লে গেলেন।"

"কে সে ? কোথায় তার দেখা পেলি ?"

যুগ্ম প্রশ্ন। প্রথমটির উত্তর দেওয়া নিরাপদ নয়। বসুদা একেবারে দ্বিতীয়টির উত্তর দিয়ে বললে, "ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে।"

সত্যবতী বললেন, "আহা, অনেক দূর থেকে এসেছিল তো ! ভিজে কাপড়ে ফিরে না গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলে একটু চা-টা খেয়ে গেলে ভাল হ'তো। চিনিস না-কি তাকে ?"

কঠিন প্রশ্ন ! 'চিনি না' বললে, মিথ্যা ভাষণ হয় ; 'চিনি' বললে, পরবর্তী প্রশ্ন কঠিনতর মূর্তিতে দেখা দেয়। কী উত্তর দেবে বসুদা বিহ্বল হ'য়ে তাই ভাবছে, এমন সময় দৈব অনুকূল ব'লে মনে হলো। সদর-দরজায় অকস্মাত করাঘাত শোনা গেল ; প্রভাবতী বললেন, "সুধীর বোধ হয় কলেজ থেকে এল, দোর খুলে দে বসু।"

সুধীর বসুদার দাদা। সত্যবতীর কথা শুনে বসুদা উল্লসিত হলো—সুধীর যদি হয় তো তার হাতে জননীকে সমর্পণ ক'রে একেবারে এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। তারপর, পরদিন সকাল পর্যন্ত কোনও রকমে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে সময় কাটিয়ে দেওয়া। অবশেষে জননীকে সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথ যখন উপস্থিত হবে, তখন অপরিমেয় বিস্ময় এবং আনন্দের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান।

দোর খুলে দিয়ে কিন্তু বসুদা সচকিতে দুই পা পিছিয়ে এল। সুধীর তো নয়ই ; সত্যবতীর কঠিন প্রশ্ন অপেক্ষাও কঠিনতর বস্তু,—অর্থাৎ, স্বয়ং রঘুনাথ দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তথাপি অন্তরের গোপন আনন্দ সমস্ত লজ্জা এবং বিমূঢ়তাকে পাশে ঠেলে নিঃশব্দে অধরপ্রান্তে এসে দেখা দিলে।

বসুদার পশ্চাতে সত্যবতীকে দেখতে পেয়ে রঘুনাথ সাবধান হ'য়ে গেল। বসুদার দিকে হাত বাড়িয়ে সহাস্যমুখে বললে, "আমার মনিব্যাগটা ?"

কী সর্বনাশ ! রঘুনাথকে বিদায় দেবার সময় বসুদা অন্যমনস্ক হ'য়ে মনিব্যাগের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল ! আরক্তমুখে হাত বাড়িয়ে মনিব্যাগটা রঘুনাথকে প্রত্যর্পণ করলে।

সত্যবতী নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ; কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সবিস্ময়ে বললেন, "ওঁর মনিব্যাগ তোর কাছে কেমন ক'রে এল ?"

বসুদা কিছু বলবার পূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর দিলে রঘুনাথ ; বললে, "কাপড়ের

ব্যাগ, ভিতরে কাগজের টাকা ; ভিজে নষ্ট হওয়ার ভয়ে ওঁর কাছে ছাতার তলায় রাখতে দিয়েছিলাম।" ব'লে হাসতে লাগল।

বসুদার দিকে চেয়ে সত্যবতী বললেন, "কী মেয়ে রে তুই! ছাতা তো নিয়েইছিলি, তার ওপর মনিব্যাগটা নিয়ে ফিরিয়ে না দিয়ে ভিজে কাপড়েই ছেড়ে দিচ্ছিলি!"

বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "মা নিশ্চয়ই?"

বসুদা বললে, "হ্যাঁ।"

দরজা পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে রঘুনাথ সত্যবতীর পদধূলি গ্রহণ করলে।

রঘুনাথের আকৃতি এবং আচরণ দেখে সত্যবতী মনে মনে প্রসন্ন হয়েছিলেন ; তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, "চিরজীবী হও।" তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "এস বাবা, এস। ভিজে কাপড় বদলে, চা খেয়ে তারপর যাবে।"

প্রসন্ন মুখে রঘুনাথ বললে, "না মা, আজ যাই ; কাল সকালে আবার আসব। তবে কাল একা আসব না, মাকে সঙ্গে নিয়ে আসব।" ব'লে বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে একটু হাসলে।

বিস্মিত হ'য়ে সত্যবতী বললেন, "সে তো খুবই সুখের কথা। কিন্তু তোমার মাকে নিয়ে আসবে কেন বল তো বাবা?"

রঘুনাথ বললে, "সে কথা এখন বললে বসুদার সঙ্গে চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধ হবে। পরে আপনি বসুদার কাছে সব শুনবেন।"

বসুদাকে দেখতে গিয়ে সত্যবতী দেখলেন, অদূরে বসুদা চ'লে যাচ্ছে। একবার মনে করলেন, ডেকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেন ; কিন্তু সম্ভবতঃ বসুদাও এখন বলতে স্বীকৃত হবে না ভেবে রঘুনাথকে বললেন, "তুমি বসুদাকে আগে থেকে জানো?"

রঘুনাথ বললে, "জানি।"

"কত দিন থেকে?"

একটু চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললে, "প্রায় আট-ন মাস থেকে।"

"আজ বসুদা তোমার কাছে গিয়েছিল?"

ব্যগ্রকণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "না, না, বসুদা আমার কাছে কোনও দিনই যায় নি। আজ কলেজ থেকে ফেরবার সময়ে বসুদা যখন ওয়েলিংটনের মোড়ে ট্রাম থেকে নামছিল, তখন সেই ট্রামে ওঠবার জন্যে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভয়ানক জোরে বৃষ্টি এল ব'লে বসুদাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।" ব'লে রঘুনাথ পুনরায় বিদায় প্রার্থনা করলে।

এরূপ একটা দুর্ভেদ্য সমস্যার মধ্যে রঘুনাথকে সহসা ছেড়ে দিতে সত্যবতীর মন চাইলে না। তা ছাড়া, আর্দ্র বসন পরিবর্তন ক'রে চা খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধ তো পূর্বেই করেছিলেন ; বললেন, "না, না, সে কিছুতেই হবে না। এমন ভিজে কাপড়ে তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না।"

রঘুনাথ আরও খানিকটা আপত্তি করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি হ'তেই হ'লো।

ভজুয়া চাকরকে ডেকে সত্যবতী নিচেকার বাথরুমে ধোয়া ধুতি, জামা ও গেঞ্জি দিয়ে রঘুনাথকে তথায় নিয়ে যাবার জন্যে আদেশ করলেন। তারপর, রঘুনাথ বাথরুমে প্রবেশ করলে কন্যার সন্ধানে দ্বিতলে উপস্থিত হ'য়ে অবগত হলেন, বসুদাও দ্বিতলের বাথরুমে প্রবেশ করেছে।

কন্যা যে উপস্থিত তাঁরই হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বাথরুমে আশ্রয় নিয়েছে—এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'লো না। নিচে এসে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় চায়ের টেবিলের সম্মুখে আসন গ্রহণ ক'রে সত্যবতী উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাজালের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

মিনিট পনের-কুড়ি পরে স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে রঘুনাথ বাথরুম থেকে নির্গত হ'লো; তারপর ভজুয়া কর্তৃক নীত হ'য়ে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় এসে আসন গ্রহণ করলে।

ভজুয়া প্রস্থান করলে সত্যবতী রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কী বাবা ?"

বসুদার নিকট প্রতিশ্রুতি স্মরণ ক'রে রঘুনাথ বললে, "আমার নাম ? আমার নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"তুমি কী করো ? পড়ো ?"

"হ্যাঁ, পড়ি।"

"কী পড় ?"

রঘুনাথ বলিল, "ল পড়ি।"

নির্বন্ধসহকারে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সত্যবতী বললেন, "লক্ষ্মী বাবা! তোমার মাকে কাল সকালে কেন নিয়ে আসবে, সে কথা আমাকে খুলে বলো। আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে জানতে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললে, "আপনার কথা আমি অমান্য করতে পারলাম না,—কিন্তু আমি যে এ কথা আপনাকে বলেছি, সে কথা বসুদাকে অন্ততঃ আজকের দিনে বলবেন না।"

সত্যবতী বললেন, "আচ্ছা বলব না। তুমি বলো।"

রঘুনাথ বললে, "মাকে নিয়ে আসব বসুদার সঙ্গে আমার বিয়ের দিন স্থির ক'রে যেতে।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে সত্যবতী বললেন, "বিয়ে স্থির করতে?—না, বিয়ের দিন স্থির করতে ?"

রঘুনাথ বললে, "দিন স্থির করতে। অবশ্য আপনাদের যদি মত থাকে তা হ'লে।"

"তোমাদের মত আছে ?—তোমার মত আছে ?"

"আছে।"

"বসুদার ?"

সত্যবতীর প্রশ্ন শুনে রঘুনাথ হেসে ফেললে ; বললে, "মা, আপনি দেখছি বসুদার কাছে আমাকে অপ্রতিভ না ক'রে ছাড়বেন না। আছে।"

সত্যবতী জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে তোমাকে সে তার মত জানিয়েছে ?"

রঘুনাথ বললে, "আজ। একটু আগে।"

একটা কাঠের ট্রে ক'রে ভজুয়া চা ও খাবার নিয়ে উপস্থিত হ'লো।

সত্যবতী বললেন, "দিদিমণি কোথায় ?"

ভজুয়া বললে, "দিদিমণি তো ওই ঘরে রয়েছেন।" ব'লে নিকটতম ঘরটা দেখিয়ে দিলে।

সবিস্ময়ে সত্যবতী বললেন, "ওই ঘরে রয়েছে ? খুব মেয়ে যা হোক।" তারপর, 'বসুদা। বসুদা।' ব'লে নিজেই উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলেন।

বসুদা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

সত্যবতী বললেন, "কী মেয়ে রে তুই ! এখানে বোস,—রামচন্দ্রকে চা-টা খাওয়া।"

রঘুনাথের সহিত বসুদার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হ'লো। রঘুনাথের মুখে ফুটে উঠল কৌতুকের মৃদু হাসি, বসুদার মুখে সবিস্ময় পুলক।

নিকটে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে মৃদুকণ্ঠে বসুদা বললে, "আমি চা ক'রে দোব ?"

স্মিতমুখে বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রঘুনাথ বললে, "বেশ তো, দাও।"

চিনি মেশাবার সময় ভজুয়াকে ডাকবার জন্য সত্যবতী অল্প একটু দূরে উঠে গিয়েছিলেন। রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে বসুদা জিজ্ঞাসা করলে, "ক চামচে চিনি দোব ?"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ মৃদুকণ্ঠে বললে, "এক চামচে না দিলেও মিষ্টি লাগবে।"

রঘুনাথের কথা শুনে বসুদার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। চায়ের সঙ্গে দুই চামচে চিনি মিশিয়ে রঘুনাথের দিকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলে।

ফিরে এসে চেয়ারের উপর উপবেশন ক'রে সত্যব্রতী অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। বললেন, "তোমরা ক ভাই-বোন রামচন্দ্র ?"

রঘুনাথ বললে, "আমার ভাই নেই, বোন তিনটি।"

পরিচয় গ্রহণের প্রসঙ্গ আরও কিছুক্ষণ চলার পর সদর-দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনা গেল।

নিকটেই ভজুয়া ছিল ; বললে, "দাদাবাবু কলেজ থেকে এলেন।" ব'লে দোর খুলে দিতে গেল। কিন্তু ক্ষণকাল পরে দাদাবাবুর পরিবর্তে দেখা দিলেন বসুদার পিতা দীননাথ।

নিকটে উপস্থিত হ'য়ে রঘুনাথের প্রতি সাগ্রহ এবং সবিস্ময় দৃষ্টিপাত ক'রে দীননাথ বললেন, "এ কি! রঘুনাথ না ?"

সত্যবতী ঘাড় নেড়ে বললেন, "না, রঘুনাথ নয়; রামচন্দ্র।"

দীননাথ ঘাড় নেড়ে বললে, "নিশ্চয়ই রঘুনাথ। রামচন্দ্র নয়।" রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "তুমি রঘুনাথ নও ?"

বিনীত কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি রঘুনাথ।"

সবিস্ময়ে সত্যবতী বললেন, "কোন্ রঘুনাথ ?"

দীননাথ বললেন, "যে রঘুনাথকে পাবার জন্যে তুমি দিবারাত্র দেবতার কাছে প্রার্থনা করছ, সেই রঘুনাথ।"

রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রবল আগ্রহে সত্যবতী জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ বাবা, সত্যি ?"

রঘুনাথ বললে, "সত্যি।"

"তবে যে বললে তোমার নাম রামচন্দ্র ?"

এ সমস্যার সমাধান করলেন দীনবন্ধু; সহাস্যমুখে বললেন, "রঘুনাথের অনেক নাম আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে রামচন্দ্র।"

বিস্ময়ে আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে সত্যবতী ডাকলেন, "বসুদা !"

বসুদা কিন্তু পূর্বেই কথাবার্তার কোন ফাঁকে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

রাত-জাগা

১৩৩৯ সালের শরৎকাল।

বিবাহের মাস তিনেক পরে শ্বশুর মহাশয়ের পল্লীনিবাস সোনাইদহে চলিয়াছি। সঙ্গে আছেন তৃতীয় শ্যালক অভয়পদ। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য ইনি কলকাতার গৃহে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। বাকি সকলে,—মায় সেই ব্যক্তি, যাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সুদীর্ঘ দুর্গম পথ উৎসাহভরে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি,—পূর্বেই সোনাইদহে গমন করিয়াছেন।

রেল হইতে নামিতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না। একটা স্টেশনের পরেই সোনাইদহের নিকটতম রেল-স্টেশন। তথা হইতে তিন মাইল অপ্রশস্ত কাঁচা পথ ভাঙিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হইবে।

কথায় কথায় অভয়পদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের সোনাইদহে আকর্ষণের বস্তু কী আছে অভয়পদ ?"

অভয়পদর মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "সোনাইদহে আকর্ষণের বস্তু? তবেই হয়েছে! একমাত্র বনজঙ্গল আর খানাডোবা ছাড়া এমন কোনও বস্তু সেখানে নেই, যা তোমাকে আকর্ষণ করতে পারে।"

মনে মনে বলিলাম, ভুল করছ অভয়পদ। আর কোনও বস্তু না না থাকলেও তোমার ভগ্নী নিশ্চয় আছেন, যাঁর আকর্ষণ আমার পক্ষে প্রচুর ব'লেই মনে করি।'

মুখে বলিলাম, "কোনও আকর্ষণের বস্তু যদি না-ই থাকে, তা হ'লে কোন্ সাহসে আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছ?"

আমার কথা শুনিয়া অভয়পদ কিছু না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। বোধ করি সংকোচবশতঃ বলিতে পারিল না, ভগ্নীর সাহসে। কিন্তু অপর যে বস্তুর কথা সে অসংকোচে বলিতে পারিত, হয় তাহা বলিতে ভুলিয়াই গেল, অথবা তাহার দৃষ্টিতে সে বস্তুকে সে উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে না।

আমি কিন্তু বর্তমান কাহিনীতে সেই দ্বিতীয় বস্তুর কথাই বলিব।

স্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, আমাদের লইয়া যাইবার জন্য লাঠি এবং লণ্ঠন হস্তে দুইজন পাইক, দুইখানা পালকি, এবং আসবাবপত্রের জন্য একখানা গরুর গাড়ি আসিয়াছে।

শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্রমা বহুক্ষণ অস্তমিত হইয়াছে। তিমির বৃত প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া সেই অপ্রশস্ত গ্রাম্যপথের উপর দিয়া বাহিত হইয়া আমরা সোনাইদহের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

নিস্তব্ধ পল্লীজননীর নিদ্রালস রাজ্যে পালকি-বেহারাদের পথশ্রমনাশক ছড়ার গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে এবং পালকির দোলা খাইতে খাইতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম মনে নাই, অভয়পদর ডাকে জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, পালকি ভূমিতলে অবস্থান করিতেছে।

পালকি হইতে বাহির হইতে হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পৌঁছেছি নাকি অভয়পদ?"

অভয়পদ বলিল, "প্রায়।"

বাহির হইয়া দেখিলাম, আমাদের অগ্রগতির পথ নির্বাধ নহে। সন্ধ্যার পর ঝড় হইয়াছিল, তাহার ফলে একটা জীর্ণ শিমুলবৃক্ষ পথ জুড়িয়া পড়িয়া আছে। রাত্রিকালে সম্পূর্ণরূপে পথ পরিষ্কার করিবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই; শুধু এক দিকের ডালপালা কিছু কাটিয়া এবং কিছু সরাইয়া কোনও প্রকারে পদব্রজে যাতায়াতের একটু ব্যবস্থা হইয়াছে। শুনিলাম, সেখান হইতে শ্বশুরালয় মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ।

চলিতে চলিতে অভয়পদর নিকট অবগত হইলাম, গ্রামের ভিতর দিয়াই যাইতেছি; কিন্তু তাহার কোনও পরিচয় পাইতেছিলাম না। পথের দুই পার্শ্বে গাছপালার সহিত জড়িত হইয়া গৃহস্থের ঘরবাড়ি যাহা আছে, সুনিবিড় অন্ধকার এবং সুগভীর নিদ্রাবেশের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত। কোনও গৃহের সামান্য একটু অন্তরাল ভেদ করিয়াও ক্ষীণতম দীপালোকও দেখা যাইতেছিল না, অথবা অস্ফুটতম কণ্ঠস্বরও শুনা যাইতেছিল না। শুধু পদতলস্থিত নিশ্চেতন পথ আমাদের

কয়েকজনের পদপীড়নে কাতরোক্তি করিয়া করিয়া চতুর্দিকের প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে খণ্ডিত করিতেছিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, অদূরে পথের বাম পার্শ্বে একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বলিলাম, "ঐটে তোমাদের বাড়ি নাকি অভয়পদ?"

অভয়পদ বলিল, "না, ওটা রজনী বউদিদির বাড়ি। আমাদের বাড়ি ও বাড়ির আরও গোটা তিনেক বাড়ি পরে।"

নিকটে আসিয়া দেখিলাম, কক্ষটি একেবারে পথের ধারে অবস্থিত; সম্ভবতঃ গৃহের বৈঠকখানা হইবে। কক্ষের ভিতর জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একটি ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী স্ত্রীলোক; পরিধানে চওড়া লালপাড় শাড়ি; কণ্ঠের সোনার হার এবং দুই হস্তের সোনার চুড়ি কেরোসিন লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকেও চিক্‌চিক্‌ করিতেছে।

রাত্রি এগারটার সময়ে পথপার্শ্বে জানালার পারে একটি স্ত্রীলোককে এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম।

স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "কী অভয়, তোমরা এলে না-কি?"

অভয়পদ বলিল, "হ্যাঁ বউদি, এলাম।"

"জামাই এসেছেন তো?"

"এসেছেন।"

"এক মিনিট দাঁড়াও তো ভাই, জামাইকে একবার ভালো ক'রে দেখে আসি।" বলিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া রাংচিতার বেড়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ গেট খুলিয়া স্ত্রীলোকটি পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর আপাদমস্তক আমাকে একবার দেখিয়া লইয়া প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, "খাসা জামাই হয়েছে অভয়পদ, রূপেগুণে খাসা জামাই হয়েছে। গুণের কথা তো শুনেইছিলাম, দেখতেও ভারি চমৎকার।"

আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অভয়পদ মৃদুস্বরে বলিল, "রজনী বউদিদি। প্রণাম কর।"

অভয়পদর কথা শুনিয়া আমি নত হইয়া রজনী বউদিদিকে প্রণাম করিলাম।

ক্ষণিকের জন্য আমার মাথার উপর হাত রাখিয়া রজনী বউদিদি নিঃশব্দে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "শিমুলগাছটার জন্য আজ কিন্তু তোমাকে ভারি কষ্ট পেতে হ'লো।"

আমি বলিলাম, "না বউদিদি, এমন কিছু কষ্ট পেতে হয় নি।"

সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রজনী বউদিদি সহাস্যমুখে বলিলেন, "ঐ তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আলো-টালো নিয়ে অনেকে তোমার জন্যে আসছেন। আচ্ছা, এস ভাই, রাত অনেক হয়েছে, খাওয়া-দাওয়া ক'রে শুয়ে পড়গে। কাল সকালবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব অখন।"

"নিশ্চয় যাবেন।" বলিয়া আমরা প্রস্থান করিলাম।

কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পর পিছন হইতে রজনী বউদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ অভয়পদ, স্টেশনে আর কাউকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলে কি ?"

চলিতে চলিতে অভয়পদ বলিল, "না, বউদিদি, আর কেউ নামে নি।"

"তা হ'লে পরের গাড়িতে হয়তো আসবেন।" বলিয়া রজনী বউদিদি গেট সরাইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

জানালার গরাদ ধরিয়া রজনী বউদিদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু পূর্বে মনের মধ্যে যে বিস্ময় জাগিয়াছিল, অভয়পদর সহিত তাঁহার এইটুকু কথোপকথন শুনিয়া তাহা অন্তর্হিত হইল। বুঝিলাম, ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রজনী বউদিদি কোনও আত্মীয় ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সে দিনের মতো রজনী বউদিদির কথা বিস্মৃত হইলাম।

পরদিন বেলা নয়টার সময়ে আমাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সুবৃহৎ বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। বৈঠকে বাড়ির প্রায় সকলে তো ছিলেনই, প্রতিবেশিনীদের মধ্যেও কেহ কেহ যোগ দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্বে কোন-এক জয়গোবিন্দ ঘোষের গৃহে সদ্যবিবাহিত চতুর কলিকাতাবাসী জামাতাকে কেমন করিয়া ঠকাইয়া নাকালের চূড়ান্ত করা হইয়াছিল, জনৈক রহস্যপ্রিয় ললনা সাড়ম্বরে সেই কাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন, এমন সময়ে কক্ষের দরজার দিকে সকলের আকৃষ্ট হইল।

চাহিয়া দেখিলাম, দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক লাবণ্যময়ী রমণী। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই রমণীর মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া উৎকট বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেলাম। ঠিক সেই হাসিই তো গত রাত্রে রজনী বউদিদির মুখে দেখিয়াছিলাম। তবে কি এই রমণীই রজনী বউদিদি ?

কিন্তু তাই যদি হয়, তাহা হইলে অকস্মাৎ এ কি অদ্ভুত রূপান্তর। সীমন্তে সিঁদুর নাই, অঙ্গে আভরণ নাই, পরিহিত বস্ত্রে পাড় নাই। এ যে একেবারে পরিপূর্ণ বৈধব্যের শুচিশুভ্র মূর্তি। গত রজনীর প্রসাধনরম্যা রজনীবালা আজ যেন বর্ষাপ্রভাতের রজনীগন্ধা হইয়া দেখা দিয়াছে।

মনে সংশয় হইল, হয়তো বা ইনি রজনী বউদিদির বিধবা ভগ্নীই হইবেন। কিন্তু পরক্ষণেই সংশয়ের নিরসন হইল, যখন আমার এক শ্যালিকা 'রজনী বউদিদি' বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সংশয় গেল ; কিন্তু সমস্যা ঘনীভূত হইল।

রজনী বউদিদি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই একটি তরুণী তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া রজনী বউদিদিকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রজনী বউদিদি কিন্তু বসিলেন না, বাম হস্তের চাপে তরুণীকে তাঁহার পরিত্যক্ত স্থানে বসাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

মনে হইল, সকলেই রজনী বউদিদিকে বেশ একটু শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম করে।

কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল রাত্রে কি তিনি এসেছেন বউদিদি ?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া রজনী বউদিদির মুখে সুস্পষ্ট বিহ্বলতা দেখা দিল ; সসংকোচে বলিলেন, "কে ?"

বুঝিলাম যে কারণেই হউক, এ প্রশ্ন করা আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু তখন আর উপায়ান্তর ছিল না ; কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম, "যাঁর জন্যে আপনি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন ?"

রজনী বউদিদির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া আর্তকণ্ঠে বলিলেন, "তাই কখনও আসেন বসন্ত ! ও আমার একটা মনের খেয়াল ! একটা পাগলামি !"

প্রসঙ্গটা পরিবর্তিত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ অন্য কথা পাড়িলাম। কিন্তু রজনী বউদিদি অধিকক্ষণ রহিলেন না, দুই-চার মিনিট কথা কহিয়াই প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, পুনরায় দেখা হইবে।

উগ্র কৌতূহল সহকারে আমার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী ব্যাপার বলুন তো বড়দি ?"

জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা হেমনলিনী বলিলেন, "ও এক অদ্ভুত ব্যাপার। দিনের বেলায় রজনী বউদিদি পুরোদস্তুর বিধবা, কিন্তু সূর্যাস্তের পর থেকেই তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বৈধব্যের কথা অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। রাত্রি আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তাঁর স্বামী—বিভূতিদাদা বেঁচে আছেন। তখন তিনি বিধবার বেশ পরিত্যাগ ক'রে সধবার বেশ ধারণ করতে আরম্ভ করেন। মাথায় সিঁদুর পরেন, পায়ে আলতা পরেন, গায়ে অলঙ্কার পরেন, পাড়ওয়ালা শাড়ি পরেন। তারপর দশটা আন্দাজ খানিকক্ষণ স্থির হ'য়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর কলকাতা থেকে প্রথম গাড়িতে লোক আসবার সময় থেকে লণ্ঠন জেলে বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিভূতিদাদার অপেক্ষায় সমস্ত রাত কাটিয়ে দেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ধীরে ধীরে রাত্রের মোহ কাটতে আরম্ভ করে। তখন আবার সিঁদুর মোছা আর আলতা ধোয়ার পালা আরম্ভ হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজনী বউদিদি আবার যে বিধবা সেই বিধবা।"

রজনী বউদিদির অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু রজনী বউদিদির স্বামীর আসল খবর কী ? বেঁচে নেই তিনি নিশ্চয়ই ?

হেমনলিনী বলিলেন, "বিভূতিদাদা ? খুব সম্ভবতঃ তিনি বেঁচে নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই বেঁচে নেই, তাও বলা যায় না,—কারণ মারা গেছেন সে কথাও নিশ্চয় ক'রে জানা যায় নি।"

ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তার মানে ?"

হেমনলিনী বলিতে লাগিলেন, "বিভূতিদাদা লক্ষ্ণৌয়ে আর্মি অর্ডন্যান্সে চাকরি করতেন। সেইখানেই রজনী বউদিদির সহিত পরিচয় হওয়ার পর তাঁকে তিনি বিয়ে করেন। দু বৎসর-বিভূতিদাদার সঙ্গে রজনী বউদিদি পরম সুখে বাস করেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার তুলনা ছিল না। শুনেছি লক্ষ্ণৌর বাঙালীরা তাঁদের দুজনকে কপোত-কপোতী নাম দিয়েছিল। তারপর আরম্ভ হ'লো সর্বনেশে জার্মান যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে বিভূতিদাদাদের অফিসের একটা অংশ মেসোপোটেমিয়ায় গেল,—তার সঙ্গে যেতে হ'লো বিভূতিদাদাকেও। যাবার আগে বিভূতি-দাদা রজনী বউদিদিকে এখানকার বাড়িতে রেখে যান। তখন রজনী বউদিদির বৃদ্ধ শ্বশুর আর এক বিধবা পিস্‌শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। বিভূতিদাদার মেসোপোটেমিয়া যাবার মাস দুয়েক পরেই, ছেলের দুঃখেই বোধ হয়, বিভূতিদাদার বাবা মারা যান; পিসিমা মারা যান বছর পাঁচেক পরে। মেসোপোটেমিয়া যাওয়ার মাস দশেক পরে বিভূতিদাদা রজনী বউদিদিকে চিঠি লিখে জানান যে, তিনি ছ মাসের ছুটি পেয়েছেন; আর যে তারিখে রাত্রি এগারোটার সময়ে তিনি সোনাইদহে পৌঁছবেন, তাও সেই চিঠিতে ঠিক ক'রে লিখে পাঠান। কাল রাত্রে তুমি রজনী বউদিদিকে যেমনভাবে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছ, পনের-ষোল বৎসর আগে বিভূতিদাদার আসবার দিনে তিনি ঠিক তেমনি করেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সেদিন তো বিভূতিদাদা এলেনই না; তার পরও এ পর্যন্ত কোন দিনই আসেন নি। অথচ সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই পনেরো-ষোল বৎসর বিভূতিদাদার প্রত্যাশায় রজনী বউদিদি প্রত্যেক রাত্রি জেগে কাটিয়েছেন—তা শীতই বলো আর গ্রীষ্মই বলো, আর বাদলই বলো। সেই জন্যে এ তল্লাটে ওঁর নামই হয়ে গেছে 'রাতজাগা রজনী।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু বিভূতিবাবু মারা গেছেন, কি বেঁচে আছেন, সে কথা তো বেশি দিন অজানা থাকবার কথা নয় বড়দি। আর্মি অফিস সে কথা নিশ্চয় জানিয়ে দেবে। তা ছাড়া, বিভূতিবাবু যদি মারা গিয়ে থাকেন, তা হলে রজনী বউদিদির কম্‌পেন্‌সেশন্ পাওয়ার কথাও এর মধ্যে জড়িত আছে।"

হেমনলিনী বলিলেন, "এ সমস্ত কথা ঠিকই বলছ তুমি; কিন্তু রজনী বউদির সঙ্গে এ সব কথার আলোচনা করবার সাহসই বা কার আছে, আর গরজই বা কার বলো? বিভূতিদাদা নিখোঁজ হওয়ার পর রজনী বউদিদির এক কাকা কয়েকবার এখানে যাতায়াত করেছিলেন। বিভূতিদাদা যে অফিসে কাজ করতেন সেই অফিসের তিনি একজন বড় কর্মচারী। প্রথমবার তিনি রজনী বউদিদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাথর হয়ে রজনী বউদিদি এক পা-ও তাঁর বাড়ি ছেড়ে নড়তে চাইলেন না। শোনা যায়, তারপর রজনী বউদিদির কাকা কী সব কাগজপত্রে রজনী বউদিদিকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যান। কেউ কেউ বলে, সেই সব কাগজপত্রই কম্‌পেন্‌সেশন পাওয়ার কাগজপত্র। টাকাটা বার করে হয় তিনি রজনী বউদিদির নামে জমা করে দিয়েছেন, নয় আত্মসাৎ করেছেন।"

আমি বলিলাম, "সে যা হয় হোক, কিন্তু রজনী বউদিদি যদি তাঁর স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ সঠিক না পেলেন তা হলে দিনের বেলাই বা তিনি বৈধব্য অবলম্বন করেন কেন ?"

হেমনলিনী বলিলেন, "বারো বৎসর পর্যন্ত তিনি একেবারেই বৈধব্য অবলম্বন করেন নি। বারো বৎসর উত্তীর্ণ হলে স্বামীরই কল্যাণের জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বিভূতিদাদার কুশপুত্তলী দাহ আর শ্রাদ্ধ করিয়ে বিধবা হন। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিনের রাত্রেও তিনি বিধবার সজ্জা পরিত্যাগ করে সধবার বেশ ধারণ করেছিলেন। বিভূতিদাদার শ্রাদ্ধের দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি দিনের বেলা আটটা সাড়ে-আটটা থেকে চারটে সাড়ে-চারটে পর্যন্ত দেহে মনে ষোল আনা বিধবা, আবার রাত্রি আটটা সাড়ে-আটটা থেকে শেষ রাত্রি চারটে সাড়ে-চারটে পর্যন্ত দেহে মনে ষোল আনা সধবা।"

ক্ষণকাল গভীর বিস্ময়ের সহিত রজনী বউদিদির কাহিনী মনে মনে আলোচনা করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, আপনি যে বললেন, প্রত্যহ রাত্রি দশটার সময়ে রজনী বউদিদি উত্তর:মুখে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকেন, সে ব্যাপারটা কী ?"

হেমনলিনী বলিলেন, "সে কথা কেউ বলতে পারে না। বোষ্টমপাড়ার সরলাদিদির সঙ্গে রজনী বউদিদির সকলের চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গতা। তাঁকে পর্যন্ত রজনী বউদিদি ও-কথা বলেন নি। সরলাদিদি পেড়াপিড়ি করলে 'খেয়াল' 'পাগলামি' বলে কথাটা উড়িয়ে দেন।"

মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এ রহস্য ভেদ করিতেই হইবে।

দুই-তিন দিনের মধ্যেই রজনী বউদিদির সঙ্গে একটা হৃদ্যতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলাম। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সেই হৃদ্যতা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইল। রজনী বউদিদির গৃহ হইল আমার পক্ষে অবারিতদ্বার। মনে মনে কেমন বিশ্বাস হইল, বোষ্টমপাড়ার সরলাদিদিকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছি।

পূজার কয়েক দিনই বৈকালের দিকে রজনী বউদিদির গৃহে আমার চা-পানের নিমন্ত্রণ থাকিতেছিল। দশমীর দিন সন্ধ্যার পর প্রণাম করিতে গিয়া রজনী বউদিদির নিকট হইতে পরদিন রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ আদায় করিয়া আসিলাম। রজনী বউদিদির ইচ্ছা ছিল, দ্বাদশীর দিন দ্বিপ্রহরে আমাকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু আমি বলিয়া কহিয়া নিমন্ত্রণটা একক এবং একাদশীর দিন রাত্রে করাইলাম।

রজনী বউদিদি স্বীকৃত হইলেন ; কিন্তু বলিলেন, "তা হলে তুমি সকাল সকাল এসো বসন্ত,—নটার মধ্যেই তোমাকে খাইয়ে দেব। পাড়াগাঁয়ে রাত বেশি হলে তোমার অসুবিধে হবে।"

পরদিন সকাল সকালই গেলাম। কিন্তু রজনী বউদিদি যখন খাবারের কথা বলিলেন, আপত্তি করিলাম ; বলিলাম, "তাই কখনও হয় বউদিদি ? সমস্ত দিন

অভুক্ত থেকে সংকল্প করে তীর্থভূমিতে এসেছি—"

আমাকে কথা শেস করিতে না দিয়া বিস্মিতকণ্ঠে রজনী বউদিদি বলিলেন, "সমস্ত দিন তুমি অভুক্ত আছ বসন্ত ?"

সহাস্য মুখে বলিলাম, "আছি।"

"কেন ?"

বলিলাম, "যোল আনা পুণ্য অর্জন করতে হলে অভুক্ত থেকেই দেবতাদর্শন করতে হয়।"

বিস্ফারিত নেত্রে রজনী বউদিদি বলিলেন, "কিন্তু দেবতা কে ?"

বলিলাম, "স্বর্গীয় প্রেমের এই তীর্থভূমির যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি আর কিছুক্ষণ পরে উত্তরমুখী হয়ে অরুন্ধতী দর্শন করবেন।"

আমার কথা শুনিয়া রজনী বউদিদি উগ্র বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "এ কথা তোমাকে কে বললে বসন্ত ?" পর-মুহূর্তেই নিজেকে সংশোধিত করিয়া লইয়া বলিলেন, "কেউ তো বলতে পারে না। এ কথা তুমি কেমন করে জানলে ?"

কৌতুক করিয়া বলিলাম, "নিদিধ্যাসনের দ্বারা। মানুষ যখন অনন্য মনে প্রগাঢ় ধ্যানের সাহায্যে কোনও বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করে, তখন সে দুজ্ঞেয় রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়। আচ্ছা, আপনার মতো সতী স্ত্রীলোক একমাত্র অরুন্ধতী ছাড়া উত্তর আকাশে আর কী দেখতে পারেন বলুন তো ?"

"কিন্তু ও তো আমার পাগলামি ভাই।"

বলিলাম, "তা হলে সমস্ত দিন অভুক্ত থেকে অরুন্ধতী-দর্শনকালে আপনাকে দর্শন করবার এই সংকল্পও আমার পাগলামি।"

রজনী বউদিদি কোনও উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সহানুভূতির বেদনায় মানুষের মন যখন একবার উন্মুক্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন আর তাহা সহজে সংকুচিত না হইয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেই থাকে।

সেদিন যথাসময়ে রজনী বউদিদি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অরুন্ধতী দর্শন করিলাম।

মেসোপোটেমিয়া যাইবার সময়ে বিভূতিদাদা মেসোপোটেমিয়া এবং বঙ্গদেশের সময় মিলাইয়া প্রত্যহ রাত্রি পৌনে দশটার সময়ে রজনী বউদিদিকে অরুন্ধতীর উপর দৃষ্টিপাত করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তিনিও সেই সময়ে মেসোপোটেমিয়া হইতে অরুন্ধতীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রতিদিন রজনী বউদিদির সহিত মিলিত হইবেন। গত ষোল বৎসর ধরিয়া রজনী বউদিদি একান্ত নিষ্ঠার সহিত সেই ব্যবস্থা পালন করিয়া আসিতেছেন।

রজনী বউদিদির নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, তাঁহার জীবদ্দশায় এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। সেই জন্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হেমনলিনীকে বলিয়া আসিতে পারি নাই যে, বোষ্টমপাড়ার সরলাদিদিকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছি।

স্মৃতিকথা

আট

আমার অসুখের খুব বাড়াবাড়ির সময়ে আরোগ্য-কামনায় কালীপূজা মানত করা হয়েছিল। মুঙ্গের থেকে আমাদের কুল-পুরোহিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য এসেছেন পূজা করতে।

প্রত্যুষেই হাসিতে ও কাশিতে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছিল। গল্প করতে করতে তিনি যত হাসেন, তামাক খেতে খেতে তত কাশেন। যখন তামাক খেতে খেতে গল্প করেন, তখন হাসি ও কাশির ঐকতানিক লহরা চলতে থাকে। উগ্র গৌরবর্ণ দেহ, তার উপর খাড়া নাকে আর মাথার টাকে পুরাদস্তুর বামুন-পণ্ডিতি চেহারা; সরল অন্তঃকরণ, আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

স্থানীয় কারিকরের বাড়ি থেকে প্রতিমা গড়িয়ে এসেছে। সারাদিন মহা উৎসাহ ও উল্লাসে পূজার উদ্যোগ-আয়োজন চলার পর রাত্রে পূজা আরম্ভ হয়েছে। অন্দর-মহলের যে দ্বিতল কক্ষে আমি থাকি, একেবারে পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ব'লে তার জানলা চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে খোলে। আমার শয্যা থেকে পূজার হৈ চৈ, এমন কি, মন্ত্রপাঠের অস্পষ্ট গুঞ্জন পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি।

বাড়ির অধিকাংশ লোকই চণ্ডীমণ্ডপ-বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। দ্বিতলের ঘরে আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছেন আমার মেজ ভ্রাতৃজায়া—শ্রীযুত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বর্গীয়া শৈবলিনী দেবী। বয়সে ইনি আমার চেয়ে ঠিক দু বৎসরের বড় ছিলেন। স্বভাবের মাধুর্যে ও অন্তরের সুস্পষ্ট সরলতা-গুণে ইনি আমাদের পরিবারস্থ সকলের সবিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। আমি তাকে 'শৈলদিদি ব'লে সম্বোধন করতাম।

কিছুক্ষণ থেকে বেশ জোরে বাজনা বাজছিল; তারপর অল্প একটু বিরামের পর খুব জোরে বেজে উঠেই সহসা একেবারে থেমে গেল। হঠাৎ সব চুপচাপ শুনশান্।

আমি বললাম, "শৈলদিদি বুঝতে পারছ, কী হয়েছে?"

সকৌতূহলে শৈলদিদি বললেন, "কী হয়েছে?"

"পাঁঠা বেধে গেছে।"

বলি বেধে যাওয়া অতীব অশুভজনক লক্ষণ। তার সরল অর্থ, পূজায় দেবী প্রসন্না হন নি; ফলে ব্যাধির পুনরাক্রমণ এবং শেষ পর্যন্ত শোচনীয় দুর্ঘটনা।

আমার কথা শুনে শৈলদিদি বেচারার মুখ শুকিয়ে চুন! এত সেবা-শুশ্রূষা, সাধ্য-সাধনা রাত-জাগাজাগির পর কূলে-তোলা এমন সাধের ঠাকুরপোটিকে যদি সামান্য একটা বলির ফেরে পুনরায় জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, তার চেয়ে হৃদয়বিদারক কাণ্ড আর কী হ'তে পারে! আমাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে,

আসলে বোধ হয় নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে, যথাসাধ্য দৃঢ়তা সঞ্চয় ক'রে বললেন, "কক্ষনো না, ও তুমি ভুল বুঝছ।"

বললাম, "ভুল বুঝেছি কি ঠিক বুঝেছি, নিচে গেলেই জানতে পারবে। বলিদানের বাজনা শোনায় এ দু কান এত পাকা যে, ভুল বোঝবার উপায় নেই।"

আমার অনুমান অবশ্যই ভুল হয় নি—পাঁঠা বেধে গিয়েছিল। আমাদের বাড়িতে ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর ধ'রে, জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে বলি হ'য়ে আসছে। প্রথম প্রথম এক দিনের পূজায় নয়টা ক'রে ছাগ বলি হতো কিন্তু এ পর্যন্ত কোনদিন এরূপ ব্যাপার ঘটে নি। একটা গুরুতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় পিতাঠাকুর মহাশয় ও মাতাঠাকুরাণী প্রতিমার সম্মুখে উপুড় হ'য়ে পড়লেন।

এই মহা অকল্যাণের ব্যাপারের প্রতিকার অবশ্য আছে; কিন্তু সেই কঠিন ও দুঃসাধ্য অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সামান্য মাত্রও ত্রুটি ঘটলে স্বয়ং হোতার সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা। সেইজন্য সহজে কেউ এই দুষ্কর কার্যে ব্রতী হ'তে চায় না।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য কিন্তু প্রস্তুত হলেন। তিনি আমাদের বহুদিনের কুলপুরোহিত, আত্মীয়ের মতোই নিজেকে বিবেচনা করেন,—আমাদের বংশের এত বড় একটা অমঙ্গল অনিরাকৃত রেখে দেবার ভীরুতাকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন না। তা ছাড়া মাতাঠাকুরাণীর ও পিতাঠাকুর মহাশয়ের কাতরতা দেখে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন।

তখন সেই মহাহোমের আয়োজনে সমিধ্ ও গব্যঘৃত সংগ্রহের জন্য দিকে দিকে উদ্যমশীল লোক ধাবিত হলো। বিল্বকাষ্ঠ ও ঘৃত বাড়িতেও কিছু পরিমাণ ছিল, আপতত তাই দিয়েই কার্য আরম্ভ হ'য়ে গেল। ঐ অখণ্ডিত ছাগদেহ, ছুরি-বঁটি প্রভৃতি অস্ত্রের সাহায্যে অতি ছোট ছোট টুকরায় কাটা হ'তে লাগল। তারপর প্রবলভাবে হোমানল প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠলে মন্ত্র পাঠ ক'রে ক'রে এক-একটি মাংসের টুকরা—মায় অস্থি, রক্ত ও লোম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হ'তে লাগল। মাংসখণ্ডের দহনকার্য যাতে ত্বরিত এবং পরিপূর্ণ হয়—অর্থাৎ কুণ্ডের ভিতর হ'তে কোনপ্রকার দুর্গন্ধ বায়ুমণ্ডলে নিষ্ক্রান্ত হ'তে না পারে তজ্জন্য ঘন ঘন সমিধ্ ও গব্যঘৃতের প্রয়োগে যজ্ঞাগ্নিকে চরম মাত্রায় জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। গভীর নিষ্ঠার সহিত সারারাত্রি ধ'রে এই দুরূহকর কার্য চলল। অবশেষে শেষ মাংসখণ্ড যখন যজ্ঞকুণ্ডে অর্পিত হলো তখন পূর্বাকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে।

পাঁঠা বেধে যাওয়ার কথা আমি যে জানতে পেরেছি, তা রাষ্ট্র হ'য়ে গিয়েছিল। মা এসে আমার মাথায় ফুল-বিল্বপত্র ছুঁইয়ে চরণামৃত খাইয়ে দিলেন। ক্ষণকাল পরে পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমাকে শান্তিজল দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, "মা-কালী পূজায় খুব প্রসন্ন হয়েছেন উপেন। সারারাত্রি ধরে আস্ত ছাগটি তিনি একলা খেয়েছেন; আমাদের জন্য একবিন্দুও প্রসাদ রাখেন নি।" বলে

পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর সেই পেটেণ্ট হাসি হেসে উঠলেন।

শুনলাম, পাঁঠা বেধে গিয়ে হোম যদি সুসম্পন্ন হয়, তা হলে বৎসরাবধি সৌভাগ্যের আর আদি-অন্ত থাকে না। সেরূপ পাঁঠা বেধে যাওয়ার কল্যাণ, পাঁঠা না-বেধে যাওয়ার কল্যাণকে বহু মাইল পশ্চাতে ফেলে যায়।

স্বভাবত আতি অবিশ্বাসী। কিন্তু যে কারণেই হোক, পাঁঠা বেধে যাওয়ার পর এক বৎসর কাল আমাদের, চলিত ভাষায় যাকে বলে—'ধূলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়,' ঠিক সেই ব্যাপারই হয়েছিল। আমাদের মনের মধ্যে সংস্কার এবং কুসংস্কারের মূলগুলি হয়তো এইরূপ কাকতালীয় ঘটনার সাহায্যেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

নয়

শরতের ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। জন্মকালে বোধ হয় তার মাথায় চুল খুব কম ছিল বলে ঐ নামে তাকে ডাকা হতো। কিন্তু দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে মামার বাড়ি আসার পর তার ন্যাড়া নাম খুব বেশি চলে নি। শরতের পিতা মতিদাদা আর মাতা আমাদের মেজদিদি শরৎকে ন্যাড়া বলে ডাকতেন; কিন্তু কখনো-সখনো, কতকটা শখ করে, এক-আধজন ছাড়া আর বড় কেউ ও-নামে ডাকত না। এমন কি, শেষাশেষি মতিদাদা এবং মেজদিদিও ন্যাড়া ও শরৎ দুই নামেই মিলিয়েমিশিয়ে ডাকা আরম্ভ করেছিলেন, তা বেশ মনে পড়ে। কিন্তু কি জানি কেন, মতিদাদার মুখে শুনে শুনেই বোধ করি, আদমপুর ক্লাবে শরতের ন্যাড়া নাম প্রায় ষোল আনা চলিত হয়ে গিয়েছিল।

আদমপুর ক্লাবের প্রধান ক্রিয়াশীলতা ছিল সঙ্গীতচর্চা, টেনিস খেলা, বিলিয়ার্ডস খেলা ও মাঝে মাঝে থিয়েটারের নাটক অভিনয় করা। কিন্তু সর্বপ্রধান ক্রিয়াশীলতা ছিল আড্ডা দেওয়া। মফস্বলে এবং কলিকাতায় অনেক ক্লাব দেখেছি, কিছু কিছু ক্লাব আমরা নিজেরাও চালিয়েছি; কিন্তু আদমপুর ক্লাবের মতো অমন সুনিবিড়ভাবে জমা ও মজা আর একটি ক্লাব কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আদমপুর ক্লাবের প্রধান ক্রিস্টাল ছিলেন রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র। তাঁকে অবলম্বন করে অন্য যে সকল ক্রিস্টাল জোট বেঁধেছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম,—শরৎ মজুমদার, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র, উপীনা (উপেন্দ্র) লাহিড়ী, সতীশ বসু, মণি মজুমদার, সুকুমার মৈত্র, রাজেন মজুমদার (শ্রীকান্ত'র অন্তর্গত ইন্দ্রনাথ চরিত্রের উৎস বলে অনুমিত) ও রাজেন গাছি। আরও কয়েকজন প্রধান সদস্যের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু তাঁদের নাম মনে করতে পারছি নে। বহুবিধ

গুণ-সমষ্টির প্রভাবে কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন কেন্দ্র হবার উপযুক্ত পাত্র। সুশ্রী আকৃতি, সুমিষ্ট প্রকৃতি, অমায়িক ব্যবহার, উদার অন্তঃকরণ, দরাজ হস্ত—এ সকল গুণ তো তাঁর ছিলই; তদুপরি তিনি ছিলেন অতিশয় সুকণ্ঠ গায়ক; হার্মোনিয়ম বাজাতে পারতেন এত ভালো যে, আড়াল থেকে শুনলে মনে হতো না, যা বাজছে তা হার্মোনিয়মের মতো সামান্য যন্ত্র। টেনিসে তাঁর খেলার শৈলী ছিল উচ্চাঙ্গের; আর বিলিয়ার্ডসে ভাগলপুরে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ,—শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই নয়, ইউরোপীয়ানদেরও মধ্যে। ভালো বিলিয়ার্ডস খেলোয়াড় উচ্চ ইংরেজ রাজকর্মচারী এলে রাজা সাহেব পুত্রের সহিত বিলিয়ার্ডস খেলবার জন্য তাঁদের আমন্ত্রিত করতেন। কিন্তু কদাচিৎ কারও ভাগ্যে কুমার সাহেবকে পরাজিত করবার গৌরব দেখা যেত।

আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আদমপুর ক্লাবের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত ছিলাম। বয়সে আমরা আদমপুর ক্লাবের সদস্যদের চেয়ে মোটামুটি বছর ছয়-সাতের ছোট ছিলাম বলে ক্লাবের খাশ-মহলের পরিধির মধ্যে আমাদের স্থান ছিল না বটে, কিন্তু তার অব্যবহিত বহির্ভাগে যতটা সান্নিধ্য বজায় রাখা সম্ভব, তা আমরা রেখে চলতাম। টেনিস-গ্রাউণ্ডে আমরা কোর্টের বাইরে নিকটেই অবস্থান করতাম, আর সুযোগ পেলেই বল কুড়িয়ে দিতাম; যখন মসলিস বসত, আমরা ঘরের বাইরে বারান্দায় তাঁবেদারির অপেক্ষায় থাকতাম; কোনও ফাই-ফরমাশ পেলে তা তামিল করে কৃত-কৃতার্থ হতাম। আমাদের আনুগত্য একেবারে অপুরস্কৃত যেত না; পৃষ্ঠপোষকোচিত আচরণ এবং মাঝে মাঝে তদপেক্ষ সারবান পদার্থের দ্বারা আমরা আপ্যায়িত হতাম।

নাটক অভিনয়ের সময় উপস্থিত হলে আমরা কিন্তু অনিবার্য হয়ে পড়তাম। উদ্যোগ পর্ব থেকেই ক্লাবের সীমান্তরেখা অতিক্রমপূর্বক খাশ-মহলের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে নানাবিধ উপায়ে আমরা আমাদের মূল্যবানতার প্রমাণ দিতাম। পার্ট নকল করা থেকে আরম্ভ করে অভিনয়-রজনীতে সীন ওঠা-নামার দড়ি টানাটানি পর্যন্ত যাবতীয় তল্পিদারির কাজ আমরা সানন্দে সম্পন্ন করতাম।

একবার বিখ্যাত নাট্যকার অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনের অভিনয় হচ্ছে। আমি একটা উইংসের পাশে সীনের দড়ি ধরে বসে আছি; প্রম্পটার আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রম্পটিং করছে, পাশে আর একজন জলন্ত মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে প্রম্পটারকে আলো দেখাচ্ছে। হঠাৎ আমি উপর দিকে চাইতেই—এমনই যোগাযোগের ব্যাপার—গলন্ত মোম এসে পড়ল একেবারে আমার ডান চোখের ভিতর। চোখের যন্ত্রণার তো কথাই নেই, সমস্ত শরীর একটা দুর্বিষহ বেদনায় আর্ত হয়ে উঠল। মনে হলো যেন চক্ষুর ভিতর দিয়ে এক রাশ বিদ্যুৎপ্রবাহ সারা দেহের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

দুই চক্ষু বুজে প্রাণপণে কষ্ট সহ্য করে সীনের দড়ি টেনে ধ'রে কোনও প্রকারে বসে রইলাম। মিনিট পাঁচ-সাত পরে দৃশ্য পরিবর্তিত হতেই দড়ি ছেড়ে দিয়ে

প্রম্পটারকে দু'চার কথায় আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বাড়ি ছুট দিলাম।

দিন চারেক পরে আদমপুর ক্লাবে গেছি। তখনও চোখটা সামান্য লাল হয়ে রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়েই কুমার সতীশ তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "শাবাশ! আমি সুকুমারের মুখে সব শুনেছি। তুমি যে অত যন্ত্রণার মধ্যেও সীনের দড়ি ছেড়ে দিয়ে অভিনয়ের মধ্যে একটা গণ্ডগোল ঘটাও নি, এর দ্বারা তুমি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছ।" তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "আমি যদি ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট হতাম, তা হলে তোমাকে এ সৎকার্যের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রশ মেডেল দিতাম।"

শুনে আমার মনে হলো, হায়, হায়! আমার দু চোখেই কেন সেদিন মোমবাতি পড়ে নি!

আমার ডান চক্ষু লক্ষ্য করে কুমার সতীশ বললেন, "তোমার চোখ তো এখনও লাল হয়ে রয়েছে উপেন!"

বললাম "এখন তো প্রায় নেই, এর চেয়েও অনেক বেশি লাল হয়ে ছিল।"

বক্রকণ্ঠে কুমার সতীশ বলিলেন, "তা আমি জানি, জবাফুলের মতো লাল হয়েছিল, ল্যাড়ার মুখে শুনেছি।"

ল্যাড়া—অর্থাৎ ন্যাড়া, অর্থাৎ পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আদমপুর ক্লাবের অধিকাংশ সদস্য শরৎচন্দ্রকে ন্যাড়ার পরিবর্তে ল্যাড়া বলে ডাকতেন। আমার বিশ্বাস, আদমপুর ক্লাবের সদস্যদের ব্যবহৃত এই ল্যাড়া শব্দটিকেই শরৎচন্দ্র ইউরোপীয় ছাঁচে ফেলে শুদ্ধি করে নিয়ে Lara-য় দাঁড় করিয়েছিলেন। তখনকার দিনের অনেক কাগজপত্রে, অনেক খাতায় বইয়ে শরৎচন্দ্র নিজের নাম সই করতেন—St. C. Lara. আমরা বুঝতাম তার অর্থ, শরৎচন্দ্র ল্যাড়া; কিন্তু কোনও অজানা লোক আচমকা দেখে যদি মনে করত, হল্যাণ্ড কিংবা বেলজিয়াম দেশীয় সেণ্ট ক্রিস্টোফার লারা নামক কোনও সাধু মহাপুরুষ ঐভাবে নিজের নাম দস্তখৎ করেছেন, তা হলে তাকে দোষ দেওয়া চলত না।

যে সকল পরিবেশ অথবা অবস্থার মধ্যে থেকে শরৎচন্দ্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, আদমপুর ক্লাব তন্মধ্যে অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন পর্দার মতো ক্লাবের সদস্যগণ এক স্বরগ্রামের অন্তর্গত হলেও প্রত্যেকে বিভিন্ন সুরের প্রকাশক ছিলেন। এরূপ একটি স্বরগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মানবচরিত্র অনুশীলন করার সুযোগ লাভ দুর্লভ সৌভাগ্য এবং সে অনুশীলনের মূল্যও যথেষ্ট বেশি।

আদমপুর ক্লাব শরৎচন্দ্রের জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

দশ

চোখের সামনে মৃত্যু ঘটতে জীবনে অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার প্রথমবারের অভিজ্ঞতা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই করুণ; আর তেমনই আমার মনের মধ্যে কিছুকাল ধ'রে গভীরভাবে একটা বৈরাগ্য-মিশ্রিত আতঙ্কের ছায়া বিস্তার ক'রে রাখার বিষয়ে অদ্বিতীয়। আতঙ্ক নিজের জীবনের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে নয়; মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাসনা-কামনা, কল্পনা-পরিকল্পনার ভিত্তি যে এত ভঙ্গুর সেই কথা ভেবে। যে সূত্রের উপর জীবন বিলম্বিত হ'য়ে থাকে, যে কোনো মুহূর্তে তা ছিন্ন হ'য়ে যাবার মতো দুর্বল, সে কথা জ্ঞানের মধ্যে জানা ছিল, কিন্তু চোখের উপর এমন ক'রে দেখা ছিল না।

হাইকোর্টের পূজার ছুটি হ'তে পরিবারস্থ সকলে ভাগলপুরে চ'লে গেলেন। ভবানীপুরের বাসায় তালা পড়ল। তখনকার দিনে বাড়িতে তালা লাগিয়ে, একটু নজর রাখবার জন্য প্রতিবেশীদের ব'লে ক'য়ে বিদেশে গমন করা চলত। আজকালকার মতো চোরেরা তখন এতটা তৎপর হ'য়ে ওঠে নি। এখন বাড়িতে লোক না রেখে, শুধু তালা বন্ধ ক'রে গেলে, রেলগাড়ি বর্ধমান পৌঁছবার সবুর সয় না, তারই মধ্যে তালা-চাবি ভেঙে ভালো ভালো মূল্যবান সামগ্রী বেছে-বুছে রামের ঘর হ'তে শ্যামের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়।

আমার কলেজ বন্ধ হ'তে তখনও দিন কুড়িক দেরি আছে। আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে বউবাজারে ৪নং দুর্গা পিথুড়ীর লেনে কাকার বাসায় এসে উঠলাম। আমার কাকা অক্ষয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার কালেক্টারিতে চাকরি করতেন। তাঁর তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ ললিতমোহন, মধ্যম বঙ্কিমবিহারী ও কনিষ্ঠ বিপিনবিহারী। এই বিপিনবিহারীই বর্তমানে সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় এম. এল. এ.।

তখন বিপিন নিতান্ত লাজুক মুখ-চোরা শান্তপ্রকৃতির বালক ছিল। সে সময়ে তাকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে, ভবিষ্যতে একদিন এই ফুটফুটে ছিপছিপে নিরীহ বালকটি একজন দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল হ'য়ে পঞ্চাশজন শত্রুর মহড়া নিতে সক্ষম হবে এবং উত্তরকালে কংগ্রেসের পতাকাতলে উপস্থিত হ'য়ে একজন উচ্চশ্রেণীর অকৃত্রিম দেশকর্মী ব'লে নিজেকে প্রতিপন্ন করবে। বিপিন যখন দুর্দান্তভাবে ক্রিয়াশীল, তখন তাঁকে নিয়ে প্রবল ইংরেজ পুলিসের দুরূহ সমস্যার দুস্তর সলিলে নাকানি-চোবানি খাবার অন্ত ছিল না। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছিলাম তৎকালীন ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের কন্‌ফিডেন্সিয়াল পুলিস-রিপোর্টের পাতায় পাতায় বিপিন গাঙ্গুলী'র নামোল্লেখ দেখা যেত। একবার পুলিস কর্তৃক বিপিন ধৃত হওয়ার সংবাদ লাভ ক'রে সিমলার গর্ডন কাসেলে হোমে ডিপার্টমেণ্টের একজন ইংরেজ কর্মচারীকে

অপর এক ইংরেজ কর্মচারীর নিকট উপস্থিত হ'য়ে উল্লসিত কণ্ঠে বলতে শোনা গিয়াছিল,—That terrible Bepin Ganguli (বেপিন গাঙ্গুলী) has been caught !

চোখে ধুলো ছিটিয়ে পালিয়ে যাবার কৌশল আছে সে কথা শুনেছি। কিন্তু ধূলির সাহায্য একদম না নিয়ে সম্পূর্ণ এক অভিনব উপায়ে বিপিন ভায়া একবার পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করেছিলেন। সে কাহিনী শুনলে পাঠকেরা নিশ্চয়ই একটু কৌতুক বোধ করবেন।

অতি প্রত্যুষে একদিন পুলিস এসে কাকার বাড়ির সদর ঘেরাও করে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ভিতর থেকে কেউ দরজা খুললেই বিপিনকে ধরবার ব্যবস্থা করবে। সেদিন বিপিন গৃহে উপস্থিত আছে। সামনের বাড়ি থেকে ইশারা-ইঙ্গিতের সাহায্যে নির্বাক বার্তা পৌঁছে গেছে। পলায়ন করতে হ'লে পশ্চিম দিকের যে সদর-দরজায় পুলিস মোতায়েন রয়েছে, তাই দিয়েই করতে হয়; গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। কিছুক্ষণ পরে খট ক'রে খিল খোলার শব্দ হ'য়ে সুপ্রশস্ত দরজা প্রসারিত হ'য়ে খুলে গেল। বাইরের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য পুলিস সবে মাত্র পা বাড়িয়েছে, এমন সময়ে চক্ষের নিমেষে অতর্কিতে সাপটে মাল-কোঁচা মারা একটা শ্বেতবর্ণের পদার্থ সিংহবিক্রমে লাফ দিয়ে ইন্সপেক্টারের প্রায় কাঁধ বরাবর উঁচু হ'য়ে একেবারে গলির উপর পড়ল; তারপর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে বউবাজার স্ট্রীটের দিক ছুট দিলে। হকচকিয়ে গিয়ে পুলিসরা সমস্বরে হাঁ-হাঁ রবে চিৎকার ক'রে উঠল। গলিতে দুই জায়গায় দুজন কন্সটেবল মোতায়েন ছিল, তারা একাদিক্রমে ঐ ছুটন্ত পদার্থকে জাপটে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আটকে রাখতে পারলে না—দুই ঝট্‌কায় দুই কন্সটেবলের আলিঙ্গন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে নগ্নপদে দুদ্দাড় ক'রে দৌড়ে ঐ পদার্থ বউবাজার স্ট্রীটের ফুটপাতের পথচারীদের মধ্যে গিয়ে মিশল।

বিপিন গাঙ্গুলী কন্সটেবলদের কারায়ত্ত হলো না; যা কারায়ত্ত হলো তা বিপিন গাঙ্গুলীর দেহের খানিকটা করে সর্ষপ তৈল। পুলিসের আগমনসংবাদ পেয়েই বিপিন মাল-কোঁচা মেরে সমস্ত দেহে বেশ ক'রে সরিষার তৈল মেখে নিয়েছিল। দু পায়ের আড়াই-সেরী বুট প'রে ধপড় ধপড় শব্দ করতে করতে বিপিনকে অনুসরণ ক'রে কন্সটেবলরা যখন বউবাজার স্ট্রীটের ফুটপাতে এসে উপস্থিত হলো তখন বোধ হয় নিকটবর্তী কোনও গুপ্ত ঘাঁটিতে প্রবেশ ক'রে বিপিন কলের জলের ঝরনা খুলে স্নানে বসেছে।

এ গল্পটি আমার শোনা গল্প কিন্তু এত বিশস্ত সূত্রে শোনা যে, এর সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

বংশগুণাধিকার (heredity) নামে একটা যে মতবাদ প্রচলিত আছে, বিপিনের ক্ষেত্রে তার ধারা খুঁজে পাওয়া যায় না। যাকে বলে মাটির মানুষ, কাকা ও খুড়িমা তাই ছিলেন। তবে বিপিন এত শৌর্য অধিকার করলে কোথা

'হ'তে? মানুষের মধ্যে 'ভোলানাথ' ব'লে কোন কিছু বস্তু যদি থাকে, কাকা ছিলেন তাই—আকৃতিতেও, প্রকৃতিতেও। উগ্র গৌরবর্ণের নাতিস্থূল দেহ, মুখাবয়বে সরলতা এবং নির্মলতার এমন সুস্পষ্ট ছাপ যে, তাঁর শত্রুও মনে করত না, প্ররোচিত হ'য়েও তিনি কারও অনিষ্ট করতে পারেন।

আমি কাকার বাসায় আসবার চার-পাঁচ দিন পরেই ভাগলপুর থেকে শরৎচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। আদমপুর ক্লাবে থিয়েটার হবে, স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করবার উপযুক্ত দুই-একটি বালক সংগ্রহ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। তা ছাড়া কিছু সাজসজ্জা ক্রয় অথবা ভাড়া করবার প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল।

শরৎচন্দ্র আসার পর প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে আমরা উভয়ে মিলিত হতাম। কাছেই কোনও মেসে শরৎচন্দ্র থাকতেন। আমাদের কাজ ছিল পথে পথে ঘুরে বেড়ানো, বউবাজারের চোরাবাজারে পুরাতন জিনিসপত্র ঘাঁটা ও কিছু কিছু কেনা এবং ক্ষুধার উদ্রেক হ'লে, এমন কি না হ'লেও, দোকানে ঢুকে পেট ভ'রে খাবার খাওয়া। একদিন শরৎ ও আমি থিয়েটার দেখেছিলাম। কোন্ থিয়েটার তা মনে পড়ছে না, কিন্তু সুলিখিত ঝরঝরে একটি নাটকের সু-অভিনয় দেখে আমরা দুজনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। নাটকটির নাম "চক্ষুদান" অথবা "দৃষ্টিদান" অথবা ঐ রকম আর কিছু। সুমিষ্ট কণ্ঠে গাওয়া নাটকের অন্তর্গত একটি গান আমাদের অতিশয় ভালো লেগেছিল। তার প্রথম লাইন মনে আছে, 'বল বল আবার বল, ভালো কথার মিছেও ভালো।

একদিন, কি জানি কেন, রাত্রি দুটো-আড়াইটার সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শোবার সময়ে সহজ বাড়ি দেখেই শুয়েছিলাম,—অন্তত আমি তখন সেই রকমই বুঝেছিলাম; জেগে দেখি, বাড়িময় অসম্ভব চঞ্চলতা; চাপা গলায় অস্ফুট কথোপকথন, সিঁড়িতে ত্বরিত ওঠা-নামার পদধ্বনি, সকলের চলনে-বলনে একটা সন্ত্রাসের ভঙ্গি। উদ্বিগ্ন চিত্তে শয্যাত্যাগ করে উঠে অবগত হলাম, কালীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে দুবার এক্লাম্সিয়া ফিট-এর আক্রমণও হয়ে গেছে।

কালী কাকার পনের-ষোল বছরের পরমাসুন্দরী কন্যা, আসন্ন প্রসবের প্রতীক্ষায় পিতা-মাতা-আত্মীয়-পরিজনের আদর ও যত্নের মধ্যে কিছুকাল হতে পিত্রালয়ে বাস করছে। এইবার তার প্রথম প্রসব।

কালীর জন্য, কি জানি কেন, আমার মনে একটা উদ্বেগ লেগে থাকত। অতি যত্নের ফলেই বোধ হয়, দেহ তার একটু স্থূল হ'য়ে গেছে; অলস বিষণ্ণ-ভাবে সর্বদা শুয়ে বসে থাকে; কাজকর্ম কিছুই করে না, অথবা করতে দেওয়া হয় না; পা দুটি বেশ একটু ফোলা-ফোলা। মনে মনে ভাবতাম, কী করে বেচারা ভালোয়-ভালোয় সন্তান প্রসব করবে!

শুনলাম, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন মনে হওয়ায় ধাত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ললিতদাদা গেছেন ডাক্তার কেদার দাসকে নিয়ে আসবার জন্য। কেদারনাথ দাস তখনকার

দিনের কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসূতি-চিকিৎসক। তাঁর সুনাম ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

একজন সহকারী ডাক্তার সহ কেদার দাস যখন উপস্থিত হলেন, ততক্ষণে আরও একবার ফিট হয়েছে। বিবরণ শুনে ও রোগী পরীক্ষা করে কেদার দাস মুখ বিকৃত করলেন। একলাম্‌সিয়ার ফিট একবার হওয়াই যথেষ্ট আশঙ্কার ব্যাপার, এ ক্ষেত্রে তো তিন-তিন বার। ডক্টর দাসের মুখ থেকে বিশেষ কিছু আশা-ভরসার কথা পাওয়া গেল না; কিন্তু তিনি সাহসী সৈনিকের ন্যায় অ্যাপ্রন পরিধান করে, যন্ত্রপাতি নিয়ে অবিলম্বে রোগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

ঘরের ভিতরে ডাক্তারগণ, ধাত্রী ও খুড়িমা ছিলেন; আমরা ঘরের সম্মুখে উঠানে দাঁড়িয়ে উদ্বেগ-ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে প্রসূতি-কক্ষের দ্বার খুলে কেদার দাস যখন বেরিয়ে এলেন, তখন প্রাঙ্গণে প্রত্যূষের স্তিমিত আলোক এসে পড়েছে।

শুনলাম, শিশুটি রক্ষা পায় নি, কিন্তু প্রসূতি জীবিত আছে; তবে গভীর অজ্ঞান অবস্থায় নিমগ্ন। ক্লোরোফর্ম হয়তো সে অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী।

ডক্টর দাসের পিছনে পিছনে আমরা বাইরের ঘরে এসে হাজির হলাম। সেবা ও ঔষধ সম্বন্ধে ধাত্রী ও ললিতদাকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়ে ডক্টর দাস প্রস্থানোদ্যত হলেন। কাতরকণ্ঠে কাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তারবাবু, মেয়েটা বাঁচবে তো?"

কেদার দাস উত্তর দিলেন, "সে কথা তো ডাক্তাররা বলতে পারে না। তবে মেয়েটি যে প্রসব করানোর চোট কাটিয়ে উঠেছে, এ একটা আশার কথা।"

যাবার সময়ে ডক্টর দাস বলে গেলেন, সেবা-শুশ্রূষার জন্য কলেজের দুটি ছাত্রকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

সকাল সাতটা আন্দাজ যথারীতি শরৎ এসে হাজির হলো। এক রাত্রির ফেরে বাড়ির এরূপ অবস্থান্তর দেখে সে তো অবাক। সেদিন তার আর মেসে ফিরে যাওয়া হলো না।

বেলা আড়াইটে আন্দাজ বিনা নোটিসে কেদার দাস এসে হাজির। সঙ্গে দুটি মেডিক্যাল ছাত্র। বেলা নয়টার সময় যে দুটি ছাত্রকে পাঠিয়েছিলেন, তাদের বদলি।

তখনও কালীর অজ্ঞান অবস্থা চলেছে। পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ভালোও নয় মন্দও নয়,—একই অবস্থা। যাই হোক, আমরা তাতেই একটু আশ্বস্ত হলাম—রোগের সমভাবও ভালো। ভাটা বন্ধ হ'য়ে জীবন-নদী যদি থমথমিয়ে থাকে, তা হ'লে যে-কোন মুহূর্তে জোয়ারের আশা করা যেতে পারে।

কাকা ফী দিতে উদ্যত হ'লে ডক্টর দাস বললেন, "কী আশ্চর্য! আপনি 'কল' দেওয়ায় আমি এসেছি না কি যে, ফী নোব? আপনার মেয়েটি নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত আবশ্যক মতো মাঝে মাঝে আসব, তার জন্যে আপনাকে কিছু দিতে হবে না।"

লক্ষ্মীর মতো রোগিণী আর মহাদেবের মতো রোগিণীর পিতাকে দেখে ডাক্তার বোধ হয় উৎসাহিত হয়েছিলেন।

ফী নিতে সম্মত না হওয়ায় কাকা ঈষৎ সংকোচ বোধ করছেন বুঝতে পেরে কেদার দাস সহাস্যমুখে বললেন, "এর জন্যে আপনাকে কুণ্ঠিত হ'তে হবে না গাঙ্গুলী মশায়। বেশ তো এক কাজ করলেই হবে। আপনি তো সন্দেশের পাড়ায় বাস করেন ভগবানের কৃপায় আপনার মেয়েটি ভালো হ'য়ে উঠুক, তারপর আমাকে টাকা পাঁচেকের উৎকৃষ্ট সন্দেশ আর এক জোড়া ফরাসডাঙার ধুতি-চাদর পাঠিয়ে দেবেন,—আমি খুব খুশি হব।"

এমন কথার পর কাকাকে অগত্যা নিবৃত্ত হ'তেই হলো। দুরূহ সমস্যার সন্দেশের দ্বারা এমন সুমিষ্ট সমাধান হ'তে দেখে খুশি হ'য়ে গেলাম। ডাক্তারের মহানুভবতা দেখে আমার মনও খানিকটা মহানুভব হ'য়ে উঠল। কেবল মনে হ'তে লাগলো, আমিও যদি এইরূপ কোনও একটা মহানুভবতা দেখাবার সুযোগ পাই তো নিশ্চয়:দেখাই।

সন্ধ্যার সময়ে কেদার দাস এলেন, সকালে যে ছেলে দুটি এসেছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে। এরা সারা রাত্রি আমাদের গৃহে থাকবে এবং পর্যায়ক্রমে রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষা করবে। বলা বাহুল্য, এরা দুজনে আহারাদি করবে আমাদেরই গৃহে।

কালী তখনও একভাবেই অজ্ঞান হ'য়ে আছে। কিন্তু তাকে পরীক্ষা ক'রে দেখে ডক্টর দাসের মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করলে। বললেন, "নাড়ী অনেকটা উন্নতি করেছে, দুর্বলতাও খানিকটা হ্রাস পেয়েছে।" শুনে আমাদেরও যেন খানিকটা দুর্বলতা হ্রাস পেলে।

ঘর থেকে সকলেই নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন, শুধু শরৎ ও আমি রইলাম কালীর কাছে। ঘরের সম্মুখে উঠানে দাঁড়িয়ে কেদার দাস ধাত্রী ও ছাত্রগণকে সমস্ত রাত্রির রোগী-পরিচর্যার বিস্তৃত উপদেশ দিচ্ছেন। ঘরে ব'সেও আমরা তা শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ শরৎ ব'লে উঠল, "ওরে উপীন, কালী যে ম'রে যাচ্ছে!"

চমকিত হ'য়ে কালীর মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম, তার ওষ্ঠাধর নিমেষের জন্য অল্প-একটু ফাঁক হ'য়ে বুজে গেল। শরতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "কী বলছ শরৎ! ভুল করছ না তো?"

এ বিষয়ে শরৎ আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ: "না, বোধ হয় ভুল করছি নে" ব'লে সংক্ষেপে আমার কথার উত্তর দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেদার দাসকে বললে, "ডাক্তারবাবু, একবার দেখবেন চলুন তো, কেমন যেন ভালো বোধ হচ্ছে না।"

দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে নত হ'য়ে ব'সে কেদার দাস কালীর মণিবন্ধ টিপে ধরলেন; তারপর আর-একটু জোরে আর একবার নাড়ী টিপে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "গন।"

কী সর্বনাশ! 'গন'? চ'লে গেছে? এত সহজে, এত অবলীলাক্রমে একেবারে হাতের বাইরে? ফিরিয়ে আনবার আর কোনও উপায় নেই? জীবন কি তা হ'লে এমনই পিচ্ছিল বস্তু, যা কেদার দাসের মতো শক্তিমান ডাক্তারকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেও ফসকে বেরিয়ে যেতে পারে!

এর পর চোখের উপর কত মৃত্যু ঘটতে দেখেছি, কিন্তু কালীর মৃত্যু-সভার সেই 'গন' শব্দের ভয়াবহতার তুলনা নেই। আজও সে শব্দের বৈরাগ্যগভীর ধ্বনি কানে লেগে আছে।

ক্ষণেকের জন্য যে আশার রশ্মি হৃদয়ে দেখা দিয়েছিল, একটা বুকফাটা ক্রন্দনের রোলে তা সমাধি লাভ করলে।

এগার

মৃত্যু জীবনের পূর্ণচ্ছেদ অথবা মৃত্যুর পরও জীবন কোনও প্রকারে নিজের জের টেনে চলে,—তা সে "আকাশস্থো নিরালম্বঃ বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" হ'য়েই হোক অথবা অবিনশ্বর আত্মার মধ্যে নিজের সত্তাকে গুটিয়ে নিয়েই হোক,—সে বিষয়ে এত বাদ-প্রতিবাদ, এত তর্ক-বিতর্ক, এত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অবকাশ আছে যে, বিষয়টা আজ পর্যন্ত মোটের উপর রহস্যই থেকে গেছে।

আইন-শাস্ত্রে highly probable এবং highly improbable নামে দুটি তত্ত্ব আছে, মাত্র যার উপর নির্ভর ক'রে অভিযুক্তকে দণ্ড অথবা মুক্তি দেওয়া চলে। পরলোকতত্ত্বে যাঁরা সুপণ্ডিত, পরলোক বিষয়ে যাঁদের গভীর গবেষণা এবং মননশীলতা আছে, তাঁদের প্রমাণ-পরীক্ষা অবগত হ'লে, যুক্তি বিচার শুনলে, পরলোক highly probable হয়; কিন্তু তদপেক্ষা এক ইঞ্চিও বেশি কিছু হয় না। এতদিন চেষ্টা-চরিত্র চলেছে, কিন্তু ইহলোক ও পরলোককে যুক্ত ক'রে এ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সেতু নির্মিত হলো না। যে উপকরণ অলৌকিককে গ'ড়ে তোলে, বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে দেখতে পাই তার প্রায় ষোল-আনাই সংস্কার অর্থাৎ কুসংস্কার। ভৌতিক বিবেচনা ভূতের ভয়ের মধ্যে এমন আশাহীন ভাবে তলিয়ে গেছে যে, দম আটকে সে বেচারা বোধ হয় মারাই পড়েছে।

গভীর রাত্রে দরজা খুলে দেখি, উঠানের ঈশান কোণে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়িয়ে অশরীরী প্রেতাত্মা হাতছানি দিচ্ছে। বিনা বাক্যব্যয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে লেপের মধ্যে আশ্রয় নিই। পরদিন সকালে উঠে দেখি, সূর্যকিরণেও ঈশান কোণে হাতছানি দিচ্ছে বটে কিন্তু প্রেতাত্মা নয়, আকন্দ গাছের পাতা। এ অবস্থায় অশরীরী প্রেতাত্মাকে উঠানের ঈশান কোণ থেকে বিদায় নিতে হয় বটে, কিন্তু একেবারেই বিদায় নেয় না; ঈশান কোন থেকে বিদায় নিয়ে প্রেতাত্মা

বাসা বাঁধে আমার আপন অন্তরাত্মার মধ্যে। এমনিভাবেই প্রধানত ভূতের ভয়ের ল্যাবরেটারিতেই ভৌতিক বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করে।

সে যাই হোক, আজ আমি একান্ত নিষ্ঠার সহিত যে কাহিনীটি বিবৃত করব, তার দ্বারা পরলোকের সেতু নির্মিত না হোক, অন্তত ইহলোকের কঠিন যবনিকার গাত্রে একটা ছিদ্র নির্মিত হ'য়ে পরলোকের খানিকটা অংশ যে দেখা গিয়েছিল, সে কথা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত বলা যেতে পারে। ১৯৪২ সনে দেওঘরে অবস্থানকালে এই কাহিনীটি আমি সুপ্রসিদ্ধ পরলোকতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার সরসীলাল সরকার মহাশয়ের নিকট বলেছিলাম। গল্পটি শুনে যৎপরোনাস্তি খুশি হ'য়ে তিনি বলেছিলেন, পরলোকবাদের প্রমাণ হিসাবে এ গল্প অমূল্য; এবং গল্পটি লিখে প্রকাশ করবার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ হচ্ছে, যে কথা অলৌকিক, যা শুনে লোকে বিশ্বাস করবে না, এমন কি, হয়ত উপহাস করবে, তেমন কথা জনসমীপে প্রকাশ ক'রে তার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করবে না। শাস্ত্রের আর একটি উপদেশ, শতং বদ, মা লিখ—একশ' বার ব'লো, কিন্তু লিখো না। আমি শেষোক্ত উপদেশটি পালন ক'রে গল্পটি এ পর্যন্ত বহু লোককে বলেছি, কিন্তু লিখি নি। আজ স্মৃতিকথা লিখতে ব'সে বোধ হয় কালীর মৃত্যু-কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েই গল্পটা না লিখে পারলাম না।

আমি তখন ভাগলপুরে ওকালতি করি। সকালে মক্কেল নিয়ে বসি; আশা-নিরাশা, আনন্দ-নিরানন্দ, প্রতারিত হওয়া, প্রতারিত হওয়া, প্রতারিত করা নিয়ে দ্বিপ্রহর কাটে আদালতে; বৈকালে গৃহে ফিরে চোগাচাপকানের বিজাতীয় খোলস থেকে আর্ত দেহকে খালাস ক'রে, চা খাবার খেয়ে ছুট দিই 'ভাগলপুর ইন্‌স্টিটিউটে'। সেখানে টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বিলিয়ার্ডস্, বই, সংবাদপত্র, গান-বাজনার বিচিত্র আয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে বড় আকর্ষণ উত্তর দিকের সুবিস্তৃত বারান্দায় আকাশের চন্দ্রাতপতলে ঈজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় ব'সে রাজা-উজির মারা আর গালগল্প ওড়ানো। ইন্‌স্টিটিউট থেকে ফিরে যদি মক্কেল থাকে তো কাজে বসি, নচেৎ আহার সমাপন ক'রে আইন এবং সাহিত্য নিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে কাটাই।

এইভাবে এক নিয়মে এক ছন্দে জীবন অতিবাহিত হয়ে চলেছে। এমন সময় হঠাৎ একদিন বৈকালবেলা ইন্‌স্টিটিউট যাবার পথে আদমপুরের মোড়ে একটি ভদ্রলোকের সহিত একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে হলো।

"এ কী! আপনি এখানে?"

"চাকরি উপলক্ষে এসেছি। আপনি এখানে কী করেন?"

"ওকালতি করি।"

আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস। ভাগলপুরে এসেছেন কমিশনারের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হ'য়ে। এঁর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাস বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম

বিচারপতি। গণিতশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

আদমপুরে মণীন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ি ভাড়া নিয়ে অমরেন্দ্র সপরিবারে বাস করছেন। বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে দুইখানি বাড়ি; ছোটখানিতে মণিবাবু নিজে বাস করেন, বড়টি ভাড়া নিয়েছেন অমরেন্দ্রনাথ। কম্পাউণ্ডের অব্যবহিত নিম্নেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথী; তখন সুবিস্তৃত প্রসারে ভাগলপুরের উপর দিয়েই প্রবাহিত।

ভাগলপুরের সম্মুখবর্তী গঙ্গা নদীর একটা অদ্ভুত আচরণ দেখা যায়; কখনও ইনি ভাগলপুর শহরের অব্যবহিত উপকূল স্পর্শ ক'রে প্রবাহিত হন, কখনও বা পাঁচ-ছয় মাইল উত্তরে সাড়ে পনের আনা জল নিয়ে স'রে পড়েন, শহরের উপকূলে প'ড়ে থাকে আধ-আনা জলের বিশীর্ণ উপশাখা, ভাগলপুরবাসীরা তার নাম দেয়—যমুনিয়া অর্থাৎ যমুনা। এই গঙ্গা ও যমুনিয়ার মধ্যবর্তী স্থলে জেগে ওঠে এক সুবিস্তৃত চরভূমি, যার নাম একেবারে বাঁধা আছে শঙ্করপুর-দিরা এবং যার পলিপড়া নূতন মৃত্তিকার অত্যুৎপাদিকা-শক্তির সুযোগ গ্রহণ করতে উদ্যমশীল তৎপর লোকেরা একদিনও বিলম্ব করে না। দেখতে দেখতে দিরার বক্ষের উপর গজিয়ে উঠতে থাকে চাষ-বাস, ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি, দোকান-পসার। কালক্রমে শঙ্করপুর-দিরার উপর নাতিবৃহৎ শঙ্করপুর মৌজা গ'ড়ে ওঠে। তার ঘননিবদ্ধ বসতির মাঝে দিকে দিকে পথ-ঘাটের বিস্তার, পথপার্শ্বে জায়গায় জায়গায় বিশ-পঁচিশ বৎসরের জলবায়ু-রৌদ্রের প্রভাবে বর্ধিত বৃহৎ বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ।

সকালে বৈকালে চরভূমির উন্মুক্ত স্থান মুখর হ'য়ে ওঠে গো-মহিষাদি পশুর গলায়-বাঁধা ঘণ্টির বিচিত্র সুরে। প্রত্যহ খেয়া নৌকা ভর্তি হ'য়ে ভারে ভারে আসে বিবিধ শস্য, আনাজ, দুগ্ধ এবং ঘৃত দধি ননী প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য। উদ্যমশীল গোয়ালারা পারানির কড়ি ও সময় বাঁচাবার জন্য প্রত্যূষে দুধের ভাণ্ড বাম হস্তে মাথার উপর ধারণ ক'রে দক্ষিণ বাহু ও পদদ্বয়ের সাহায্যে সাঁতার কেটে ভাগলপুর শহরের ঘাটে এসে ওঠে দুধ বিক্রয় করবার জন্যে। শীতকালে বোঝা-বোঝা আসে টাটকা তাজা—যেন সবুজ রঙে চোবানো—বড় বড় কড়াইশুঁটি, গ্রীষ্মকালে আধমণ-ত্রিশসের ওজনের ভাগলপুরের বিখ্যাত তরমুজ।

পক্ষান্তরে ভাগলপুর থেকে ব্যাপারীরা শঙ্করপুরে নিয়ে যায় বস্ত্র লবণ হ'তে আরম্ভ ক'রে সংসারের যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্য যা শঙ্করপুরের চরভূমিতে উৎপন্ন হয় না। এইরূপে আমদানি ও রপ্তানির সাহায্যে শঙ্করপুর ও ভাগলপুরের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ চলতে থাকে।

কিন্তু সহসা একদিন কোনও এক বর্ষাকালের খরস্রোতের উপর ভর দিয়ে গঙ্গামাতার দক্ষিণায়ন আরম্ভ হ'য়ে যায়। ত্রিশ বৎসর ধ'রে শঙ্করপুর-দিরার যে আলগা মাটি ক্রমশ কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে, কাস্তের মুখে পাকা ধান্যের

মতো উত্তর উপকূল থেকে তা কাটতে আরম্ভ ক'রে বঙ্গোপসাগরে চালান যেতে থাকে। এ কাজটি সম্পূর্ণ হ'তে অর্থাৎ গোটা শঙ্করপুর-দিয়ারা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছতে দুই-তিন বৎসরের বেশি লাগে না। এই অল্প সময়ের মধ্যে শঙ্করপুরবাসীরা ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের পাতা সংসারের বাড়ি-ঘর তুলে মাল-জাল নিয়ে স'রে পড়বার কার্যে বিব্রত হ'য়ে ওঠে।

এ দিকে, দেবী জাহ্নবী যেখান থেকে উত্তরায়ণ আরম্ভ করেছিলেন সেখানে পৌঁছে, অর্থাৎ ভাগলপুর শহরের পাড়ে এসে ধাক্কা মারতে আরম্ভ করেছেন। স্থানে স্থানে পাড় খ'সে প'ড়ে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হচ্ছে। চক্ষের সম্মুখে শঙ্করপুরের ভয়াবহ বিলোপ দেখে যোগশরের গঙ্গাতীরবর্তী ূনাথের মন্দিরে স্বয়ং শঙ্কর ত্রস্ত হ'য়ে ওঠেন, কি জানি দেবী তাঁকে শুদ্ধ তাঁর মন্দিরটি লেহন ক'রে না নেন! বাঙালীটোলায় আমাদের পৈতৃক বাড়ির ঠিক উত্তরে ঘোষেদের বাড়ির অল্প-স্বল্প অংশ গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করেছে। স্নান করতে এসে স্নানার্থীরা তটস্থ হ'য়ে বলে, 'মা, যথেষ্ট কৃপা করেছ, এবার তোমার অনুগ্রহের সীমান্ত-রেখা দয়া ক'রে টানো।'

কিছুকাল পূর্বে শঙ্করপুর-দিয়ার বক্ষে যেখানে স্বচ্ছন্দে গরু-বাছুর চ'রে বেড়াত এখন সেখান দিয়ে কলকাতা-পাটনাগামী বৃহৎ মালবাহী স্টীমার অবলীলাক্রমে যাতায়াত করে।

অমরেন্দ্রবাবুর ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে তাঁর কম্পাউণ্ড স্পর্শ ক'রে গঙ্গা নদী সগৌরবে প্রবাহিত ছিল। ভাগীরথীবীচিচুম্বিত অমরেন্দ্রনাথের কম্পাউণ্ড ও অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভস্পৃহা ধীরে ধীরে আমার সায়াহ্নগুলিকে অধিকার করতে লাগল। ইনস্টিটিউট যাওয়া ক্রমশ হ্রাস পেয়ে পেয়ে শেষ পর্যন্ত মাসে মাসে চাঁদা দেওয়াতে পর্যবসিত হলো।

আমাদের বৈঠক বসত নদীমুখ হয়ে নবদূর্বাদলের হরিৎ আস্তরণের উপর। সম্মুখে পূর্ববাহিনী খরস্রোতা ভাগীরথী নদী; তার উত্তরে অপর পারে দিগন্তবিলীয়মান বালুচর নদীতটে সাহিত্যিকের পক্ষে পরম কৌতূহলের বস্তু নদীজলাভিমুখে হেলে-পড়া ক্ষয়িতমূল সেই অশ্বত্থ গাছ, গভীর রাত্রে নৈশ অভিযান থেকে ফিরে এসে যার শিকড়ে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের "ইন্দ্রনাথ" নৌকা বাঁধত।

এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে প্রথম প্রথম বৈঠকে বসতাম মাত্র আমরা তিনজন—অমরবাবু, অমরবাবুর বাড়িওয়ালা মণিবাবু ও আমি। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও ভারতবিখ্যাত গায়ক ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর এই মণিবাবু। তিনি নিজেও একজন সুকণ্ঠ গায়ক এবং সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন।

শশিকলার মতো দিনে দিনে না হ'লেও, ধীরে ধীরে পুষ্টি লাভ করতে করতে আমাদের দলের সদস্য-সংখ্যা শেষ পর্যন্ত আট-নয় জনে এসে দাঁড়াল। এ কয়েকজন অবশ্য পাকা সদস্য। তা ছাড়া দু-চার জন ছুটকো সদস্যও ছিলেন,

ধূমকেতুর ন্যায় মাঝে মাঝে এসে দু-চার দিন আকাশ আলো ক'রে অস্ত যেতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ পাকা সদস্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হ'লেও প্রধানত কলিকাতায় থাকতেন ; কিন্তু পূজায় ছুটি ও বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে তিনি বৎসরে নিয়মিত দুবার ভাগলপুরে আসতেন ও প্রতিদিন আমাদের দলে হাজির হতেন।

বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র ও সখা—এই চার ভাবের অভিধা-নিরূপক একটি সূত্র আছে, "অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।" এই সূত্র-অনুযায়ী আমরা আট-নয় জন পাকা সদস্য যে পরস্পরের বন্ধু ছিলাম তা বলতে পারি নে, কারণ পরস্পরের বিচ্ছেদ আমাদের সহ্য করতেই হতো ; সুহৃৎও আমাদের ঠিক বলা চলত না, কারণ মতামতের ক্ষেত্রে আমরা কারও অনুগত হ'য়ে তাঁবেদারি ক'রে চলতাম না, বরং মাঝে মাঝে প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে তর্কের ঝড়ও ওঠাতাম ; আমরা একক্রিয় ছিলাম না ব'লে আমাদের মিত্র বলাও চলত না, কারণ আমাদের মধ্যে কেউ ছিলেন হাকিম, কেউ উকিল, কেউ অধ্যাপক, কেউ-বা ব্যবসায়ী। তবে রুচি ও প্রবৃত্তির একতাবশত আমরা অনেকটা সমপ্রাণ অর্থাৎ সমভাবাপন্ন ছিলাম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। রুচির একতা যে-পরিমাণ সমপ্রাণতার সৃষ্টি করতে পারে, এমন বোধ করি আর কিছু নয়। সভা-সমিতির সভ্য হবার সাধারণ নিয়ম, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল, অর্থাৎ দাও চাঁদা হও সভ্য। আমাদের দলের সভ্য হবার কাড়, অর্থাৎ প্রবেশ-টিকিট ছিল রুচির মিল। রুচির মিলের টিকিট দুষ্ক্রেয় বস্তু। সুতরাং আমাদের দলটি বিস্তৃত হ'তে পারে নি, কিন্তু গভীর হবার সুযোগ লাভ করেছিল।

দলটি সবেগে পুরা দমে চলছে, এমন সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র সেন নামে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভাগলপুরে বদলি হ'য়ে এলেন। দেখতে অতিশয় সুপুরুষ ; মুখে প্রসন্ন মিষ্টহাসি লেগেই আছে ; মার্জিত রুচি, মার্জিত কথাবার্তা, সুমার্জিত আচরণ। সর্বোপরি, এমন একটা সহজ তরল সহৃদয়তা, যা অতি অল্প সময়ের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা স্থাপন করতে সমর্থ হয়। আমাদের দলপতি অমরেন্দ্রনাথ নিপুণ জহরী, বিলম্বে অক্ষিতীশচন্দ্রকে হাত ধ'রে দলে টেনে নিলেন। সুরসিক ক্ষিতীশচন্দ্রকে লাভ ক'রে আমাদের দল উল্লসিত হ'য়ে উঠল।

শীতকাল। ভাগলপুরের দুর্জয় শীতে গঙ্গার ধারে বৈঠক আর সম্ভব হচ্ছে না, তৎপরিবর্তে বসছে আমার বৈঠকখানার প্রশস্ত ফরাসের উপর। সেখানে চলে প্রধানত গল্প-গুজব আর সঙ্গীতের মজলিস। যখন গান চলে, তখন আমাকে বাদ দিয়ে আর সকলেই হন শ্রোতা। সুতরাং গান গাইতে হয় একমাত্র আমাকেই।

ফরাসের উপর দিনে দিনে ক্রমশ আমাদের বসবার স্থানগুলি নির্দিষ্ট হ'য়ে গেছে। সকলেই নিজ নিজ স্থানে এসে বসে, কেউ কারও স্থান অধিকার করে

না। অমরেন্দ্রনাথ ও আমি সামনা-সামনি বসি, মধ্যে প'ড়ে থাকে একটা হার্মোনিয়মের ব্যবধান। একমাত্র ক্ষিতীশবাবু ছাড়া আমরা সকলেই ফরাসে বসি। কিছুকাল পূর্বে ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে অস্ত্রোপচারের ফলে একটা পায়ের শিরায় টান থেকে যাওয়ায় তিনি পা মুড়ে বসতে পারেন না। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা বেতের ঈজি-চেয়ার ছিল, প্রতিদিন সঙ্গীতপ্রিয় ক্ষিতীশচন্দ্র একটি পায়ের উপর অপর পা স্থাপন ক'রে সেই চেয়ারে উপবেশন ক'রে গান শোনেন, আলাপ-আলোচনা করেন। চেয়ারটি তাঁর জন্য সংরক্ষিত হ'য়ে গেছে। এমন কি, তিনি উপস্থিত না থাকলেও কেউ সেটা অধিকার করে না, তাঁর অপেক্ষায় খালি প'ড়ে থাকে।

ক্ষিতীশবাবুর বাড়ি ও আমার বাড়ি রাস্তার এপার-ওপার। একদিন ছুটির দিনে সকালবেলা তাঁর ময়ূরকণ্ঠী রঙের শৌখিন বালাপোশটি গায়ে দিয়ে ক্ষিতীশচন্দ্র এসে হাজির; হাতে একখানা বই।

অভ্যর্থনা ক'রে তাঁকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী ক্ষিতীশবাবু, সকালবেলা বই হাতে ক'রে বেরিয়েছেন, ব্যাপার কী?"

স্মিতমুখে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ক্ষিতীশবাবু বললেন, "এটি রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির বই। এর একটি গানের ভাষা ও ভাব কয়েকদিন থেকে আমার মনকে অস্থির ক'রে রেখেছে। আমার দ্বারা তো সম্ভব নয়, তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম। স্বরলিপি থেকে গানটি শিখে আমাদের সভায় আপনাকে গাইতে হবে।" ব'লে গানের পাতাটি খুলে বইখানি আমার হাতে দিলেন।

গানটি প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। সত্যিই অতি চমৎকার, এমন কি, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেও। যে অদ্ভুত গল্প বলতে উদ্যত হয়েছি, তার পূর্ণ রসোপলব্ধির জন্য সমগ্র গানটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।—

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান।
ভুলবে সে গান যদি, না-হয় যেয়ো ভুলে,
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর-কূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই কটি মোর তান।
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে,
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন ক'রে?
সেই কথাটি কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে ফাগুন-সমীরণে—
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান,
ভুলতে সে কি পারো ভুলিয়েছ মোর প্রাণ।"

গানটি প'ড়ে বললাম, "সত্যিই অপূর্ব। হাকিমের হুকুম তামিল করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

কিছুক্ষণ গল্প ক'রে ক্ষিতীশবাবু গৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

স্বরলিপি থেকে গানটি উদ্ধার করতে বিশেষ কষ্ট পেতে হ'লো না; তখন ও-বিদ্যা কতকটা আয়ত্তে ছিল। প্রতিমার দুই চোখে তারকা বসিয়ে দিলে মুখমণ্ডলের যে অবস্থা হয়, সুললিত ভাষামণ্ডিত অপূর্ব ভাবের গানটিতে সুর সংযুক্ত হওয়ায় ঠিক সেই অবস্থা হলো। গানটি যেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলে।

সেদিনকার সান্ধ্য মজলিসে প্রথমেই গাইলাম, আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান।'

ক্ষিতীশবাবু তো আত্মহারা। চেয়ার থেকে উঠে প'ড়ে পা মুড়ে আমার পাশে এসে বসেন আর কি। অপর সকলেও এমন সুন্দর নূতন গান শুনে বিশেষ আনন্দিত হলেন। অমরবাবু বললেন, "এ গান কোথায় পেলেন? কখনও তো আপনার মুখে আগে শুনি নি?"

গানটির সকালবেলাকার ইতিহাস প্রকাশ ক'রে বললাম। শুনে সকলে যৎপরোনাস্তি খুশি হলেন এবং এমন অপরূপ সঙ্গীত-সুরধুনী আমাদের সভায় নিয়ে আসবার কারণ হওয়ার জন্য ক্ষিতীশবাবুর প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলেন।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন নিত্যই ঐ গানটি স্বেচ্ছাক্রমেই গাইতাম, কিন্তু পরে এক-আধ দিন বাদ পড়বার উপক্রম হ'তে লাগল। কিন্তু উপক্রম হ'লে হবে কি। বাদ পড়বার উপায় ছিল না। ক্ষিতীশবাবু মনে পড়িয়ে দিতেন, "উপেনবাবু, সেই গানটা?"

"কোনটা বলুন তো?"

"সেই আমি তোমায় যত।"

"ও! আচ্ছা, গাচ্ছি।"

অনুরোধে খুশি হ'য়েই গান ধরতাম,—'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান।'

এই রকম ব্যাপার মাঝে মাঝে প্রায়ই ঘটতে লাগল। অবশেষে আমরা লক্ষ্য না ক'রে পারলাম না যে, 'আমি তোমায় যত' গানটির কোনোদিন কোনও প্রকারে বাদ পড়বার উপায় নেই। আমি যদি স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে গাই তো বহুৎ আচ্ছা, অন্যথা ক্ষিতীশবাবু আমাকে গাইতে বাধ্য করেন।

গোপন পরামর্শ অনুযায়ী একটু কৌতুক করবার অভিপ্রায়ে দু-চারখানা গান গেয়ে হার্মোনিয়মের স্টপগুলো ঠেলে দিয়ে বেলোটা বন্ধ ক'রে হয়তো বলি, "আজ আর থাক্।"

ষড়যন্ত্রের বশবর্তী হ'য়েই যতীন্দ্র হয়তো বলেন, "তবে থাক্।"

কিন্তু করাসের উপর 'থাক্' বললে কী হবে? ওদিক বেতের ইজি-চেয়ারে

উস্‌খুস্‌নি আরম্ভ হ'য়ে গেছে। ন'ড়ে-চ'ড়ে বসার সামান্য একটু শব্দ, অত্যন্ত চাপা গলা-খাঁকারির অল্প একটু আওয়াজ, তারপর কুণ্ঠিত মৃদু কণ্ঠস্বর, "উপেনবাবু সেই গানটা ?"

ফরাসের উপর উচ্চ হাসির ঝড় ব'য়ে যায়। ক্ষিতীশবাবু লজ্জিত মুখে গান শুনে আনন্দ লাভ করেন এবং পরদিন প্রয়োজন হ'লে লজ্জিতকণ্ঠে "উপেনবাবু সেই গানটা" বলতে বিরত হন না। ক্রমশ আমাদের সকলের মধ্যে 'আমি তোমায় ঘত' গানটির নাম দাঁড়িয়ে গেল, 'সেই গানটা।' উল্লেখ করার প্রয়োজন হ'লে আমরাও বলতাম, 'সেই গানটা।'

ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গীতে অনুরাগের কথা আমাদের অবিদিত ছিল না; কিন্তু একমাত্র এই গানটির উপরই তাঁর যেন একটা অলৌকিক আকর্ষণ দেখা যেত।

সুখে-স্বচ্ছন্দে আমাদের দিনগুলি অতিবাহিত হ'য়ে চলেছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন বিপদ দেখা দিলে। সেদিন রবিবার অথবা অন্য কোন ছুটির দিন। সন্ধ্যার সময়ে শুনলাম, টম্‌টম্‌ ও তৎসহিত ঘোড়া ক্রয় করবার অভিপ্রায়ে ক্ষিতীশবাবু অপরাহ্নকালে নিজে টম্‌টম্‌ চালিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন, এমন সময়ে ঘোড়া হঠাৎ ভয় পেয়ে বিগড়ে গিয়ে অসামাল হওয়ায় গাড়ি উল্টে প'ড়ে ক্ষিতীশবাবু আহত হয়েছেন। উদ্বিগ্ন চিত্তে ক্ষিতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, ইত্যবসরেই ডাক্তার এসে ক্ষত পরিষ্কৃত ক'রে ঔষধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছেন। বেশির ভাগ চোট মস্তকে। ব্যাণ্ডেজের দ্বারা একটা চোখ প্রায় ঢেকে গিয়েছে। একটা খাড়া চেয়ারে ক্ষিতীশচন্দ্র সোজা হ'য়ে ব'সে আছেন। মুখে তাঁর সদানন্দ-ভাবের মিষ্ট হাসির অংশ লেগে রয়েছে। বললেন, "গ্রহের ফের, এর ওপর মানুষের কোনও হাত নেই।"

দিন দুই প্রায় সমভাবেই কাটল, বিশেষ উদ্বেগের কোনও কারণ আছে ব'লে মনে হয় না। হঠাৎ কিন্তু একদিন সমস্ত মুখবাবয়ব জুড়ে ভীষণ বিসর্প (Erysipelas) রোগ দেখা দিলে। অমন যে সুশ্রী মুখ, কোথায় যে কী তার হ'য়ে গেল কিছুই বোঝা গেল না। মুখ ও মাথা চতুর্গুণ ফুলে উঠে তার মধ্যে চক্ষু গেল ডুবে, নাসিকা গেল বুজে। অবস্থা সংকটাপন্ন হ'য়ে দাঁড়াল। চিকিৎসা বিষয়ে ভাগলপুরে যা-কিছু হওয়া সম্ভব কিছুই বাকি রইল না। ইংরেজ সিভিল সার্জেন থেকে আরম্ভ ক'রে দু-তিন জন খ্যাতনামা বাঙালী ডাক্তার একত্রে মিলিত হ'য়ে রোগের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হ'তে হলো। একদিন রাত্রি দশটা আন্দাজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, একদল অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব সকলকে কাঁদিয়ে অকালে অসময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র চ'লে গেলেন।

আত্মীয়বর্গের দুঃখের তো পরিসীমাই নেই, আমাদের মনও দুঃসহ শোকের ভারে পীড়িত হ'য়ে উঠল। আমাদের মিত্র-জগতের আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খ'সে গিয়ে খানিকটা আলোক হরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

ক্ষিতীশবাবুদের বাড়ি মজঃফরপুরে। দিন দুই পরে তথা হ'তে তাঁর অগ্রজ

সুরেন্দ্রনাথ সেন এসে উপস্থিত হ'লেন, শোকাভিভূত আত্মীয়বর্গকে মজঃফরপুরে নিয়ে যাবার জন্ত। ইনি আমার পূর্বপরিচিত ; মজঃফরপুরে এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার কয়েকবার সুযোগ হয়েছিল।

সুরেনবাবুর সহিত আমরা সকাল-বিকাল মিলিত হই, আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে চমকে উঠি। তিনি কথা কন, আমাদের মনে হয় যেন ক্ষিতীশবাবুই কথা কইছেন। ভাইয়ে ভাইয়ে কণ্ঠস্বরের মিল থাকার মধ্যে আশ্চর্যের তেমন কিছু নেই, কিন্তু তাই বলে এত।

ভাগলপুরের পাট তুলে মজঃফরপুর রওনা হ'তে সুরেনবাবুদের দিন চারেক লাগবে। যেদিন তারা রওনা হবেন, তার আগের দিন সকালে অমরেন্দ্রনাথ সুরেনবাবুকে বললেন, "দেখুন সুরেনবাবু, আপনার মুখ দেখে, আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমাদের কেমন যেন ক্ষিতীশবাবুকে মনে পড়ে। ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে আমরা যেমন সন্ধ্যাকালে উপেনবাবুর বৈঠকখানায় বসতাম, আজ সন্ধ্যায় আপনাকে নিয়ে তেমনই যদি বসি তা হ'লে হয়তো আমাদের মনে হবে, কিছুক্ষণের জন্যে যেন ক্ষিতীশবাবুকেই আমরা ফিরে পেলাম।"

অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব শুনে অভিভূত হ'য়ে সুরেনবাবু বললেন, "আমিও ভারি তৃপ্তি পাব অমরবাবু। ক্ষিতীশ যে আপনাদের কত আপনার ছিল তা জানতে আমার আর বাকি নেই।"

সন্ধ্যাকালে আমরা সুরেনবাবুকে মধ্যে নিয়ে আমার বৈঠকখানার ফরাসের উপর মিলিত হলাম। সুরেনবাবু ব্যতীত আমরা সেদিন ছিলাম, যতটা মনে পড়ছে, জন আষ্টেক বন্ধু। সুরেনবাবু আমাদের সঙ্গে ফরাসেই ব'সে ছিলেন ; ঘরের কোণে বেতের চেয়ারটা খালি প'ড়ে ছিল, যেমন সেটা খালি প'ড়ে থাকত ক্ষিতীশবাবুর অপেক্ষায় যেদিন তিনি আসতেন না অথবা আসতে বিলম্ব করতেন।

চায়ের পালা শেষ হ'লে গল্পের গতি হ'ল ত্বরিত। বলা বাহুল্য, যা-কিছু গল্প সেদিন হচ্ছিল, সবই ক্ষিতীশবাবুকে কেন্দ্র ক'রে। আমরাও কিছু-কিছু বলছিলাম, সুরেনবাবুও অনেক কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। সম্ভুজ্জিত বিচ্ছেদ ও শোকের একটা ফিকা চেতনার আবহাওয়ায় সমস্ত ঘরটা যেন চকিত হ'য়ে উঠেছে।

ঘণ্টাখানেক কথোপকথনের পর সহসা অমরেন্দ্রনাথ একটা অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে বসলেন, "কি জানি কেন, বোধ হয় সুরেনবাবুর উপস্থিতির জন্যেই, আজকের এই সভার অধিবেশনের সময় নিয়ে আমাদের মনের মধ্যে মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা গোলমাল ঠেকতে আরম্ভ করেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এ যেন এমন কোন একদিনের সভা যখন ক্ষিতীশবাবুর টম্‌টম্-দুর্ঘটনা আদৌ ঘটে নি। এই বিভ্রান্তি, যা নিশ্চয়ই আমাদের কিছু আনন্দ দিচ্ছে, বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পায় যদি উপেনবাবু ক্ষিতীশবাবুর 'সেই গানটা' গান।"

সুরেনবাবু সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ। মজঃফরপুরে তাঁর সহিত আমার পরিচয়ের প্রধান কারণ ছিল সঙ্গীত ও গান-বাজনার চর্চা। গানের কথায়,

বিশেষত ক্ষিতীশবাবুর 'সেই গানটা'র কথায়, তিনি উৎসুক হ'য়ে উঠলেন। ক্ষিতীশবাবুর 'সেই গান'টা কী ব্যাপার, দু-চার কথায় অমরবাবুর নিকট হ'তে অবগত হ'য়ে নিয়ে 'সেই গান'টি গাইবার জন্য তিনি আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। আমাদের দলেরও সকলের বিশেষ আগ্রহে গানটি আমি গাই। অমরেন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে হার্মোনিয়ম এসে পড়ল আমার সম্মুখে। অগত্যা গান ধরলাম—'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান—'

চেয়ে দেখলাম অমরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজেছেন। ওটা ওঁর চিরকালের অভ্যাস। গান আরম্ভ হওয়ামাত্র চোখ বুজে অতি মৃদুভাবে দোল খান,—গান শেষ হ'লে চোখ খোলেন। গানের এমন নিষ্ঠাবান শ্রোতা গায়কের ভাগ্যে কদাচিৎ মেলে। অপরে গানের বিঘ্ন ঘটালে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত তো হনই; গানের সময়ে গায়ককে বাহবা দিয়েও তিনি গানের রসভঙ্গ করেন না। সামনে ব'সে অমরবাবু চোখ বুজে দোল খাচ্ছেন দেখলে আমি গান গাইতে উৎসাহ লাভ করি।

গানের অস্থায়ী অন্তরা শেষ ক'রে সঞ্চারী ধরেছি—

"তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে,
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন ক'রে!"

এমন সময়ে অমরবাবুর কম্পিত মোটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "উ-উপেন-বা-আ-বু!"

আমি উত্তর দিলাম, "হু।" অর্থাৎ আমিও দেখেছি। দেখেছি, ঘরের নৈর্ঋত কোণে রক্ষিত বেতের ঈজি-চেয়ারের উপর কখন সশরীরে এসে নিঃশব্দে বসেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র,—এক লহমার জন্য অবশ্য,—কিন্তু সেজন্য সাদৃশ্যবোধের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি,—একেবারে সুস্পষ্ট, কঠিন, নিটোল (solid) ক্ষিতীশচন্দ্র,—ছায়া নয়, মায়া নয়,—ভুল নয়, ভ্রান্তি নয়। তেমনই আগেকার মতো পায়ের উপর পা দিয়ে ডান হাতের ছড়িটি উপর পায়ের উপর রেখে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদু মৃদু হাসছেন। 'সশরীরে প্রকাশ' বলতে যদি কিছু বোঝায়, তা হ'লে একান্তভাবে তাই।

ওদিকে ফরাসের উপর আড় হ'য়ে প'ড়ে মতিবাবু হাত-পা সেঁচতে আরম্ভ করেছেন—আতঙ্কে নয়, আবেগে। প্রেমসুন্দরবাবু (একদা শান্তিনিকেতন কলেজের অধ্যক্ষ প্রেমসুন্দর বসু) গম্ভীরমুখে ব'সে ঘটনার অলৌকিকতায় স্তম্ভিত হ'য়ে আছেন। মৃদুকণ্ঠে অমরবাবু ঘটনার বিষয়ে সুরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাদের দলের মধ্যে যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, সকলেই এক সময়ে এক সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্রকে দেখেছিলেন; দেখেন নি শুধু সুরেনবাবু। যাঁরা দেখেছিলেন, সকলের নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না;—অমরেন্দ্রবাবুর হয়তো মনে থাকতে পারে।

এ বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা একটু বিচিত্র। নিমীলিত নেত্রেই তিনি ঘরের মধ্যে কোনো অলৌকিক পদার্থের উপস্থিতি অনুভব করেন। তখন চোখ

খুলে চেয়ারের উপর দেখতে পান ক্ষিতীশবাবুকে। আমাদের মুখে এ ঘটনা শুনে যাঁরা প্রতিবাদ করেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বেতের চেয়ারের উপর ক্ষিতীশবাবু আবির্ভূত হননি, হয়েছিলেন আমাদের মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রবণতার উপর; কেউ বলেন, আমাদের এই অভিজ্ঞতাটি 'ম্যাস হিপ্নোটিজ্‌ম্‌'-এর একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত; আরও অনেক কিছু বলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এসব কথা, এসব যুক্তি-তর্ক আমরাও তো জানি। আমরাও এসব বলতে পারি, কিন্তু তারপরও যে মনের মধ্যে খানিকটা সংশয় থেকে যায়! আলোচ্য ঘটনাটিকে যখন একান্তভাবে মনে মনে বিশ্বাস করতে যাই, তখন সংশয় এসে তার উপর ছায়াপাত করে। আবার যখন অবিশ্বাস করতে চাই, তখন মনে হয়, তা হ'লে উপড়ে ফেলে দাও সে দুটো নিরর্থক চক্ষু, যারা ছায়াকে কায়া দেখতে এত ওস্তাদ!

একটা কথা এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি। আলোচ্য ঘটনার পর, দিনের পর দিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঐঘরে একা ব'সে লেখাপড়া করেছি। কেবল মাত্র বাড়ি ঘুমন্ত নয়, সারা পল্লী তখন ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে বেতের চেয়ারের দিকে চেয়ে দেখেছি, রোমাঞ্চও হয়তো এক-আধবার হয়েছি, কিন্তু কোনও দিন কিছু আর দেখি নি। একদিন মৃদুস্বরে 'সেই গান'টাও গেয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনও নয়।

বার

যে সকল ঘটনার দ্বারা পরলোকের অথবা প্রেতলোকের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত না হ'লেও কতকটা 'হাইলি প্রোব্যাব্‌ল্‌' হয়, ক্ষিতীশচন্দ্রের ঘটনা ভিন্ন এমন আরও দু-চারিটি ঘটনা আমার জানা আছে। তন্মধ্যে উপস্থিত যে-দুটির কথা বলতে উদ্যত হয়েছি, তার মধ্যে একটি স্মৃতি, অপরটি শ্রুতি। যেটির সহিত আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তার কথাই আগে বলি।

তখন আমরা ভবানীপুর কাঁসারিপাড়া রোডের একটি গৃহে বাস করি। ঠিক ক'রে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমানিক ১১০২ কিংবা ১১০৩ সালের কথা হবে। ভাদ্র মাস। মাতাঠাকুরাণীর তালনবমী ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাত্রিকালে বিশ-পঁচিশজন ব্রাহ্মণের ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়েছেন, নানাপ্রকার গল্প-গুজব চলছে। এমন সময় তাঁদের মধ্যে একজন, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওরফে, নাকুবাবু, হঠাৎ ব'লে বসলেন, "এ বাড়িতে ভূত আছে।"

সম্পূর্ণ লৌকিক বিষয়ের আলাপ-আলোচনার মধ্যে অকস্মাৎ আধিভৌতিক প্রসঙ্গের অবতারণায় কয়েকজন হেসে উঠলেন।

তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে নাকুবাবু বললেন, "হাসা সহজ; কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখার পর বোধ হয় সহজ হবে না। যেদিন পরীক্ষা করবেন, সেই দিনই প্রমাণ পাবেন। আজই করুন না, আজই পাবেন।"

এত বড় দাপটের (challenge) পর উক্ত ব্যক্তি একটু দ'মে গিয়ে বললেন, "আপনি কী ক'রে জানলেন? কারও কাছে শুনেছেন না-কি?"

ঈষৎ উষ্মার সহিত নাকুবাবু বললেন, "কারও কাছে শুনি নি মশায়, নিজের দু কানেই শোনা হয়েছে। লালমোহনবাবুরা এ বাড়িতে আসবার ঠিক আগে, এক মাস দু মাস নয়, কয়েক বৎসর আমরা এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম।"

নাকুবাবুর পিতা করুণাসিন্ধু মুখোপাধ্যায় তখনকার দিনে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল। তাঁর জুনিয়ার ছিলেন আমার দাদা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। গৃহনির্মাণ ক'রে করুণাবাবুরা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা গৃহ ভাড়া নিই।

নাকুবাবুর কথা শুনে তাঁর প্রতিপক্ষ ঈষৎ প্রবল হ'য়ে উঠে বললেন, "ও! আপনি দেখেন নি, শুনেছেন?"

"কেন, শোনাটা কি কিছুই নয়? দেখাটাই সব? আমরা কি শুধু শুনেই ভুল করি, দেখে করি নে? রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তা রজ্জু শুনে, না, দেখে?" ব'লে নাকুবাবু বিরক্তমিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগলেন।

ভূতের গল্প এমনই তো মহা কৌতূহলের বস্তু, তার উপর নাকুবাবু ভূত দেখেন নি—শুনেছেন, শুনে অভ্যাগতগণের মধ্যে ঔৎসুক্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নাকুবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ব্যগ্রকণ্ঠে এক ব্যক্তি বললেন, "আরে, রাখুন মশায়, আপনাদের দেখা আর শোনার ঝগড়া। কী শুনেছিলেন আপনি বলুন—আমরা শুনি?"

বিস্মিতকণ্ঠে নাকুবাবু বললে, "শুনেছিলাম মানে?—একদিন না-কি? প্রতিরাত্রে শুনতাম।"

পূর্বোক্ত ভদ্রলোক স্মিতমুখে বলিলেন, "আচ্ছা, কী কী শুনতেন তাই বলুন।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা ক'রে নিয়ে নকুলবাবু বলতে আরম্ভ করলেন, "আমরা ভাড়া নেওয়ার আগে যাঁরা এ বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতেন, তাঁদের একটি বছর চারেকের ছেলে ছিল, সে পড়াশুনা যতটুকু করত তার দশগুণ করত খেলা। আর, মার্বেল ছিল তার একমাত্র খেলার বস্তু। হয় একতলায়, নয় দোতলায়, সিঁড়িতে, নয় ছাতে, সর্বদাই তার মার্বেল গড়ানোর শব্দ শোনা যেত। তার খেলার সাথী ছিল না, প্রতিপক্ষ ছিল না; এক পক্ষ সে নিজে, অপর পক্ষ মার্বেল। একদিন ছেলেটি ভীষণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হলো। ডাক্তার আর আত্মীয়রা মিলে দিন দুই রোগের সঙ্গে যুদ্ধ চালালে, কিন্তু ছেলেটি বাঁচল না। একদিন রাত্রি একটার সময়ে যে-ঘরে আমরা ব'সে আছি ঠিক তার উপরের

দোতলার ঘরে সে মারা গেল। তারপর থেকে প্রতিদিন রাত্রি একটার সময়ে ছেলেটি ঐ ঘরে একটিবার মার্বেল ছাড়ে। শক্ত মেঝের ওপর শক্ত মার্বেল প'ড়ে তিন-চারবার শব্দ করে—ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। অস্পষ্ট নয়, এত স্পষ্ট যে কান পেতে না থাকলেও না শুনে উপায় নেই। আজ যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এ ঘরে একটা পর্যন্ত জেগে শুয়ে থাকেন, আজই শুনতে পাবেন।"

নাকুবাবুর কাহিনী শেষ হলো। সংক্ষিপ্ত সাধারণ কাহিনী,—রোমাঞ্চকর তার মধ্যে কিছুই নেই। তবে ভূতের বাসা মাথার উপর ক'রে ভূতের গল্প শোনার মধ্যে কৌতুকের হয়তো কিছু ছিল। যে ভদ্রলোক ভূত দেখা ও শোনা নিয়ে তর্ক তুলেছিলেন, তিনি হয়তো কিছু জেরা করবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু আহারে ডাক পড়াতে সকলে উঠে পড়লেন।

রাত্রি এগারোটা। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহার সমাপন ক'রে বহুক্ষণ যে-যাঁর বাড়ি চ'লে গেছেন। বাড়ির লোকের খাওয়া-দাওয়াও হ'য়ে গেছে। চাকর-বামুনরা খেতে বসেছে। তখনও ভবানীপুরে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড্ ড্রেন হয় নি; সদর-দরজার সম্মুখে কাঁচা নর্দমা পার হবার জন্য খিলানের উপর সিমেণ্ট বাঁধানো পথ, তার দুই দিকে দুটি পাকা মঞ্চ। মঞ্চের উপর মুখোমুখি ব'সে আমি ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় অলস কথোপকথনে রত, এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়ল নাকুবাবুর গল্প। বললাম, "শ্যাম, রাত্রি তো এগারোটা হলো—আর ঘণ্টা দুই পরে চার বৎসরের বালক-ভূতের মার্বেল খেলার পালা। নাকুবাবু তো আস্ফালন ক'রে গেলেন—শোনবার ইচ্ছে করলে আজ রাত্রেই শোনা যেতে পারবে। আজ রাতটা থেকে যাও-না এখানে। ঘণ্টা দুয়েক গল্প ক'রে জেগে থেকে নাকুবাবুর বালক-ভূতের পিণ্ডদান ক'রে ঘুমানো যাবে।"

প্রস্তাবটা শ্যামরতনের ভালোই লাগল। বললেন "বাড়িতে কিন্তু খবর দিতে হবে; নইলে ভাববে।"

বললাম, "অবশ্যই দিতে হবে।"

কিন্তু কে খবর দেয়? ভাগিনেয় সুশীলচন্দ্র পরিবেশন ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, চাকর-বামুনদের খাওয়া শেষ হয় নি। অগত্যা পরামর্শ ক'রে আমরা দুজনেই শ্যামরতনের বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে এলাম যে, সে রাত্রে শ্যামরতন বাড়ি ফিরবে না।

বৈঠকখানায় ফরাসের উপর শয্যা পেতে আমরা দুজনে যখন পাশাপাশি শয়ন করলাম তখন রাত বারোটা। সাড়ে বারোটার মধ্যে, শুধু আমাদের বাড়িই নয়, সারা পল্লী গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। ঘরের ভিতর আমরা দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে, আর পরিশ্রান্ত সুশীল একটা ঈজি চেয়ারে দেহ সমর্পণ ক'রে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। তার নিশ্বাসের উত্থান পতনের শব্দ এবং ক্লক-ঘড়ির টক্ টক্ টক্ টক্ আওয়াজ লয় ও সুরের সাম্য রেখে ঐক্যতান বাজিয়ে চলেছে।

মৃদু গুঞ্জনে আমাদের গল্প চলেছে সহজ গল্পের ছন্দে ও লয়ে। মাঝে মাঝে তার মধ্যে সম পড়ছে প্রাণখোলা হাসির রবে। মনের মধ্যে ভৌতিক অভিব্যক্তির জন্য বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা নেই, সুতরাং ভয় তো দূরের কথা, উদ্বেগও নেই। ভৌতিক প্রমাণ পরীক্ষা করবার জন্য তোড়জোড়টা নিতান্তই উপলক্ষ—আসল লক্ষ্য নির্বিবাদে বেশ খানিকটা জমিয়ে আড্ডা দেওয়া। ঘড়িটা ছিল আমাদের মাথার শিয়রে পাশের দেওয়ালে। ঘাড় তুলে দেখলাম, একটা বাজতে দশ মিনিট। ক্ষণকাল পরে খুট ক'রে একটা শব্দ হলো; ঘণ্টা বাজাবার মিনিট পাঁচেক আগে ঘড়ির মধ্যে যে শব্দ হয়, সেই শব্দ। আমি বললাম, "স্ক্রাম সময় হয়েছে, এবার মুখ বুজে কান পাতো।" কথা বন্ধ ক'রে আমরা দুজনে উৎকর্ণ হলাম। ঘর হয়ে গেল একেবারে নিঃশব্দ, একমাত্র সুশীলের ন্রাকের ফিসফিসানি আর ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ ছাড়া।

যথাসময়ে ঢং ক'রে একটা বাজল,—আর সঙ্গে সঙ্গে একযোগে উপরকার দোতলার ঘরে মার্বেল পড়ার শব্দ,—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—মৃদু নয়, অস্পষ্ট নয়,—একেবারে সুস্পষ্ট, সজোরে।

এ-দিকে ফরাসের উপর যেন বৈদ্যুতিক সংযোগে আমাদের দুজনের পা থেকে মাথা সর্বশরীরে ছম্ ক'রে কাঁটা ধ'রে গেছে,—নড়ন নেই, কথা নেই, বার্তা নেই, উর্ধ্বনাসিক হয়ে উভয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছি, যেন দুটি নির্বাক নিশ্চল মাটির পুতুল। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না, তা পর্যন্ত বোঝবার উপায় নেই। তার উপর মনের মধ্যে গভীর দুশ্চিন্তা—হঠাৎ যদি দেখি তক্তাপোশের ধারে ধারে একটি বছর চারেকের ছেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তা হ'লে কী করা যাবে। কী করা যাবে সে কথা অবশ্য আগে-ভাগে বলা কঠিন, কিন্তু যতদূর অনুমান হয়, ওরূপ সাংঘাতিক অবস্থা উপস্থিত হ'লে বোধ করি আমাদের দুজনের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে একমত হ'য়ে হার্ট ফেল করা। আপাতত উভয়ের ঠিক একই মাত্রায় সমাধির অবস্থা—বিন্দুমাত্রও ইতর-বিশেষ নেই। কোনপ্রকার প্রস্তাব পরামর্শ না ক'রে অকস্মাৎ এরূপ একক্রিয় হবার দৃষ্টান্ত এই মতভেদপীড়িত বাংলা দেশে আর কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

আমাদের তো এই অবস্থা, ও-দিকে ঈজি-চেয়ারের উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে শ্রীমান সুশীলচন্দ্র নিশ্চিত সুনিদ্রায় নিমগ্ন। Ignorance is a bliss—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জ্ঞানের বৈমাত্র ভাই অজ্ঞানতা মানুষের পক্ষে অনেক সময়েই কল্যাণস্বরূপ। সুশীল আমাদের চেয়ে পাঁচ-ছ বৎসরের ছোট; তবু মনে হচ্ছিল, ও যদি একবার জেগে ওঠে তো ওকে অবলম্বন ক'রে আমরা দুজনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। কিন্তু পরিশ্রান্ত সুশীলের প্রগাঢ় নিদ্রার মধ্যে তার সুদূর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। আর আমাদের দেহেও বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না তাকে জাগাবার।

আমাদের মতো দুজন জোয়ান যুবাপুরুষের পক্ষে মার্বেলের শব্দে অতটা ভয়

পাওয়া সমীচীন হয় নি, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু ভয়ের মতো অযৌক্তিক ব্যাপার তো বেশি নেই,—অতি অল্প সময়েই সে যুক্তিবিবেচনায় অনুপাত মেনে চলে। সময়বিশেষে সামান্য একটু মৃদু শব্দে যে-পরিমাণ ভীতি উৎপন্ন হয়, অনেক সময় কামান দাগলেও তত হয় না। এ কথার প্রমাণস্বরূপ ক্ষুদ্র একটি গল্প বলি।

আমরা তখন ভাগলপুরের বাইরে থাকি। আমাদের দোতলার ঘর-দালান সব সময়েই তালা দেওয়াই থাকে, শুধু সকাল-সন্ধ্যায় তালা খুলে শরৎচন্দ্র ও মণিদাদা সেখানে লেখা-পড়া করেন। শরৎচন্দ্র অর্থাৎ পরবর্তী কালের ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, আর মণিদাদা অর্থে আমার ছোট কাকা মহাশয় অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই মামা-ভাগ্নে—মণিদাদা ও শরৎচন্দ্র, শুধু সমবয়স্কই ছিলেন না, উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একসঙ্গে আহার, একসঙ্গে স্কুল-কলেজ যাওয়া, একসঙ্গে লেখা-পড়া করা,—সর্বদা তাঁরা একত্রে থাকতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতলে উপস্থিত হ'য়ে শরৎচন্দ্র দেখেন মণিদাদা আগেই পৌঁছে গেছেন। ঘরের মধ্যস্থলে দরজার দিকে পিঠ ক'রে ব'সে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে প্রদীপের সল্‌তে ওসকাতে ওসকাতে নিবিষ্ট মনে একটা কোনও চিন্তায় মগ্ন আছেন।

শরৎচন্দ্র দেখলেন, মহাসুযোগ উপস্থিত। এ সুযোগ কিছুতেই হারানো উচিত নয়। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে মণিদাদার পশ্চাতে এসে উপবেশন করলেন, তারপর মণিদাদার বাম কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অতিশয় মৃদু স্বরে বললেন, হা।

কানের পাশে অস্ফুট 'হা' শব্দ শুনে মণিদাদা সিদ্ধান্ত করলেন, ভূত এসে গেছে এবং অতি সন্নিকটে। হাত কেঁপে পিলসুজ থেকে প্রদীপ মাটিতে প'ড়ে ঘর হ'য়ে গেল অন্ধকার। তারপর দরজা দিয়ে পলায়নের অভিপ্রায়েই বোধ হয় বোঁ ক'রে ফিরতে গিয়ে সাংঘাতিক পরিণতি দেখা দিলে। ভূত এসে পড়ল একেবারে দুই বাহুর মধ্যে। এখন এরূপ অবস্থায় মানুষ মরিয়া হওয়া ছাড়া কিছুই হ'তে পারে না। মণিদাদাও তাই হলেন এবং ভূতকে নিয়ে কী করা যেতে পারে সহসা ভেবে না পেয়ে আপাতত দুই হাতে সবলে তাকে চেপে ধ'রে দুই চক্ষু বুজে ঝাঁকানি দিতে আরম্ভ করলেন। এই ঝাঁকানিটা মহাসংকটের উপলব্ধির একটা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এদিকে বলবান মণিদাদার সবল ঝাঁকানির মধ্যে প'ড়ে ভূত বেচারার তো ওষ্ঠাগতপ্রাণ। "ও মণিমামা, আমি। ও মণিমামা আমি শরৎ। ছেড়ে দাও।"

কে কার কথায় কান দেয়। চোখ বুজে মণিদাদা সমানে ঝাঁকানি দিয়ে চলেছেন।

"ও মণিমামা, ম'রে গেলুম ছেড়ে দাও,—আমি শরৎ।"

অবশেষে মণিদাদার কর্ণে সকাতর আবেদন প্রবেশ করল। শরৎকে ছেড়ে দিয়ে গম্ভীরস্বরে তিনি ব'লে উঠলেন, "শরৎ? হতভাগা। আমাকে তুই মেরে ফেলেছিলি।"

উত্তরে করুণ কণ্ঠে শরৎ বলেছিলেন, "তোমার কানের কাছে অল্প একটু হা করলে যদি মেরে ফেলা হয়, তা হ'লে মিনিট দশেক ধ'রে আমাকে তোমার ঐ দুর্দান্ত ঝাঁকানি দিলে কী করা হয়, তা আমি জানি নে।"

এ মন্তব্য কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্তরের কথা নয়। মণিদাদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিকট এক চিৎকার করা অপেক্ষা 'অল্প-একটু হা' করা যে ভীতি উৎপাদনের দিক দিয়ে অনেক বেশি কার্যকর, সে কথা শরৎচন্দ্রের অবিদিত ছিল না।

সে যাই হোক, আমাদের ক্ষেত্রেও যদি বছর চারেকের একটি বালককে আমাদের তক্তাপোশের ধারে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখা যেত, তা হ'লে যে-আমরা মার্বেল পড়ার শব্দ শুনে মৃতবৎ নিস্পন্দ হ'য়ে পড়েছিলাম, সেই-আমরাই হয়তো মরিয়া হ'য়ে উঠে সেই বালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু সে বিষয়ে সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় অগত্যা যেমন ছিলাম, তেমনিই প'ড়ে রইলাম—দু-চার মিনিট নয়, পুরোপুরি আধ ঘণ্টা।

রাত্রি দেড়টার সময় হড়-হড় ক'রে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। আমাদের গৃহসম্মুখে উপস্থিত হয়ে 'রোকো' 'রোকো' রবে আরোহী চিৎকার ক'রে উঠতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। জয় রামচন্দ্র! কিশোরীনাথ ঝা, থিয়েটার দেখে ফিরেছেন। কিশোরীবাবু দাদার একজন বিশিষ্ট বিহারী মক্কেল, সুরসিক ব্যক্তি এবং বয়সে বছর কুড়িক বড় হ'লেও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি যে এ সময়ে থিয়েটার দেখে ফিরবেন, সে আশ্বাসের কথার খেয়ালই ছিল না।

উল্লসিত হ'য়ে শয্যা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে দুদ্দাড় ক'রে ছুটে গিয়ে সদরদরজা খুলে প্রায় অভিনন্দিত ক'রে কিশোরীবাবুকে ভিতরে নিয়ে এলাম। শ্যামরতনকে ও আমাকে দেখে কিশোরীবাবু বিস্মিত হলেন, খুশিও হলেন। মিনিট পাঁচ-সাত কথাবার্তার পর যে-যার শয্যায় শুয়ে পড়লাম। কিশোরীবাবু শয়ন করলেন আমাদের পাশের ঘরে। উৎকট উত্তেজনা থেকে মুক্তিলাভ ক'রে দেহ শিথিল হ'য়ে গিয়েছিল—গাঢ় নিদ্রার মধ্যে নিমজ্জিত হ'তে বিলম্ব হলো না।

পরদিন সকালে কথাটা দাদাকে বললাম। শুনে দাদা বললেন, "মেয়েদের কাছে গল্প ক'রো না—ভয় পাবে। অনেক বাড়িতেই মার্বেল গড়ানোর মতো শব্দ শোনা যায়। ও এমন কিছু নয়।"

কিন্তু আট-দশ দিন পরেই দাদার 'এমন কিছু নয়' বেশ একটা কিছু হ'য়ে দাঁড়াল। দাদার দ্বিতীয় জামাতা সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি) দু-চার দিনের জন্য আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

একদিন সকালবেলা সুবোধ আমাকে বললেন, "ছোটকাকা, কাল রাত্রে একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলাম।"

শোনা মাত্র আমার মনে হ'ল, এ নিশ্চয়ই মার্বেলের শব্দ সংক্রান্ত কোন ব্যাপার। সকৌতূহলে বললাম, "কী বল দেখি?"

সুবোধ বললেন, "রাত তখন একটা-দেড়টা হবে, দোর খুলে দেখি, বারান্দায় শ্বশুর মশায়ের ঘরের দরজার সামনে একটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে। প্রথমে ভাবলাম, বাড়িরই কোন ছেলে হবে; কিন্তু অত রাত্রে ছোট ছেলে কী ক'রে একা বারান্দায় বার হয় ভেবে বিস্মিতও হলাম। তারপর হঠাৎ দেখি, ছেলেটি কখন অন্তর্হিত হয়েছে; ভালো ক'রে দেখতে গিয়ে দেখি—না, দাঁড়িয়েই রয়েছে। পর-মুহূর্তেই কিন্তু ছেলেটি পুনরায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। গতিক ভালো নয় দেখে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম।" ব'লে সুবোধ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

সেই দিনই দাদাকে সুবোধের অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। দাদা অবশ্য পূর্বের মতো মেয়েদের নিকট এ কথা বলতেও নিষেধ ক'রে দিলেন; কিন্তু সেদিনের মতো 'ও এমন কিছু নয়' বলতে পারলেন না।

সুবোধের অভিজ্ঞতার এবং আমাদের অভিজ্ঞতার দুটি গল্পকে স্বতন্ত্রভাবে উড়িয়ে দেওয়া (explain away করা) যত সহজ, একত্রে তত সহজ নয়। দুটি গল্পকে সংযুক্ত ক'রে দেখলে মনে হয়, উভয়ের সমষ্টি থেকে কোন এক সত্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।

এ বিষয়ে একটা কথা জানানোর প্রয়োজন আছে। মাস কয়েক পরে আবার একদিন শ্যামরতন ও আমি উভয়ে মিলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আমাদের বৈঠকখানা-ঘরে রাত্রি একটা পর্যন্ত জেগে কাটিয়েছিলাম। আমরা দুজন ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। সেদিন কিন্তু আমরা মার্বেল পড়ার শব্দ শুনতে পাই নি।

ভৌতিক সত্তা সম্বন্ধে বিশ্বাস যাঁদের সুদৃঢ়, তাঁদের কাছে কিন্তু দ্বিতীয় দিনে মার্বেলের শব্দ না শুনতে পাওয়ার কৈফিয়ৎ আছে। তাঁরা বললেন, প্রেতাত্মারা একবারই শুধু তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেন, বারংবার পরীক্ষা দেওয়ার তামাশায় শরিক হন না।

হয়তো তাই।

আমার দ্বিতীয় গল্পটি শোনা গল্প। শোনা হ'লেও এত বিশ্বস্তসূত্রে শোনা যে, তার ঘটনা-অংশ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, তাৎপর্য তার যা-ই হোক-না কেন। আমার মাতাঠাকুরাণী এবং মেজদাদার মুখে গল্পটি বহুবার শুনেছি।

তখন আমরা পূর্ণিয়ায় থাকি। দুটি যমজ কন্যা প্রসব করার পর মাতাঠাকুরাণীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। পূর্ণিয়ায় যখন শারীরিক উন্নতির কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, তখন উন্নততর চিকিৎসা এবং বায়ুপরিবর্তনের জন্য তাঁকে ভাগলপুর নিয়ে

যাওয়া হলো। যমজ মেয়ে দুটির লালন-পালনের সুবিধার জন্যে নিযুক্ত করা হ'লো একটি দুগ্ধবতী ধাত্রী।

কিছুকাল ভাগলপুরে অবস্থান করার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে মাতা-ঠাকুরাণী মেজদাদার সহিত পূর্ণিয়ায় ফিরে চলেছেন। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে প্রায় সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত করতে হবে। ভোর চারটের সময়ে ঘাটের গাড়ি ছাড়বে; সেই গাড়িতে আরোহণ ক'রে সকরিগলিঘাটে এসে স্টীমারে গঙ্গা উত্তীর্ণ হ'য়ে মণিহারীঘাটে পৌঁছে পূর্ণিয়ার রেল ধরতে হবে।

সাহেবগঞ্জ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে মাতাঠাকুরাণী ও মেজদাদা অপেক্ষা করছেন। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা, মেজদাদার দেহে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে মাতাঠাকুরাণী বলেন, "রমণী, বড় খুকী মারা গেছে।"

বড় খুকী অর্থে যমজ দুটি কন্যার মধ্যে বড়টি।

চমকিত হ'য়ে মেজদাদা বললেন, "সে কি কথা! তুমি কেমন ক'রে জানলে?"

মা বললেন, "সে নিজে এসে আমাকে জানিয়ে গেল।"

মেজদাদা বললেন, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ মা। ও কিছু নয়।"

সবেগে মাথা নেড়ে মা বললেন, "না, না,—স্বপ্ন-টপ্ন ওসব কিছু নয়, আমি তখন জেগে ছিলাম। বড় খুকী এসে সহজ সুরে আমাকে বললে, 'মা, আমি তোমার বড় খুকী, এখুনি মারা গেলাম। তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি।' আমি হকচকিয়ে গেলাম। কথা বলবার সময় না দিয়ে সে চ'লে গেল।"

মার বাক্যের মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে মেজদাদা আর কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না, চুপ ক'রে রইলেন।

পরদিন বেলা দশটার সময় উভয়েই পূর্ণিয়া স্টেশনে পৌঁছলেন। স্টেশন থেকে ভাড়ায় আমাদের বাড়ি যাবার পথে মাঝখানে এক জায়গায় কাপ্তেনঘাটের পুল পড়ে। কাপ্তেনঘাটের পুলের নিম্নেই পূর্ণিয়ার শ্মশান অবস্থিত। কাপ্তেনঘাটের পুলের উপর দিয়ে যাবার সময়ে মাতাঠাকুরাণী প্যাল্পনি থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছেন, সৎকার করতে যারা এসেছিল, তখনও তারা সেখানে আছে কি না! বড় খুকীর মৃত্যু সম্বন্ধে এতই তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।

বাড়ি পৌঁছে মেজদাদা দেখলেন, সাহেবগঞ্জ স্টেশনে মাতাঠাকুরাণী তাঁকে যে কথা জানিয়েছিলেন—স্বপ্ন দেখেই হোক, অথবা অপর যে কোন কারণেই হোক—তা সম্পূর্ণ নির্ভুল। ঠিক তার আগের রাত্রে বারোটা আন্দাজ বড় খুকী হঠাৎ মারা গেছে। বিশেষ কোন অসুখ-বিসুখ করে নি; সকাল থেকে কয়েকবার বমি করেছিল, তারপর অকস্মাৎ মৃত্যু।

আমাদের সহজ সাধারণ বিবেচনাও বিচারশক্তির দ্বারা এ গল্পটির যৌক্তিকতা পরীক্ষা ক'রে দেখতে গেলে সহজেই হয়তো এমন কয়েকটি দুর্বল স্থান অনুভব করা যাবে, যার উপর রীতিমতো জেরা চালানো সম্ভব। কিন্তু কথা হচ্ছে,

ভৌতিক কল্পনা যদি আদৌ ভুলই হয়, তা হ'লে ইহলোকের বুদ্ধি-বিচার' ধারণা-বিবেচনার মাপকাঠি দিয়ে সে কথা প্রমাণ করতে যাওয়াও ভুল হবে।

তা ছাড়া, এ গল্পের মধ্যে ভৌতিক সংস্পর্শবর্জিত এমন দুটি ব্যাপার আছে, যার রহস্য সকল বুদ্ধি বিচার বিবেচনাকে হার মানায়। প্রথমত, সাহেবগঞ্জে মাতাঠাকুরাণী কর্তৃক বড় খুকীর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন; দ্বিতীয়ত,ঠিক সেই একই সময়ে পূর্ণিয়ায় বড় খুকীর মৃত্যু। কোনও লৌকিক কৈফিয়তের দ্বারা এমন অলৌকিক ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটন বোধ করি আজ পর্যন্ত কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়।

তের

সুখাদ্য বিশেষত বাঙালীর পক্ষে পাকা রুইমোছের মতো প্রথম শ্রেণীর সুখাদ্য, সুস্থ শরীরের রুচি এবং ক্ষুধার পরিপূর্ণ সহযোগিতার মধ্যেও কীরূপ যন্ত্রণার কারণ হ'তে পারে, তার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করেছিলাম কলিকাতা ঝামাপুকুর লেনের একটি মেসে বাস করবার সময়ে।

তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়ি। হাইকোর্টের দীর্ঘ পূজার ছুটি আরম্ভ হ'তেই আমাদের ভবানীপুরের বাড়ি থেকে সকলে ভাগলপুরে চ'লে গেলেন। আমার কলেজ বন্ধ হ'তে তখনও দিন কুড়ি বাইশ দেরি। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,'আমার দুই খুড়তুত ভাই, ঝামাপুকুর লেনের একটি ছাত্র-মেসে থেকে কলেজে পড়েন। যতদূর মনে পড়ে, সেই বাড়িটি সতের নম্বরের।

সুরেনদাদা ও গিরীনের সম্পর্কে সর্বদা আমি ঐ মেসে গিয়ে আড্ডা জমাতাম, বিশেষত গান-বাজনা করতাম ব'লে, মেসের সকল সদস্যেরই সঙ্গে আমার পরিচয়, এমন কি কিছু খাতিরদারিও ছিল।

আমার আত্মীয়রা ভাগলপুর যাওয়ার পর সুরেনদাদার আগ্রহে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি তাঁর দীর্ঘ মেয়াদি অতিথি (long term guest) হ'য়ে তল্পি তল্পা নিয়ে ঝামাপুকুরের মেসে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। কিছুদিনের মতো আমার সঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে সুলভ হওয়ায় সুরেনদাদা ও গিরীন ভায়ার তো কথাই নেই, অপর মেম্বারগণও বিশেষ আনন্দিত হলেন।

প্রাইভেট মেসের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সকল মেম্বারকে একাদিক্রমে এক এক মাস মেসের ম্যানেজার, অর্থাৎ সংসারের গৃহিণী, হ'তে হয়। ভাঁড়াড়ের চাবি থাকে, অবশ্য আঁচলে নয়, তাঁর জামার পকেটে; টাকাকড়ি থাকে তাঁরই বাক্সে; দোকান-বাজার হয় তাঁরই খেয়াল এবং হুকুম অনুসারে; আর প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা তিনিই ভাঁড়ার বার ক'রে থাকেন। মাঝে

যাকে দরকার পড়লে চাকর-বামুনকে দু-চার টাকা আগাম-প্রাপ্তির জন্ম হাত পাততে হয় তাঁরই নিকট। সর্বোপরি, বাজারের টাকাকড়ির হিসাবে দু চার পয়সা যদি কম পড়ে, অথবা মবলগ দু-চার আনা আত্মসাতের বিষয়ীভূত হয়েছে ব'লে যদি সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে তা হ'লে সে কথা ক্ষমা অথবা উপেক্ষা করবার একমাত্র মালিক ম্যানেজার। সুতরাং যাঁর যখন ম্যানেজারির পালা, চাকর-বামুনদের উপর তাঁর তখন প্রভাব-প্রতিপত্তি সকলের চেয়ে বেশি। আমি যখন মেসে এসে উঠলাম, তখন চলেছে সুরেনদাদার পালা। কাজে-কাজেই ম্যানেজারবাবুর অতিথিরূপে আমার আদর-যত্ন একটু বেশি হবারই কথা, হয়েওছিল অবশ্য তাই। কিন্তু সেই হলো আমার যন্ত্রণার প্রথম কারণ, দ্বিতীয় কারণের কথা পরে বলছি।

আমি মেসে এসে পৌঁছতে সুরেনদাদা পাচককে বললেন, "ঠাকুর, এ বাবু কখনও মেসে থাকেন নি। বাড়িতে থাকেন, ভালো খান-দান। তুমি একটু ভালো ক'রে—"

সুরেনদাদাকে কথা শেষ করতে হ'ল না, সম্পূর্ণ সম্মতচিত্তে ঘাড় নেড়ে ঠাকুর বললে, "সে আর আমাকে বলতে হবে না বাবু, আপনার যখন ভাই, কোনও কষ্ট হবে না বাবুর।"

প্রথম কারণ এইরূপে সৃষ্টি করেন সুরেনদাদা; তার একটু পরেই আমি করলাম দ্বিতীয় কারণের সৃষ্টি। ঠাকুরের হাতে একটি টাকা দিয়ে বললাম, "ঠাকুর, আমি সকালে তর্পণ করি, গঙ্গাজল দরকার হয়। আজ তর্পণ ক'রে এসেছি, আজ আর দরকার হবে না; কাল থেকে দরকার হবে। তুমি যদি আমার পিতলের ঘড়াটা ক'রে এক ঘড়া গঙ্গাজল এনে দাও, তা হ'লে ঐ জলেই যে-কয়েক দিন তর্পণ এখনও বাকি আছে চ'লে যাবে। ঘড়া বড় নয়, মাঝারি।"

ঠাকুর মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলে, ম্যানেজারবাবুর যখন ভাই, তখন তাঁর ফাই-ফরমাশের ওপর একটু পরিশ্রম দেখাতে পারলে ম্যানেজারবাবুকে খুশি রেখেও বাজারের হিসাবে আরও কিছু অসুবিধা করা যেতে পারে। ঘাড় নেড়ে বললে, "এনে দোব বাবু। এ টাকায় কী আনতে হবে বলুন?"

বললাম, "আনতে কিছু হবে না। গঙ্গাজল আনবার বকশিশ দিলাম তোমাকে ও-টাকা। আবার যাবার দিন ভালো ক'রে বকশিশ দিয়ে যাব।"

মেসের ঠাকুর অনেক বাবুকে চরিয়ে খায়, কাঁচা লোক সে নয়। তবু সামলাতে পারলে না, স্মিতস্ফুরিত মুখে এবং ঈষৎ বিস্ফারিত দুই চক্ষে উগ্র আনন্দের এবং ততোধিক উগ্র বিস্ময়ের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পেলাম। এক ঘড়া গঙ্গাজল আনবার জন্ম অগ্রিম এক টাকা বকশিশ। তাও বড় নয়, মাঝারি সাইজের ঘড়া! তার উপর, যাবার দিন পুনরায় ভালো ক'রে বকশিশ দিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি। সে ভালো বকশিশ নিদেন পক্ষে কোন্-না টাকা দুই তো

হবে। আমি অবশ্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি নি, তথাপি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে সময়ে ঠাকুর মনে করেছিল, সহসা তার অদৃষ্টে একটা ছোটখাটো সৌভাগ্যযোগের উদয় হয়েছে, যার ফলে তার পুজোর সময়ের তহবিল কিছু স্ফীত করবার জন্য ভবানীপুরের রাজপুত্রগোছের এক বাবুলোক মেসে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্য এই গান-গাওয়া আড্ডা-মারা বাবুটিকে সে অনেক সন্ধ্যায় মেসে দেখেছে, কিন্তু তখন কে জানত, অমন ধানের এমন চাল।

ঠাকুর বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবু, আপনাদের খাইয়ে-দাইয়ে আমি জল আনতে চ'লে যাব। জল নিয়ে এসে তারপর খাওয়া-দাওয়া করব।"

আমি বললাম, "তার দরকার নেই, আজ যে-কোন সময়ে জল আনলেই চলবে, খাওয়া-দাওয়া সেরে তারপর যেয়ো। আর এ বেলা আমি এখানে খাব না, ভবানীপুরে চললাম, সেখানেই আহার করব। তারপর সন্ধ্যার গাড়িতে আমার আত্মীয়দের হাওড়ায় তুলে দিয়ে ফিরব, রাত্রে অবশ্য এখানে খাব।"

ঘাড় নেড়ে ঠাকুর বললে, "যে আজ্ঞে।"

সন্ধ্যার পর হাওড়া থেকে ফিরে এসে দেখি, মেসে আড্ডা জমেছে,—মনে হলো আমার আসবার পর আড্ডা আর একটু ঘনীভূত হ'য়ে উঠল। অক্ষয়বাবু নামে মেসে একটি শৌখিন মেম্বার ছিলেন, তাঁর একটি দামী হারমোনিয়ম ছিল। সে হারমোনিয়মটি তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন এবং সহজে কাউকে হাত দিতে দিতেন না। কিন্তু আমার হাতে হারমোনিয়মের কোনও ক্ষতি হবে না, এ বিশ্বাসটুকু তাঁর ছিল। আমি মেসে এলেই তিনি হারমোনিয়মটি বার ক'রে দিতেন এবং পীড়াপীড়ি ক'রে আমাকে গান গাওয়াতেন। যতদূর মনে পড়ছে, সুযোগমতো আমার কাছে তিনি অল্প-স্বল্প সঙ্গীত শিক্ষাও করতেন।

সেদিনও আমি আসার পর অক্ষয়বাবুর হারমোনিয়ম এসে পড়ল এবং গান আরম্ভ হ'লো। গানে ও গল্পে আসর হ'য়ে উঠল সরগরম। গানের পর গল্প এবং গল্পের পর গান চলতে চলতে রাত যখন নটা সাড়ে নটা হ'ল, ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে আহার প্রস্তুত।

এর আগে কখনও মেস-জীবন অতিবাহিত করি নি; এর পরেও কখনও নয়। সামাজিক সংসারের সুনির্দিষ্ট ছক থেকে বেরিয়ে অসামাজিক মেসের আলগা এলাকায় প্রবেশ লাভের পর তার সূত্রপাতটি ভারি মিষ্টি লাগল। বাঁধন আছে; কিন্তু বন্ধন নেই; ছন্দ আছে, কিন্তু সে ছন্দে মিল বসাবার অযথা উদ্বেগ নেই। খুশি হলাম। কিন্তু কে জানত, এই খুশি হওয়ার অব্যবহিত পরেই অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সংকট দেখা দিয়ে মেসের আনন্দময় অনাবিল দিবস-প্রহরের প্রত্যাশাকে ধূসর ক'রে দেবে!

হৈ চৈ ক'রে একতলায় নেমে এসে খাবার ঘরে প্রবেশ ক'রে আসনে আসনে যেখানে যার খুশি ব'সে পড়া গেল। এক প্রান্ত থেকে ঠাকুর অন্নের থালা পরিবেশন করতে আরম্ভ করেছে। অসাধারণ ক্ষিপ্রতা। দেখতে দেখতে

সকলের সামনে ভাতের থালা ও ডালের বাটি প'ড়ে গেল। গোটা তিনেক তরকারি,—একটা ভাজা, একটা চচ্চড়ি ও একটা ঝাল দেওয়া মাছ। মেসের বাঁধা নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকের পাতে দুই খণ্ড ক'রে মাছ। তরকারিগুলি থালার দক্ষিণ দিকে স্থাপিত।

ভাত ভাঙতে গিয়ে হাতে কি একটা ঠেকল। বার ক'রে দেখি, এক টুকরো মাছ। বুঝতে বাকি রইল না, 'যাবার দিনে ভালো ক'রে বকশিশ দেওয়া' যাতে সত্য সত্যই ভালো হ'তে পারে তদ্বিষয়ে ঠাকুর অবিলম্বিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। তাড়াতাড়ি মাছের টুকরোটা ভাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পাশের দিক থেকে খানিকটা ভাত ভেঙে নিয়ে ডাল ঢালতে গিয়ে ডালের মধ্যেও কী একটা কঠিন পদার্থ অনুভব করলাম। প্রবল সন্দেহ হলো, এও হয়তো মাছেরই টুকরো। এদিক ওদিক দক্ষিণে বামে তাকিয়ে দেখলাম, ক্ষুধার প্রথম মুখে সকলেই নিজ নিজ আহারে ব্যস্ত, আমাকে লক্ষ্য করার মতো অবসর কারও তখন নেই। ডালের ভিতর থেকে কঠিন পদার্থটাকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার ক'রে দেখি, অনুমানে একটুও ভুল হয় নি, আর একটা মৎস্যখণ্ডই বটে। তাড়াতাড়ি সেটাকে চচ্চড়ির ভিতর চাপা দিয়ে ডাল-ভাত মেখে ভাজা দিয়ে খেতে খেতে, এ কঠিন অবস্থায় কী করা কর্তব্য তা নির্ণয়ের দুর্ভেদ্য সমস্যায় নিমগ্ন হলাম। কথাটা যদি প্রকাশ ক'রে ব'লে ঠাকুরের অসঙ্গত কাজের নিন্দা করি, তা হ'লে আমার সততা রক্ষা হয় বটে; কিন্তু ঠাকুর বেচারাকে বিপদে ফেলা হয়। অথচ, যেখানে প্রত্যেকে মাত্র দু-টুকরো ক'রে মাছ খাচ্ছে, আমি সেখানে প্রকাশ্যে দু-টুকরো এবং গোপনে আরও দু-টুকরো চোরাই মাছ খাই কী ক'রে? দুশ্চিন্তায় আমার আহার মন্থরগতিতে চলেছে; অপর পক্ষে যারা ক্ষুধার স্বাভাবিক নিষ্পাপ তাড়নায় খাচ্ছে, তাদের আহার এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতি ভরে। যা হয় একটা কিছু অবিলম্বে স্থির করা দরকার।

মনে হলো, ঠাকুরকে অন্তত একটা সুযোগ দেওয়া মোটের উপর সঙ্গত হবে। কালই তাকে সতর্ক ক'রে দিতে হবে, এমন অন্যায় কাজ দ্বিতীয়বার যেন সে কিছুতে না ক'রে। প্রথম অপরাধেই বেচারাকে ধরিয়ে দিলে নীতির দিক দিয়ে আমার পক্ষে যত বাহাদুরি দেখানোই হোক না কেন, অন্তরের দিক দিয়ে একটু হৃদয়হীনতারও পরিচয় দেওয়া হয়। ও যদি আমাকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে দুখানা মাছ চুরি ক'রে দিয়ে থাকে, তা হ'লে ওর সেই ঋণ পরিশোধ করবার উদ্দেশ্যে আমি যদি সে কথাটা আজকের মতো গোপন ক'রে যাই, তা হ'লে বোধ হয়, খুব বড় একটা অপরাধ হয় না।

মনের মধ্যে নৈতিক সমর্থন পাওয়া মাত্র নিমেষের মধ্যে কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হ'য়ে গেল। ঝাল-দেওয়া মাছের একখানা টুকরো সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে যে ব্যাপার করলাম, তাকে গলাধঃকরণ পর্যন্ত বলা চলে, কিন্তু খাওয়া কিছুতেই বলা যায় না। তার পর সামনের দিক থেকে মাছের টুকরো সমেত বেশ

খানিকটা ভাত ভেঙে নিয়ে ডাল মেখে মাছ দিয়ে খেতে আরম্ভ করলাম। যত শীঘ্র সম্ভব এ মাছটারও গতি ক'রে চচ্চড়ি-ঢাকা মাছটা সন্তর্পণে বের ক'রে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলাম। এখন বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম,—অবস্থা আয়ত্তে আনা গেছে। এখন যদি একান্তই কেউ আমার থালা লক্ষ্য করে, বড় জোর মনে করবে, মাছ-ভক্ত মানুষ চচ্চড়ি শেষ না ক'রেই মাছে হাত দিয়েছে।

সত্য কথা বলতে, পাকা রুই মাছের সুমিষ্ট আস্বাদ পেলাম তৃতীয় এবং চতুর্থ মৎস্যখণ্ডে; পূর্বের দুই খণ্ড নষ্ট হয়েছিল কেবলমাত্র সঙ্কট-মোচনের প্রচেষ্টায়; দুই-একটা প্রশ্নের অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া ছাড়া এ পর্যন্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কারও সঙ্গে কথা কই নি; এবার নিশ্চিন্ত উল্লসিত মনে হাস্য-কৌতুকে যোগ দিলাম। কিন্তু অনেক কৌশলে অনেক দুঃখে আজ সংকট মোচন হয়েছে। এমন কুৎসিত ব্যাপারকে আর কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ঠাকুরকে শাসন করতেই হবে।

পরদিন সকালে কিন্তু ঠাকুরকে মাছের কথা বলবার সুযোগ পেলাম না। তাকে একান্তে. পেলাম একেবারে খাবার সময়ে। রাত্রিকালে সকলে একত্রে আহার করে; দিনের বেলা কিন্তু যে যার প্রয়োজনমতো যখন সুবিধে খেয়ে নেয়। সে সময়ে বেলা এগারোটার সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ আরম্ভ হ'তো, বাকি সব কলেজই শুরু হতো সাড়ে দশটা বেলায়। সুতরাং আমি যখন খেতে বসলাম, তখন প্রায় সকল সদস্যই আহারাদি সমাপন ক'রে বেরিয়ে গেছে।

ঠাকুর থালা এনে আমার পাতের সামনে রাখলে। পরিপাটী ক'রে বাড়া অন্ন, বেশি বেশি ব্যঞ্জন, চার খণ্ড মৎস্য। তা-ও প্রত্যেক খণ্ডই বৃহদাকার, পূর্বরাত্রে যে আকারের মাছ খেয়েছিলাম তার অন্তত দেড়া।

থালা রেখে আমার সামনে ব'সে প'ড়ে স্মিতমুখে ঠাকুর বললে, "বাবু, যদি রাত্রেও এখানকার মতো একটু আগে-পাছে ক'রে বসেন, তা হ'লে একটু জুৎ ক'রে খাওয়াতে পারি।"

চারখানা মাছ দেখেই মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল, তার উপর এই কথা শুনে পিত্ত জ্ব'লে গেল। তথাপি নূতন লোক আমি, কতকটা নরম সুরেই বললাম, "তুমি কি মনে করেছ ঠাকুর, মাছের লোভে আমি সকলের পরে খেতে বসেছি?"

সবেগে মাথা নেড়ে জিভ কেটে ঠাকুর বললে, "রাম! রাম! তাই কখনও মনে করতে পারি? মাছের আপনার কি অভাব? আপনি একা বসলে আমি একটু জুৎ পাই।"

বললাম, "কিন্তু জুৎ তো আমারও পাওয়া দরকার। কাল রাত্রে তুমি লুকিয়ে দু-টুকরো মাছ আমাকে বেশি দিয়েছিলে, তা খেতে আমার ভারি খারাপ লেগেছিল।

অবাক হ'য়ে বিস্ফারিত নেত্রে ঠাকুর বললে, "কেন?"

ঠাকুরের কথার সুরে বুঝতে পারলাম, আমার মন্তব্যের আসল তাৎপর্যই সে গ্রহণ করতে পারে নি। চিরদিন বাবুদের বঞ্চিত ক'রে মাছ খেয়ে খেয়ে যে রসনা

পাকিয়েছে, চুরি-করা মাছ খেতে কারও খারাপ লাগতে পারে, এমন কথা তার ধারণারই অতীত। ঠাকুরের কথার কোনও সোজা উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ বাবুদের কখানা ক'রে মাছ দিয়েছিলে ঠাকুর ?"

ঠাকুর বললে, "দুখানা ক'রে।"

"তা হ'লে আমাকে চারখানা কেন ?"

"আপনার সঙ্গে বাবুদের তুলনা ? ওঁরা হলেন মেম্বার, আপনি গেস্টো (guest)।"

"ওঁদেরও কি এমনই বড় বড় টুকরো দিয়েছিলে ?"

মৃদু হেসে ঠাকুর বললে, "উনিশ-বিশ।"

"কার বিশ ? আমার, না, ওঁদের ?"

সোজা উত্তর না দিয়ে, বোধ করি আমাকে কিছু খুশি করবারই মতলবে ঠাকুর বললে, "আপনার জন্যে একটু বেছে-বুছে রেখেছিলাম।"

বেছে-বুছে আদৌ নয়। মাছ কোটবার সময়ে চাকরকে দিয়ে ঠাকুর বড় বড় কয়েক খণ্ড কুটিয়ে নিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, রাত্রের জন্যও নিশ্চয় এই রকম চার টুকরো মাছ আমার জন্যে পৃথক করা আছে। এইরূপ বৃহদাকার আট টুকরো মাছের দ্বারা যে পরিমাণ ন্যায়সঙ্গত মাছ হ'তে মেসের মেম্বারদের বঞ্চিত করেছি, তার কথা ভেবে মনের মধ্যে গভীর গ্লানি উপস্থিত হলো। বললাম, "শোন ঠাকুর, আমি গেস্টোই হই আর যা-ই হই, মেম্বারদের যেমন মাছ দেবে আমাকেও ঠিক তেমনই দেবে। তুমি তো দু-টুকরো মাছ ভাতের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে খালাস, আমিও না-হয় তোমার মান আর আমার নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কোনও রকমে বাড়তি মাছ দুখানা লুকিয়ে খেলাম,—কিন্তু কাঁটা ? থালার পাশে চারখানা মাছের কাঁটা যে দুখানা মাছের কাঁটার ডবল আকারে উঁচু হ'য়ে ওঠে, তার কী করবে, বলো ? মান বাঁচাবার জন্যে মাছ না-হয় লুকিয়ে খেলাম, কিন্তু লুকিয়ে কাঁটা খেলে প্রাণ বাঁচবে কি ? অতএব ওসব লুকোচুরিতে আর কাজ নেই, দু-টুকরো মাছেই আমি খুব খুশি হব, এবার থেকে তুমি আমাকে মেম্বারদের সঙ্গে ঠিক একভাবে মাছ দেবে। আপাতত তিনখানা মাছ তুলে নাও।"

সবিস্ময়ে ঠাকুর বললে, "মাত্র একখানা খাবেন !"

বললাম, "এ একখানা মাছ বাবুদের দেওয়া দুখানা মাছের সমান হবে।"

"কিন্তু বাবুরা তো এখন কেউ নেই, তবে আপনার আপত্তি কিসের ?"

"সে কথা তুমি বুঝবে না ঠাকুর। তিনখানা মাছ তুমি তোল।"

কাতরকণ্ঠে ঠাকুর বলিলে, "সে তিনখানা মাছ কার মুখে দোব বাবু ? বাবুদের দেওয়া চলবে না, আমাদের মুখেও রুচবে না।"

বললাম, "তা যদি একান্তই না রোচে, তোমাদের মেসে তো একটা বৃহৎ সাইজের বেড়াল আছে, তাকে দিয়ো ; তার মুখে বাধবে না।"

পাত থেকে একখানা মাছ তুলে নিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে ঠাকুর বললে, "আর কোনও আপত্তি করবেন না বাবু,—আপনার কথা রাখলাম।"

পাপের ফাঁসে মানুষ যদি একবার মাথা গলায়, আর তার রক্ষা থাকে না ; নৈতিক শক্তি হারানোর ফলে পাপ যখনই টান দেয় তখনই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপের দিকে এগিয়ে যায়, পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করিতে পারে না। কাল রাত্রে চোরাই মাছ দুটি ভক্ষণ করার ফলে আমিও আমার নৈতিক শক্তি হারিয়েছিলাম, ঠাকুরের সহিত রফায় সম্মত হ'তে হলো।

রাত্রে খেতে ব'সে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো, সকালে ঠাকুরকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলাম, সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। খানিকটা মাছ, বোধ হয় দু-টুকরোই হবে, কাঁটা বেছে চূর্ণ ক'রে চচ্চড়ির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। তা না হয় দিক, কিন্তু প্রকাশ্যে যে দু খণ্ড পাতে দিয়েছে তার নিন্দনীয় আয়তন দেখে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল। বড় বড় আকারের আটখানা মাছ বার ক'রে নেওয়ার ফলে সাধারণ খণ্ডগুলো যেন কালকের রাতের খণ্ডর চেয়েও ছোট হ'য়ে গেছে ; আর তার দরুন উভয়বিধ খণ্ডের মধ্যে আকারের অনুপাত এমন অসঙ্গতভাবে অসম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, তা লক্ষ্য ক'রে অপর পক্ষ ক্রুদ্ধ হ'য়ে যদি প্রতিবাদ ক'রে বসে, আপত্তি করবার কিছু থাকে না।

কাল তবু সাধারণ আকারের প্রকাশ্য টুকরো দুটোর সহায়তায় ডাল ও ভাতের মধ্যে লুকানো চোরাই মাল দুটোকে পাচার করবার কিছু সুযোগ ছিল। আজ এই ঢিবে-ঢিবে রামটুকরো দুটোর কী উপায় করা যায়! কাঁটার সমস্যা না হয় সমাধান করা যাবে কতক কাঁটা পাতের পাশে ফেলে আর বাকি পিছন দিকের ভাতের তলায় অলক্ষিতে চালান করে। কিন্তু ভাজা ও চচ্চড়িতে হাত দেবার আগে মাছ যদি শেষ করে ফেলি, তা হলে দেখতে শুনতে ভারি বিশ্রী হয়। কে কী দেখল, কে কী ভাবল তা জানি নে, কোনওরূপে ঘাড় গুঁজে সে রাত্রির পালা শেষ করলাম।

পরদিন সকালে উঠে ভেবে দেখলাম, ঐ উৎসাহশীল ঠাকুরকে দমন করা আমার কাজ নয়, সুরেনদাদার কাছে দরবার করা ছাড়া উপায় নেই। সুবিধামতো তাঁকে একটু নির্জনে নিয়ে গিয়ে কাতরস্বরে বললাম, "দোহাই সুরেনদাদা, তোমার ঠাকুরের হাত থেকে বাঁচাও আমাকে। নইলে কোন্ দিন মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে হাসপাতালে যেতে হবে। উঃ! পাকা রুই মাছ যে এমন বিপজ্জনক জিনিস হতে পারে, আগে তা কে জানত!"

সকৌতূহলে সুরেনদাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন বল্ তো?"

আনুপূর্বিক সকল কথা সুরেনদাদার নিকট যৎপরোনাস্তি কাতরভাবে বিবৃত করলাম। কাহিনীটি মাছ খাওয়া সংক্রান্ত হলেও, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে করুণরসেরই প্রাধান্য ছিল। আশা করেছিলাম, সব কথা শুনে সুরেনদাদাও সহানুভূতিশীল হবেন। কিন্তু কাহিনীটা শুনতে শুনতে তাঁর মুখ উল্লসিত হয়ে উঠল এবং শেষ হলে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, তাঁর ধারণা হয়েছে—আমি তাঁর কাছে প্রগাঢ় কৌতুকরসের অবতারণা করেছি। কুঞ্চিত চক্ষে ভুজভুজ করে হাসতে

হাসতে বললেন, "এর জন্তে কাতর হয়েছিস? এ তো সৌভাগ্যের কথা রে! চারখানা করে বড় বড় রুই মাছের টুকরো বরাত জোর না হলে জোটে না। যে 'আপ্‌সে আতা হ্যায় উস্‌কো' আসতে দে।"

সুরেনদাদার দু হাত চেপে ধরে বললাম, "ও-কথা বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না, রক্ষা করতে হবে।"

মনে হলো, কাতর প্রার্থনায় সুরেনদাদার চিত্ত একটু দ্রবীভূত হয়েছে। বললেন, "আচ্ছা, ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইব।"

কী কথা কয়েছিলেন তা সুরেনদাদাই বলতে পারেন, আমার কিন্তু মনে হলো, যদি কথা কয়ে থাকেন, তদ্দ্বারা ঠাকুরের উৎসাহ শাণিতই হয়েছে। সেদিন মেসে মাংসের পালা। রাত্রে খেতে বসে দেখি, আমার বাটিতে নির্বাচিত নরম নরম একরাশ মাংস গজ্‌ গজ্‌ করছে, হাড় এবং ছাল সযত্নে বাদ দেওয়া, তার উপর গোটা পাঁচ-ছয় মেটের টুকরো। মাছের পরিমাপে মাংসের হিসাব ধরা একটু কঠিন। বুঝলাম, তারই সুযোগ নিয়ে ঠাকুর মাছের ঝাল মাংসয় ঝেড়েছে। এ কথাও বুঝতে বাকি রইল না যে, ঝামাপুকুরের মেস না পরিত্যাগ করতে হলে 'what cannot be cured must be endured'-নীতি অনুযায়ী ঠাকুরকে সহ্য করতেই হবে।

ঠাকুরের উপর রাগ ধরে, কিন্তু একটু মায়াও হয়। তার পদ্ধতি নিকৃষ্ট, কিন্তু উদ্দেশ্য নিন্দনীয় নয়,—সে আমাকে খুশি করতেই চায়। যাবার দিন দু টাকা বকশিশে চলবে না দেখছি। কিছু উঠতেই হবে।

মৎস্য-সমস্যার দ্বারা ঝামাপুকুরের মেস কণ্টকিত ছিল বটে, কিন্তু চিত্তবিনোদনের দুটি উপায়ও সেখানে খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রথম উপায়টি পেয়েছিলাম এক সঙ্গীতের আসরে; দ্বিতীয়টি স্কুলপথগামিনী দুটি বালিকার অবয়বে। প্রথমটির জন্য মেস ছেড়ে দু-দশ কদম দূরে যেতে হতো; দ্বিতীয়টির জন্য কিন্তু পাদমেকং মেস পরিত্যাগ করবার প্রয়োজন হতো না,—লগ্ন অনুযায়ী মেসের বারান্দায় দাঁড়াইলেই চলত। প্রথমে সঙ্গীত-আসরের কথাই বলি।

একদিন বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট হয়ে বাসায় ফিরছি। মেসের কাছাকাছি এসে দেখি, একটি বাড়িতে পথের ধারে একতলার বৈঠকখানায় উচ্চাঙ্গের গান বাজনা চলেছে। বাল্যকাল থেকে সঙ্গীতের অনুরক্ত শ্রোতা,—দাঁড়িয়ে পড়লাম। বৈঠকখানায় ফরাসের উপর গাইয়ে বাজিয়ে ও শ্রোতার ভিড়ে তিল ধারণের স্থান নেই। বাইরে পথের ধারে জানলায় জানলায় পথিক ও পল্লীবাসীর জনতা। ভিতরে যখন মাঝে মাঝে গানের সমের উপর শ্রোতাদের সমবেত প্রশংসামত্ত কণ্ঠের উচ্চ ঐকরব ধ্বনিত হচ্ছে, বাইরেও তখন জনতার মধ্যে তার সাড়া উচ্ছল হয়ে উঠছে। বৈঠকখানা ও পথপার্শ্ব নিয়ে একটা বৃহৎ আসরের সৃষ্টি হয়েছে। ভারি জমজমাট অবস্থা।

যে গানটি চলছিল শেষ হলে, পথের এক ভদ্রলোকের নিকট হতে কিছু কিছু

তথ্য সংগ্রহ করলাম। রায়সাহেব হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহের কর্তা থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত সকলেই সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ; দু-চার দিন অন্তর প্রায়ই সঙ্গীতের বৈঠক বসে ; তখনকার দিনের কয়েকজক খ্যাতনামা গাইয়ে-বাজিয়ে, যথা—কানা শরৎ, কায়েত শরৎ, ভোলানাথ বাঁড়ুজ্জে, সুশে (সুশীল) বাঁড়ুজ্জে প্রভৃতি নিয়মিত এসে আসর জমান।

পরবর্তী গান আরম্ভ হলো। প্রথমে কিছুক্ষণ চলল আলাপ, তারপর সহসা এক সময় শুরু হয়ে গেল বিলম্বিত লয়ের খেয়াল। তানে-বাঁটে গমকে মীড়ে সার্গমে গান হতে লাগল অলঙ্কৃত। বিশুদ্ধ রাগের অভিজাত চালের সহিত বাঁয়া-তবলার অপরূপ সংগত মিশ্রিত হ'য়ে সৃষ্টি করলে এক বিচিত্র স্বরলহরী, যা মাঝে মাঝে খণ্ডিত হ'তে লাগল শ্রোতৃবর্গের অদমনীয় স্বতঃস্ফূর্ত বাহবা এবং সম দেওয়ার রবে। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গান যখন শেষ হলো, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে।

আর দেরি করা চলে না। ওদিকে মেসে সকলের আহারকার্য যদি শেষ হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে তো মাছের কাঁটা বাগিয়ে ঠাকুর আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে। একা অসহায় অবস্থায় তার হাতে পড়লে নাকালের আর সীমা থাকবে না। দ্রুতপদে মেসের দিকে অগ্রসর হলাম।

যে কয়েকদিন ঝামাপুকুরের মেসে ছিলাম, তার মধ্যে পাঁচ-ছয় দিন সঙ্গীতের আসর বসেছিল। সর্বদা খবর রাখতাম এবং আসর আরম্ভ হ'লেই যথাস্থানে উপস্থিত হ'য়ে পদচারণ আরম্ভ করতাম। সেদিন বোধ হয় আমার পালার চতুর্থ দিন। গান চলছে, যথানিয়ম ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে গান শুনছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে বললেন, "আপনি তো দেখি প্রায়ই আসেন!"

মৃদু হেসে বললাম, "তা আসি।"

"গান-বাজনা ভালবাসেন বুঝি?"

বললাম, "বাসি।"

"তবে আসরে গিয়ে বসুন না, এখনও তো জায়গা রয়েছে। গানের আসরে শ্রোতার তো আটক নেই।"

তা হয়তো নেই ; কিন্তু জানা নেই, শোনা নেই, সম্পর্ক নেই, হঠাৎ গিয়ে হাজির হব, তারপর কেউ যদি গম্ভীরভাবে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে ব'লে বসে, "কী চাই এখানে?" তা হ'লে এমন তাল কেটে যাবে যে, পথে দাঁড়িয়েও গান শোনা আর চলবে না। নিজের মান নিজের হাতে রাখাই ভালো।

ভদ্রলোককে বললাম, "ভেতরে গিয়ে বসলে ইচ্ছামতো ওঠা চলবে না। এখানে কোনও অসুবিধে নেই।"

ঘণ্টা দুই কান ভ'রে গান শুনে প্রসন্নচিত্তে মেসে ফিরলাম।

সুদীর্ঘ সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বৎসর অতীতের কথা, কিন্তু সে সঙ্গীত-আসরের স্মৃতি মনে পড়লে এখনও যেন তার গভীর-মিষ্ট স্বর-ঝঙ্কার কানের মধ্যে শুনতে পাই।

শ্যামাপুকুরের মেসের দ্বিতীয় আকর্ষণের কথা হচ্ছে পূর্বোক্তা শ্লেটপুস্তকহস্তা বিলম্বিতবেণী দুটি স্কুল-বালিকার কথা। এবার সৎসাহসের সহিত সেই বিচিত্র ও আপাতগোপনীয় কাহিনী বলি।

চৌদ্দ

সকালে আহারের পর একদিন মেসের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অলস অন্যমনস্কভাবে পথের লোক-চলাচল দেখছি। মেসের প্রায় সকলেই বেরিয়ে গেছে, অবশিষ্ট আমিও মিনিট দশেক পরে কলেজ রওনা হব। এমন সময়ে দেখি, পশ্চিম দিক থেকে বই-শ্লেট হাতে দুটি মেয়ে আসছে। হঠাৎ চেতনা যেন সজাগতর হ'য়ে উঠল; আর মেয়ে দুটি যতক্ষণ দৃষ্টিপথে রইল, পথের বাকি সকল বস্তুই হ'য়ে গেল অবান্তর।

মেয়ে দুটি যুবতী নয়, কিশোরীও নয়—নিতান্তই 'অলপ বালিকা-বয়সী'; বড়টির বয়স বছর দশেক, ছোটটির বয়স বছর আষ্টেক। কিন্তু এজন্য আক্ষেপ করবার কোনও হেতু নেই,—তখনকার দিনই ছিল ঐ বয়সের। সেকালে মেয়েদের বিবাহ হতো এগার-বারো বৎসর বয়সে, সুতরাং প্রাগ্‌বিবাহ কালের যা কিছু করণীয় ছেলেদের সবই সারতে হতো আট দশ বৎসর মেয়েদের অবলম্বন ক'রে। এখনকার যুবকেরা ফ্রকপরিহিতা যে-সব মেয়েকে খুকী ব'লে সম্বোধন করে, আমাদের কালের ছেলেরা সেই বয়সের মেয়েদের মনে মনে সখী ব'লে সম্বোধন করত, আর রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামে কবিতা লিখত। তখনকার দিনের কোনও এক কবি যে 'পাতা-ঢাকা ফুল'কে লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন—

> আমারো নয়ন রয়েছে এখনো
> তোমার স্বপনে মুগ্ধ।
> পাতাঢাকা ফুলে অলির মতন
> হৃদয় আমার লুব্ধ।

হলফ নিয়ে বলতে পারি, সে পাতা-ঢাকা ফুলের বয়স বছর বারোর অধিক কখনই ছিল না। তখনকার দিনে আমাদের অলিধর্মী মন কলিরই ভজন গাইত।

এটা নিতান্তই রুচির কথা। এক যুগে ফল ভালো লাগে, এক যুগে ফুল; এক যুগে ফুল ভালো লাগে আর এক যুগে কুঁড়ি। আমাদের যুগ ছিল কলিকার যুগ; আমাদের হৃদয়বৃত্তি, আমাদের কাব্যরসোৎসাহ আলোড়িত হতো কলিকাকে কেন্দ্র ক'রে। ফুলকে কেন্দ্র ক'রে আলোড়িত হবার সুযোগ আমাদের কালে দুর্লভ ছিল। কলি যখন ফুল হ'য়ে ফুটত, তখন তাকে নিয়ে কাব্য রচনা করা যেত না—বড় জোর বলা চলত—

> যে আমার যৌবনের ছিল সহচরী,
> আশার কনকরেখা, হৃদয়ের রাণী,

পরস্ত্রী সে কাছে আসে মাতৃরূপ ধরি'
সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখি, সরে নাকো বাণী।

নিশ্চেতন মনে, বোধ করি কতকটা চেতন মনেও একটা আগ্রহ বাসা বেঁধেছিল। আহারের পর মাঝে মাঝে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম। তিন-চার দিন পরে আবার একদিন মেয়ে দুটিকে দেখতে পেলাম। একদিন বৈকালের দিকে দেখি, মেয়ে দুটি পূর্ব দিক হ'তে পশ্চিম দিকে চলেছে,—সম্ভবত স্কুল থেকে বাড়ির দিকে। কেমন যেন একটা নেশা ধ'রে গেছে। সুযোগ পেলেই অপেক্ষা ক'রে থাকি; কখনও দেখতে পাই, কখনও পাই নে।

একদিন হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে গেলাম সুরেনদাদার কাছে। সেদিন কী কারণে মনে নেই সুরেনদাদা বাড়ি ছিলেন। মেয়ে দুটি যাচ্ছে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার কার্য চালাচ্ছি, এমন সময় সুরেনদাদা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "কী দেখছিস?"

বললাম, "পথ।"

"শুধু পথ?—আর কিছু নয়?"

হেসে বললাম, "আরও কিছু।"

ধরা এবং ধরা-পড়া দুইই হ'য়ে গেল। সুরেনদাদা বললেন, "বেশ দেখতে না?"

দুটি কারণে স্বীকার করতে হলো। প্রথমত, বেশ দেখতে না হ'লে আমার চক্ষু দুটির গুরুতর দোষারোপ করতে হয়, মেয়ে দুটিকে অত আগ্রহের সহিত দেখার সর্বপ্রধান কৈফিয়ৎ থেকেই তা হ'লে নিজেকে বঞ্চিত করি; দ্বিতীয়ত, 'বেশ নয়' বললে সুরেনদাদাই বা সে কথা বিশ্বাস করবেন কেন?

সুরেনদাদা বললেন, "বোধ হয় দুই বোন।"

বললাম, "আমার তো 'বোধ হয়' ও মনে হয় না। দুটির মধ্যে নানান ভেদকে জড়িয়ে এমন এক অভেদ আছে, যা একমাত্র দুই বোনের মধ্যেই থাকা সম্ভব।"

সুরেনদাদা আমার বিচার সমর্থন করলেন।

এ ঘটনার পর আরও কয়েক দিন মেয়ে দুটিকে দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

একটা কথা ভাবছি। আমার এই কাহিনী শুনে পাঠকগণ, বিশেষত সুরুচিসম্পন্না পাঠিকাগণ, একটু অস্বস্তি বোধ করছেন না তো? এমন কথা তাঁরা ভাবছেন না তো যে, মেসের বারান্দা থেকে স্কুলপথগামিনী দুটি নিরীহ বালিকাকে বারংবার দেখার মধ্যে কী এমন সংগত আচরণের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল, আর সেই কথা এত দিন পরে এমন ফলাও ক'রে লিপিবদ্ধ করার মধ্যে কী এমন বাহাদুরি প্রকাশ করাই বা হচ্ছে?—এমন কথা তাঁরা যদি সত্য সত্যই ভাবেন তা হ'লে আমার বক্তব্য হবে, বাহাদুরি প্রকাশ করা কিছুই হচ্ছে না,—যে মানুষ সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তার দেহের চামড়াই শুধু আলগা হয় না; মন, মুখ,

সঙ্গে সঙ্গে কলম পর্যন্ত আলগা হ'য়ে যায়। আর আচরণের বৈধতা সম্বন্ধে বলতে পারি, এ বিষয়ে আমি যোগ্যতম ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমার আচরণের বৈধতার সপক্ষে সার্টিফিকেটই শুধু দেন নি—সকল কথা শুনে বেশ একটু পুলকিতও বোধ করেছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, এ বিষয়ে একটু নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা হ'লে মন্দ হয় না। কথাটার একটা যুক্তিমূলক মীমাংসা হওয়া দরকার।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন পুরুষের পক্ষে অপর এক পুরুষের প্রতিভাব্যঞ্জক বীরত্বদীপ্ত সুশ্রী মুখের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত ক'রে খুশি হওয়া যদি অবৈধ না হয়, তা হ'লে সেই পুরুষের পক্ষে কোনও সুন্দরী তরুণীর মুখমণ্ডলে বালার্কের আভা এবং নীলপদ্মদ্বয়ের লীলা দেখে খুশি হ'য়ে একাধিকবার দৃষ্টিপাত করলে অবৈধ আচরণ হবে কেন? আমাকে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আমি বলতে বাধ্য হব, অবৈধ হবে না। অবৈধ হবে ব'লে মনে করলে, সে মনে করবার মধ্যে এমন এক দুর্বল অসুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হয়, যা প্রত্যেক নীতিবোধসম্পন্ন ভদ্রব্যক্তির পক্ষে লজ্জার কারণ হওয়া উচিত। শরৎ-প্রভাতের শিশির-ভেজা গাছের প্রথম স্থলপদ্মের প্রতি পথিকের বারংবার দৃষ্টিপাত যদি দোষের না হয়, সুন্দরী তরুণীর সুঠাম দেহবল্লরীর মুখপদ্মের প্রতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাতই বা দোষের হবে কেন? দোষ যদি একান্তই কারও হয় তো একমাত্র সেই বিধাতারই হবে, যিনি মানুষের চক্ষে ভালো বস্তুকে ভালো লাগবার শক্তি মুক্তহস্তে দান করেছেন।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকবারই আমার সুন্দরী তরুণীদের সহিত রীতিমত বচসা হয়েছে এবং প্রতিবারই আমি উপরিউক্ত যুক্তির সাহায্যে তাঁদের পরাস্ত করেছি। যখনকার কথা বলছি সে সময়ে আমাকেও তরুণ বলা চলত। অবশ্য বচসা যা-কিছু ঘটেছিল বাস্তব-জীবনে তার একটিও ঘটে নি; প্রত্যেকটি ঘটেছিল আমার অন্তরলোকে। কিন্তু অন্তরলোক ব'লে উপেক্ষা করবার কোনও হেতু নেই। সে-লোকে যা কিছু বিচার অথবা সিদ্ধান্ত হয়, সবই ন্যায় এবং যুক্তির সাহায্যে হয়; সুতরাং সে লোকের জয়-পরাজয়ের ভিত্তিও খুব দৃঢ়।

বচসা অন্তরলোকে হ'লেও তার সূত্রপাত কিন্তু প্রতিবারই হতো বহির্জীবনে। পথ চলতে চলতে হয়তো কোনও মৃগনয়নার সহিত বারকয়েক দৃষ্টিবিনিময় ঘটে গেল, অমনি তিনি আমার অন্তরলোকে প্রবেশ ক'রে ভ্রূভঙ্গসহকারে আমাকে তিরস্কার করলেন, "ভারি অসভ্য মানুষ তো আপনি।"

উত্তর দিলাম, "প্রমাণ না পেলে স্বীকার করব না।"

"বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন কেন?"

বললাম, "কারণ আছে।"

"কী কারণ, বলতে হবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "বাড়িতে আয়না আছে?"

"আছে।"

"বাড়ি ফিরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াবেন, আয়নার মধ্যে কারণ খুঁজে পাবেন। ঝগড়া যদি একান্তই করতে হয়, আমার সঙ্গে না ক'রে সেই বিধাতাপুরুষের সঙ্গে করবেন, যিনি আপনাকে এমন ক'রে সৃষ্টি করেন নি, যাতে একবার আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দ্বিতীয়বার করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

প্রতিবারই এই, অথবা এইরূপ যুক্তি দেখানোর পর তরুণীরা নিরুত্তরে আমার অন্তরলোক পরিত্যাগ করেছিলেন, যুক্তির দ্বারা কতকটা খুশি হ'য়েই বোধ হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যের সমর্থনে দুটি সাক্ষী তলব করবার অভিপ্রায় করেছি। দুজনেই আমাদের দেশের দুই মহাকবি। একজন আধুনিক কালের, অপরে প্রাচীন যুগের। বলা বাহুল্য, একজন রবীন্দ্রনাথ এবং অপর জন কালিদাস।

যদি আমার ধারণা ভুল হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই ক্ষমাপ্রার্থী হব; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও পুস্তকে, সম্ভবত 'ইয়োরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে লিখেছিলেন, 'আমার অভিভাবকগণ যাই মনে করুন না কেন, সুন্দর মুখ আমার ভালো লাগে, সে কথা স্বীকার করবই।' যদি আমার ভুলই হয়ে থাকে, অর্থাৎ এমন ধরনের কথা তিনি না ই লিখে থাকেন, তা হলেও আমার সবিনয় নিবেদন হবে, এ সত্য এমন করে প্রকাশ করবার শক্তি ও সৎসাহসের অভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না।

আমার দ্বিতীয় সাক্ষী কবি কালিদাস, সুন্দর মুখ দেখে শুধু খুশি হয়েই নিরস্ত হন নি, তদুপলক্ষে কাব্য-রচনাও করেছিলেন। একদিন অপরাহ্ণ সময়ে উজ্জয়িনীর পথ দিয়ে তিনি রাজসভায় যোগদান করবার অভিপ্রায়ে চলেছেন, এমন সময়ে সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেল এক নীলনয়না কিশোরীর সঙ্গে।

চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে কবি বললেন, "এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!"

ততোধিক চমকিত হয়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, "কী?"

কালিদাস বললেন

"কুসুমে কুসুমোৎপত্তি শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে,
বালে, তব মুখাম্বুজে কথং ইন্দিবরদ্বয়ং?"
[কুসুম 'পরে কুসুম ফোটা সম্ভব তো নয়,
তোমার মুখপদ্মে কেন ইন্দিবরদ্বয়?]

ফুলের ওপর ফুল ফোটে, এমন কথা শোনাও যায় না, দেখাও যায় না। কিন্তু বালিকে, তোমার রক্তবর্ণ মুখপদ্মের ওপর দুটি নেত্র-নীলপদ্ম ফুটল কী করে?

এই অপরিমেয় কাব্যপ্রশস্তির প্রসাদে হর্ষে ও লজ্জায় মেয়েটি পাশ কাটিয়ে পালাবার উপক্রম করছিল, এমন সময়ে কবি কালিদাস বললেন,

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে, হরিণায়তলোচনে,
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।"
[পুন ফিরে চাও বালা, অয়ি মৃগলোচনে,
গরলই সক্ষম শুধু গরলের মোচনে।]

হে হরিণনয়না বালিকা, একবার ফিরে চাও। দৃষ্টিদান ক'রে তুমি আমাকে বিষে জর্জর করেছ, আর একবার দৃষ্টিদান করলে বেঁচে উঠতেও পারি, কারণ, শোনা যায় বিষই বিষের ঔষধ।

এই কাতর প্রার্থনায় সদয় হয়ে হরিণনয়না পুনরায় দৃষ্টি দান করেছিলেন কি-না, বর্তমান ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন অবান্তর। যে পরিমাণ সাক্ষী-সাবুদ আমি উপস্থাপিত করলাম, তাতে আমার মামলায় আমি ডিক্রি পেতে পারি বলে মনে করি।

অপর পক্ষে অবশ্য বলতে পারেন, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের মুখে দৃষ্টিপাত করেন না; একান্ত প্রয়োজন হ'লে করেন পায়ে। আমার মনে হয়, এরূপ আচরণের মধ্যে সবলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। পৌরাণিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনার ফলে সাধু-সন্ন্যাসীরা অবগত আছেন যে, তৎকালীন বিরাট মুনি-ঋষিগণের পক্ষেও স্ত্রীলোকের মুখ নিরাপদ বস্তু ছিল না। সুন্দরী রমণীর মুখ চোখে পড়া, আর সঙ্গে সঙ্গে যোগভঙ্গ ও পতন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রমুখ বড় বড় ঋষিগণ এ বিষয়ে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপিত করেছেন যে, একটা কথাই দাঁড়িয়ে গেছে—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। সেই পরবর্তী কালের সতর্ক সাধু-সন্ন্যাসীগণ রমণীর মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করেন না;একান্ত প্রয়োজন হ'লে মুখপদ্ম থেকে দূরতম স্থান পাদপদ্মে দৃষ্টিপাত করেন। আমরা সাংসারিক প্রাণী, আমাদের যোগও নেই, যোগভঙ্গের উদ্বেগও নেই। রাণীর মুখপদ্ম দেখে যদিই বা আমরা ঘায়েল হই, তথাপি লেখাপড়া আপিস-আদালতের সঙ্গে যোগরক্ষা ক'রেও চলি। সুতরাং সাধু-সন্ন্যাসীগণের নজির আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

দেখতে দেখতে আমার দিন কুড়ি-বাইশের স্বল্পায়ু মেস-জীবন শেষ হ'য়ে এল। তর্পণ করতাম, সেইজন্য সঙ্গে পাঁজি ছিল। দুই-এক দিন এদিক-ওদিক দেখে একটা দিন পাওয়া গেল, যেদিন তিথি নক্ষত্র যোগিনী প্রভৃতি সকলেই একযোগে বলছে, সাবধান! বেরিয়েছে, কি মরেছ! তখন আমাদের সত্যসন্ধিৎসু মন সকল প্রকার মিথ্যা সংস্কারের পাশ ছিন্ন ক'রে মুক্ত হবার জন্য ব্যগ্র। ঠিক করলাম, ঐ দিনেই যাত্রা আরম্ভ ক'রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটা শাখার সত্যাসত্যের বিষয়ে পরীক্ষা নিতে হবে; তাতে জীবনান্ত হয়, সেও ভালো।

যথাদিনে ঠাকুর-চাকরকে বকশিশ দিয়ে খুশি ক'রে, যে-সকল বন্ধু-বান্ধব তখনও বাড়ি যান নি তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে অপরাহ্ণকালে সুরেনদাদা, গিরীন ও আমি—আমরা তিন ভাই, একখানা ঘোড়ার গাড়ি ক'রে হাওড়া স্টেশনের অভিমুখে রওনা হলাম।

যে-রকম উৎকট অশুভ দিন, হাওড়া স্টেশন তো বহু দূরের কথা, হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছেই ঘোড়ার উচিত ছিল মুখ থুবড়ে প'ড়ে গাড়ি উল্টে দিয়ে আমাদের আহত ক'রে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা। তৎপরিবর্তে দেবী যোগিনী আমাদের সম্মুখে অবস্থান ক'রে পথ

দেখিয়ে চললেন, এবং অশুভ তিথি ও প্রতিকূল নক্ষত্র আমাদের যাত্রা যাতে নির্বিঘ্ন ও রাত্রি যাতে সুপ্তিময়ী হয় তদ্বিষয়ে আত্মনিয়োগ করলেন।

কাজে কাজেই পরদিন সকালে আমরা তিনজনে সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে ভাগলপুরে পৌঁছে গৃহে উপনীত হলাম।

আত্মীয়স্বজনের পরিপূর্ণ সমাবেশে গৃহ তখন আনন্দে উচ্ছলিত হচ্ছে।

পনের

বছর দেড়েক পরের কথা।

তখন 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' লোকের মুখে মুখে শুনলাম, আমার জীবনেও নাকি বসন্ত জাগ্রত হবার উপক্রম করেছে। কেউ তার পাপিয়ার তান শুনতে পাচ্ছে, কেউ অশোকগুচ্ছের লাল পতাকার সঞ্চালন দেখছে, কেউ বা মলয় হিল্লোলের শীতল স্পর্শ অনুভব করছে। আমি অনুভব করতে লাগলাম বসন্তকালের সেই ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা, যা ধীরে ধীরে নিদাঘের প্রদাহের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঘাম ঝরাতে থাকে। জীবন চলছিল এ পর্যন্ত সহজ যতির ছন্দে, হঠাৎ তার মধ্যে এ কী যতিভঙ্গের উৎপাত! চিরদিনের চার-চার-তিন-তিনের তুলকি চাল থেকে তিন-দুই-চার-পাঁচের কদম চালে প'ড়ে হোঁচট খেতে খেতে মারা যেতে হবে দেখছি। না, ও-কার্য কিছুতেই করা হবে না। বিবাহ এখন মাথায় থাক।

বেঁকে বসলাম। কিন্তু সে বাঁকা সরল রেখার এত কাছ-বরাবর চলতে লাগল যে, প্রতিপক্ষ বোধ হয় সেটাকে 'মুখের লজ্জা' বিবেচনা ক'রে তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। কালো মেঘের ধারে ধারে যেমন সূর্যকিরণের রূপালী আভা প্রকাশ পায়, আমার 'না'-এর পাশে-পাশে তেমনই তাঁরা 'বহুৎ আচ্ছা'র সোনালী প্রভা দেখতে লাগলেন।

বউদিদি বললেন, "তোমার বিয়ের ফুল ফুটেছে উপীন।"

বললাম, "ভারি আশ্চর্য ফুল তো বউদি, যা গাছ জন্মাবার আগেই ফোটে।"

বউদিদি বললেন, "হ্যাঁ, এ আশ্চর্য ফুল গাছে ফোটে না, অদৃষ্টে ফোটে।"

আজকাল মেয়েদেরও বিয়ের ফুল ফোটে না;—অর্থাৎ ফুটেও অনেক সময়ে বিয়ে হয় না;—আবার না ফুটলেও অনেক সময় হয়। আমাদের সময় কিন্তু ছেলেদেরও বিয়ের ফুল ফুটত। তখনকার দিনের ছেলেরা আজকালকার মেয়েদের চেয়েও অনেক বেশি মেয়েলি ছিল। তারা প্রথমে কন্যাপক্ষের কাছে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতো, তারপর মুখ বুজে অভিভাবকদের পছন্দ-করা পাত্রীকে বিয়ে করত। তাই বিয়ের রাত্রে তাদের দেখে বাসর-ঘরের মেয়েরা বলত, বর, না, চোর!

আজকাল মেয়ে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ যদি মেয়েকে প্রশ্ন করে, আমরা তাদের বর্বর ব'লে মনে করি। আমাদের কালে কিন্তু অনেক সময়ে পাত্রীপক্ষ পাত্র দেখতে এসে পাত্রকে প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত করত। পরীক্ষার ফলাফলের

উদ্বেগে শুধু পাত্রেরই নয়, পাত্রের অভিভাবকদেরও, হৃৎকম্প হ'তে থাকত। কোনও রকমে উৎরোতে পারলে হয়। বলতে লজ্জা এবং কৌতুক দুই-ই অনুভব করছি, একবার আমিও ঐরূপ পরীক্ষার মধ্যে পড়বার উপক্রম করেছিলাম। তখন আমাকে অনূঢ় অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য ঘরে-বাইরে উৎসাহশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা চলেছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় একদিন আমাকে বললেন, "শুনছি, তোমাকে নাকি রায়বাহাদুর অমুক দেখতে আসবে?"

বললাম, "সেই রকম তো আমিও শুনছি।"

"সাবধান! ও-ভদ্রলোকের বড্ড কোয়েস্চন জিজ্ঞাসা করবার অভ্যাস আছে। বাড়ি গিয়ে নামতা মুখস্থ করতে আরম্ভ ক'রে দাও।"

শুনে আমি তো নিরপরাধ সৌরেনের উপরই খাপ্পা হ'য়ে উঠলাম, "চালাকি নাকি! কোয়েস্চন করবে কী রকম?"

হাসতে হাসতে সৌরেন বললে, "ভারি কোয়েস্চন করা রোগ ঐ ভদ্রলোকের।"

বাড়ি এসেই আমার ভগ্নীপতি শরৎদাদার সঙ্গে বোঝাপড়া করলাম। তিনিই এ বিবাহ-প্রস্তাবে আমাদের দিকে প্রধান উৎসাহী। সৌরেনের কাছে যা শুনেছিলাম ব্যক্ত ক'রে উত্তপ্ত কণ্ঠে বললাম, "ব'াড়ি ব'সে অবশ্য কথার দ্বারা অভদ্রতা প্রকাশ করব না; কিন্তু পরীক্ষার মতো কোনও কিছুর সূত্রপাত দেখলেই বিনা বাক্যব্যয়ে স্থানত্যাগ করব। পরীক্ষা দিয়ে বি. এ. পাস করা যায়, বিয়ে করা চলে না।"

তখনকার যুগে আমাদের আত্মমর্যাদার চেতনা ইংরেজ গভর্মেণ্টকে অবলম্বন ক'রে সব দিকে সবলে জাগ্রত হ'তে আরম্ভ করেছে। সুতরাং এ হেন অপমান কিছুতেই সহ্য করা হবে না।

দিন দুই পরে আমার ডাক পড়ল আমাদের বৈঠকখানায়। উপস্থিত হ'য়ে দেখি, একটা কোন বিষয় নিয়ে রায়বাহাদুর দাদার সহিত উৎসাহ ভরে আলোচনা করছেন।

আমি প্রবেশ করতেই আলোচনা পরিত্যাগ ক'রে আমার প্রতি মনোযোগী হলেন।

যুক্তকরে ঈষৎ নতমস্তকে নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ারে উপবেশন করলাম।

ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ নেত্রে আপাদমস্তক আমাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে রায়বাহাদুর বললেন, "নাম কী তোমার?"

বললাম, "উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

"নামের আগে শ্রী দাও না?"

বললাম, "নিজের নামে দিই নে, অপরের নামে দিই।"

"প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়?"

বাহুল্য প্রশ্ন। জানেন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, তবু যাই হোক, সাধারণ আলাপ-আলোচনার মামুলি প্রশ্ন, আপত্তি করবার কারণ নেই। বললাম, "আজ্ঞে হাঁ।"

"কে কে প্রোফেসার ?"

কয়েকজন অধ্যাপকের নাম করলাম।

"সন্ধ্যা-আহ্নিক কর ?"

"না।"

"গায়ত্রী মনে আছে ?"

"আছে।"

"সূর্যের অষ্টনাম কী, বলতে পার ?"

বুঝতে পারছি, প্রশ্নগুলি ক্রমশ সাধারণ আলাপ-আলোচনার গণ্ডি অতিক্রম ক'রে আপত্তিকর এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তথাপি এ প্রশ্নটাও সাধারণ আলাপের প্রশ্ন মনে ক'রে বললাম, "না, বলতে পারি নে।"

ভদ্রলোক এবার একটু বিরাম গ্রহণ করলেন—বোধ হয় উপক্রমণিকাভাগ শেষ ক'রে মূল প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হবার চেষ্টায়। এক মুহূর্ত মনে মনে কী ভেবে নিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "আচ্ছা What is the goal of human life—এ বিষয়ে তোমার মন্তব্য ইংরিজীতে দু-চার মিনিট বল দেখি।"

প্রশ্ন শুনে এবং আমার মুখে বিদ্রোহের রক্ত-পতাকা দর্শন করে শরৎদাদার বুঝতে বাকি ছিল না, সংকটের কাল উপস্থিত হয়েছে। বিস্ফোরণের পূর্বেই তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, "ও-সব কথা অনুগ্রহ ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন না। ও বলেছে, বিয়ে করবার জন্য পরীক্ষা দেবে না। পরীক্ষা যা দেবার ইউনিভার্সিটিতেই দেবে।"

এ রকম সবল প্রতিবাদ ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতায় বোধ করি এই প্রথম। অভিমানের গাঢ় ছায়া মুখমণ্ডলে ঘনিয়ে এল। ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "না না, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি ও-কথা জিজ্ঞাসা করি নি। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী, তাই জানতেই চাইছিলাম। ইউনিভার্সিটি যাদের ছাপ মেরে দিচ্ছে, তাদের পরীক্ষা করার কোনও মানে হয় না।"

দু-চার মিনিট গল্প ক'রে শীঘ্রই আর একদিন আসবার কথা জানিয়ে ভদ্রলোক বিদায় গ্রহণ করলেন।

যোগেন্দ্রনাথ দত্ত নামে হাইকোর্টের এক উকিল সে সময়ে ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দাদার জুনিয়ার এবং সেই সূত্রে প্রতিদিনই আমাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। রায়বাহাদুর প্রস্থান করবামাত্র তিনি আমার প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন।

"বে বে-এল্ করেছ! যদি উত্তর দিতে তোমাকে ফু-ফু-উল্ বলতাম।"

স্মিতমুখে দাদা বললেন, "ভদ্রলোক কৈফিয়ৎ দিলেন, কিন্তু ইংরিজীতে কেন জানতে চেয়েছিলেন, সেই আসল কথারই কৈফিয়ৎ দিলেন না।"

খুশি হ'য়ে আমি কক্ষ পরিত্যাগ করলাম।

যে ঘটনার কথা বললাম, সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের দিক দিয়ে খুব বেশি দিনের কথা নয়; কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে, রায়বাহাদুর তো দূরের কথা, কোনও রাজাবাহাদুরও বোধ হয় আজকাল একজন মেয়েকেও এমন প্রশ্ন করতে সাহস পান না।

এ ঘটনার কিছুকাল পরে ঘটকরূপে আমার জীবনে আবির্ভূত হলেন বন্ধুবর স্বয়ং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পাত্রীটি কলিকাতা ঝামাপুকুরের মেয়ে। "বন্ধু ঘটকের প্রতি" নাম দিয়ে কবিতা রচিত ক'রে ছন্দোবদ্ধ প্রতিবাদ করলাম। প্রতিবাদের আন্তরিকতার বিষয়ে আমার নিজেরই খুব বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু প্রতিবাদ একটা না করলেও শোভন হয় না, নিজেকেই নিতান্তই সুলভ এবং লঘু প্রতিপন্ন করা হয়। যতদূর মনে পড়ে, কবিতাটি চতুর্দশপদী সনেট জাতীয় ছিল। তার মাঝখানের গোটা চারেক লাইন মনে পড়ছে,—

আপন কৌতুক ল'য়ে আপনার মনে
হা রে রে অবোধ, তুমি করিতেছ খেলা!
এ ধারে যে মোর চারু নিকুঞ্জ-কাননে
ধড়াধ্বড় পড়িতেছে বড় বড় ঢেলা!

প্রকৃতপক্ষে নিকুঞ্জ-কাননে খুব বড় বড় ঢেলা যে পড়ে নি, সে বিষয়ে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে; ও-কথার পনের আনাই বোধ হয় বিনয়।

প্রতিবাদের শেষ দুই ছত্রও মনে আছে,—

এই যে ভবানীপুর, অতি চমৎকার!
ঝামাপুকুরের দিকে যেয়ো নাকো আর।

কিন্তু এই দুটি লাইন দিয়ে সনেট যখন শেষ করছিলাম, তখন মাথার উপরে বিধাতা-পুরুষ হাসছিলেন। 'যেয়ো নাকো আর' বললেই যদি হ'তো।

সৌরেনের ঘটকালি সফল হলো না; প্রতিবন্ধক হলো মর্ত্যধামের কেউ নয়, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র।

কয়েক মাস পরে কিন্তু পাত্রীপক্ষের গৃহ থেকে পাকা দেখা সেরে এসে সুরেনদাদা আমাকে বললেন, "ওরে, কোন্ বাড়িতে তোর বিয়ে হচ্ছে জানিস?"

বললাম, "কোন্ বাড়িতে?"

"ঝামাপুকুরের মেসে থাকতে তুই যে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনতিস, সেই বাড়িতে। আর, কার সঙ্গে হচ্ছে জানিস?

"কার সঙ্গে?"

"মেসের বারান্দা থেকে যে-দুটি স্কুলের মেয়েকে দেখতিস, তাদের বড়টির সঙ্গে।"

আশ্চর্য! এমন যোগাযোগ? যে গাছ, তারই ফুল! লোকে যে বলে মৎস্যযোগ শুভযোগ, সে কথা তা হ'লে নিতান্ত মিথ্যা নয়।

মেসে থাকতে মৎস্যের মহিমা একটুও বোঝা যায় নি।

কয়েক দিন পরে ঝামাপুকুর লেনের সেই গানের আসরে গিয়ে যখন আসন গ্রহণ করলাম, তখন সত্যই মনে হ'লো, Truth is সময়ে সময়ে stranger than fiction!

উপেন্দ্রনাথ রচনা-সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত